সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

একাদশ খণ্ড

(অপ্রকাশিত রচনা)

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৬

সম্পাদক

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সুমথনাথ ঘোষ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা

শ্রীচুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ

সিল্ক স্ক্রীন

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোঃ, প্রাইভেট
লিমিটেড, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৬ হইতে
জয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

সম্পাদকের নিবেদন

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন এক প্রচণ্ড ব্যতিক্রম। চিরাচরিত প্রথাসিদ্ধ রচনাভঙ্গিতে না লিখে তিনি একটি নূতন ধারা বা স্টাইল বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন করেন। তাঁর ভঙ্গিতে আগে বিশেষ কাউকে লিখতে দেখা যায়নি। পরেও কেউ আসেননি। তাঁর সাম্রাজ্যে তিনি একক অধীশ্বর—এখনও পর্যন্ত। আলী সাহেবের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যেমন ছিল বৈচিত্র্যময়, তেমনি তাঁর লেখনীরও অবাধ বিচরণ ছিল সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। একই লেখক উপন্যাস লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন, ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন, জীবনী রাজনীতি শিক্ষা ধর্ম আমাদের জানাশোনা কোন বিষয়ই বাদ পড়েনি তাঁর রচনায়—এ দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। তবে তাঁর অসাধারণ রচনানৈপুণ্যের সঙ্গে আর একটি বিরাট ত্রুটি ছিল তাঁর লেখকরূপে। সে ত্রুটি বা দোষটি হল তাঁর নিজের রচনার মুদ্রিত-অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে নিদারুণ শৈথিল্য ও উদাসীনতা। উপন্যাস বা একটানা ধারাবাহিক প্রকাশিত রচনা ছাড়া আর যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি সংগ্রথিত করা বা সংকলনের ভার তিনি অনেক সময়ই প্রকাশক বা অপর কোন ব্যক্তির ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর নিজের লেখা কোন্‌টা বাদ পড়ে গেল, কোন্ কোন্ পত্রিকার লেখা সঙ্কলিত হল না আদৌ সে হিসাব সংকলক বা প্রকাশকের পক্ষে রাখা সম্ভব হত না। লেখকের এ বিষয়ে শৈথিল্য বা উদাসীনতার কথা তো আগেই বলেছি। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনা রচনাবলীতে সংকলিত হবার পর, লেখকের পুত্রদের প্রচেষ্টায় আরও বেশ কিছু রচনা উদ্ধার হয়েছে। এই সব রচনার অধিকাংশ বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রের ফীচার কলমে ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় লেখকের নিজ নামে বা সত্যপির, রায়পিথৌরা প্রভৃতি ছদ্মনামে মুদ্রিত হয়েছে। সামান্য কিছু লেখা অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির আকারেই থেকে গিয়েছিল। এই সব রচনা নিয়েই সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলীর একাদশ বা অপ্রকাশিত রচনার খণ্ডটি প্রকাশিত হল।

এই খণ্ডটিতে মোটামুটি চারটি বিভাগ করা হয়েছে—বিচিত্রা, ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্য, রায় পিথৌরার কলমে এবং অপ্রকাশিত পত্রাবলী। বিচিত্রা বিভাগে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কিত আলোচনা, বিদ্বজ্জন ও মহাপুরুষদের প্রসঙ্গ ও কিছু হাস্যকৌতুকপূর্ণ রচনা স্থান পেয়েছে। ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্য বিভাগে—এই শিরোনাম বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে। রচনার মধ্যে মূল্য বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে নানান বিষয়ের উল্লেখ আলীসাহেবের রচনা-শৈলীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম। সেই কারণে তাঁর প্রবন্ধগুলি বিশেষ কোন বিভাগে

শ্রেণীবদ্ধ করা যে কোন সম্পাদকের পক্ষেই এক সুকঠিন কর্ম। ভাষার আলোচনায় রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে আনা, ধর্ম বা সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে রাজনীতিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর প্রভাব কি ও কতটা—এসব ব্যাপার তাঁর লেখনী কখনই এড়িয়ে যেত না। এই জন্যই এই বিভাগের অন্তর্গত অনেক রচনাতেই রাজনীতি, রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিস্তৃত আলোচনা ও বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিভাগে নর্তকী নামে যে নিবন্ধটি আছে, সেটি পাঠক পড়েই বুঝতে পারবেন, রচনাটি অসম্পূর্ণ। একটি প্রচুর সম্ভাবনাময় কাহিনী অর্ধপথেই থেমে গেছে। লেখকের কয়েকটি মূল্যবান ইংরাজী প্রবন্ধও এই অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দিল্লীতে থাকাকালীন সময়ে লেখক দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় রায়পিথৌরা নামে দীর্ঘদিন ফীচার কলম পরিবেশন করেন। এগুলি সমসাময়িক ঘটনাবলী প্রসঙ্গে লিখিত হলেও অনেক রচনাই সাময়িকতাকে অতিক্রম করে চিরন্তনত্ব দাবী করতে পারে। এইসব রচনা 'রায় পিথৌরার কলমে' বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রন্থের শেষ অংশ লেখকের 'অপ্রকাশিত পত্রাবলী'। এই পত্রগুলির সবকটিই রাজশেখর বসুর দৌহিত্রী-পুত্র শ্রীদীপংকর বসুকে লিখিত। পত্রগুলি প্রকাশের ব্যাপারে ও তথ্য সংগ্রহে দীপংকরবাবুর আনুকূল্য ও সাহায্য অপরিসীম।

আগেই বলেছি,—রচনার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও বহুমুখী আলোচনার জন্য আলীসাহেবের প্রবন্ধগুলির নিখুঁত শ্রেণীবিভাগ করা দুরূহ। লেখকের সাহায্য পেলে হয়তো আরও খানিকটা সুবিন্যস্ত করা যেত। তবু এই শ্রেণীবিভাগে যদি কোন ত্রুটি চোখে পড়ে তা সম্পাদকদের গোচরে আনলে তাঁরা উপকৃত ও কৃতজ্ঞ বোধ করবেন।

প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে যেগুলির প্রকাশকাল ও পত্রিকার নাম যেমন যেমন পাওয়া গেছে, তাদের নীচে সেইমত উল্লেখ আছে। অন্যগুলি না পাওয়ায় দেওয়া সম্ভব হয়নি। সমসাময়িক বিষয়ের উপর লিখিত প্রবন্ধগুলির বিন্যাসের মধ্যে যথাসম্ভব পারম্পর্য রাখার চেষ্টা হয়েছে।

তবে সকলের বিপুল পরিশ্রম ও অনুসন্ধান সত্ত্বেও আমাদের আশঙ্কা, গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হল না এমন অনেক রচনাও সকলের অগোচরে বাইরে থেকে যাওয়া অসম্ভব ও বিচিত্র নয়। বাংলাসাহিত্যের অনুরাগী পাঠক-সুহৃদবর্গ তেমন কোন রচনার সন্ধান দিলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করতে পারি।

—সম্পাদক

বিচিত্রা

মধুহীন করিনি তো মোরা মনঃ কোকনদে

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পাঁচজনের সামনে কিছু বলতে গেলে আমি দিশেহারা হয়ে যাই। সমস্যা তখন : কোন্‌টা ছাড়ি, কোন্‌টা বলি? প্রবাদে কয়, বাঁশবনে ডোম কানা। যে-বাঁশটা দেখে, আহাম্মুখ ডোম সেইটেই কাটতে চায়। আখেরে আকছারই যা হয়, তাই ঘটে। একটা নিরেস বাঁশ কেটে বাড়ি ফেরে! রবীন্দ্রনাথের বেলা তবু খানিকটে বাঁচাওতা আছে। যে বাঁশই পেশ করিনে কেন, কেউ না কেউ সেটা পড়েছেন। তিনি "বুড়া রাজা প্রতাপরায়ের" মত "আহাহা বাহাবাহা" রবে সাধু! সাধু! রব ছাড়বেন।

মাইকেল শ্রীমধুসূদনকে নিয়ে সংকট উৎকটতর। আজ কেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও মাইকেল-কাব্য-নাট্য-পত্রাবলী বাবদে ওয়াকিফ্-হাল ছিলেন অল্পজনই, যাঁরা মাইকেল নির্মিত "মধুচক্র" থেকে "গৌড়জন যাহা আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি" রসাস্বাদ করতেন। পঞ্চাশ বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বাঙলা ক্লাস নেবার সময় কেউ যদি "বলাকা"র কোনো অপেক্ষাকৃত বিরল শব্দের অর্থ বলতে না পারতো তিনি তখন হরহামেশা শাসাতেন, "দাঁড়া! তোদের তা হলে 'মেঘনাদ' পড়াবো, তখন বুঝবি কঠিন শব্দ কাকে বলে!" আমরা আতঙ্কে কুঁকড়ি সুকড়ি মেরে যেতুম।······আর আজ!! তবে একটি আশার বাণী আছে। বছর তিরিশেক পূর্বে মডার্ন কবিরা যখন বাঙলা শব্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করলেন তখন একাধিক জন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে অনাদৃত শ্রীমধু শতাধিক বৎসর পূর্বে ঐ কর্মটি করেছিলেন তাঁর সর্ব প্রতিভা নিয়োগ করে অসীম উৎসাহে। এবং বিশেষ করে শ্রীমধু বড়ই উল্লাসবোধ করতেন, আলঙ্কারিক—অর্থাৎ যাঁরা কাব্য-রস কি, সে রসের উত্তম অধম বিচার, উত্তম রসসৃষ্টির সময় কোন্ কোন্ বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি এঁদের সে-সব আইন লঙ্ঘন করতে পারলে।

মাইকেলের আমলে ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা-বিবাহের জ্ঞাতশত্রু জনৈক মহেশচন্দ্রকে অপদস্থ করার জন্য প্রতি সপ্তাহে একটি বুলেটিন প্রকাশ করতেন। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কটুবাক্য সর্ব অস্ত্র ঈশ্বরচন্দ্র এস্তেমাল তো করতেনই, মাঝে-মধ্যে অশ্লীলতার গা যে ছুঁয়ে যেতেন না সে-কথাও বলা যায় না। ঐ সময় গোঁড়ার দল মহেশকে "কবিরত্ন" উপাধি দেয়। ঈশ্বর প্রতিবাদ করে লিখলেন, "না, তাকে দেওয়া হয়েছে "কপি-রত্ন" খেতাব।" তারপর ঈশ্বর স্মৃতি, ন্যায়শাস্ত্রাদি থেকে তাঁর "কপি-রত্ন" সপ্রমাণ করার পর নিলেন অলঙ্কার। লিখলেন, সর্ব আলঙ্কারিক এক বাক্যে

বলেন, 'ব' অক্ষরটি কর্কশ, 'প' অক্ষরটি মোলায়েম। উপাধি দেবার বেলা অবশ্যই মোলায়েম অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব কপিরত্ন। কাকতালীয় কি না, বলা সুকঠিন, কারণ শ্রীমধু ইতিপূর্বে অলঙ্কার শাস্ত্র গুলে খেয়ে পেটতল করে তৈরী ছিলেন। মনে মনে বললেন, "বইট্রে! 'ব' বুঝি কর্কশ। আমি নাগাড়ে 'ব' এস্তেমাল করবো! সামলাও দেখি ঠ্যালাডা।" সীতা-সরমায় সদম্ভে লিখলেন,

শুনিয়াছি বীণাধ্বনি দাসী
পিকবর-রব নব পল্লব মাঝারে—

পর পর চারটে শব্দে চারটে 'ব'-এর অনুপ্রাস। এ অধম বহু বৎসর ধরে ত্রিযামা যামিনী যাপন করেছে অলঙ্কার অধ্যয়নে। সে চিৎকারিল উচ্চৈঃস্বরে,

"ভো ভো গৌড়জন
সবে। কী মধু নিমিল মধু অবহেলে
বারম্বার 'ব' অক্ষর বিভাসিয়া। বলো
কবে কবি কেবা, বর্ণিল বরদা বরে
বঙ্গভূমে পিকবর-রব নব?"
— — — — — ('ব' এবং 'ভ' অনুপ্রাস সমধ্বনিসূচক)

এ তো অতি সামান্য একটি উদাহরণ মাত্র। শ্রীমধুর কাব্য-নাট্যাদি যে কোনো সৃষ্টিকর্মের যেখানে খুশি হাত দাও, পাবে তাঁর সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি, পূর্বসূরীদের স্মরণান্তে ("নমি আমি কবিগুরু······বাল্মীকি / হে ভারতের শিরচূড়ামণি", "কৃত্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার") তাঁদের ছাড়িয়ে যাবার সফল প্রচেষ্টা, অলঙ্কার নন্দন শাস্ত্র তুড়ি মেরে, সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতিতে নব নব সংকটের পথে নব নব অভিযানে নিষ্ক্রমণ, সৃষ্টির পর সৃষ্টি, অভূতপূর্ব সৃজন, যার থেকে অনাগত যুগের নবীন আলঙ্কারিক অভিনব নব নব সূত্র নির্মাণ করে গোড়াপত্তন করবেন নবীন নন্দন শাস্ত্রের—সর্বোপরি বঙ্গভাষার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ, বঙ্গ সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর অচল অটল বিশ্বাস, সে ভবিষ্যৎকে সফল করার জন্যে তাঁর সর্বব্যাপী প্রত্যাশা—এমন কি, কোনো সার্থক মুসলমান কবি কারবালা নিয়ে একদিন রচনা করবেন অনবদ্য সমুজ্জ্বল (magnificient) এপিক[১] —এবং

১. "মেঘনাদ" রচনার সময় শ্রীমধু সুপণ্ডিত রাজনারায়ণ বসুকে লিখছেন, "I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of ancestors. It is full of

এসব আশা-আকাঙ্ক্ষায় শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর অক্লান্ত বিদ্রোহ, দুর্বার সংগ্রাম।

আশ্চর্য! মাইকেল খ্রীষ্টান। তিনি বাঙলা ভাষার বৈরীদের সঙ্গে করলেন আমৃত্যু সংগ্রাম। তিনি আহরণ করতেন অসংখ্য রতনরাজি বহুতর ভাষা থেকে কিন্তু কি ইংরিজি, কি সংস্কৃত তাঁর মাতৃভাষা বাঙলার আসন দখল করে সেটা তিনি এক লহমার তরে বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর তিনশত বৎসর পূর্বে আরেক অহিন্দু—মুসলমান, তাঁরই মত "বাঙাল"—সৈয়দ সুলতান বহু-বিচিত্র সম্পদ আহরণ করতেন আরবী ফারসী থেকে, কিন্তু তাঁর সাধনার ধন বাঙলাকে যারা স্থানচ্যুত করতে চায় তাদের স্মরণে এনে দিচ্ছেন অপূর্ব সুভাষিত,

"যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সে-ই তার মাতৃভাষা, অমূল্য সে ধন॥"

অথচ শ্রীমধু স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় স্বপ্ন দেখতেন ইংলণ্ডের। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার হাতের কাছে অল-ওস্তাদ ডঃ মনিরুজ্জামান সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত মধুসূদনের নাট্যগ্রন্থাবলীখানি আছে মাত্র। অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনা, মেঘনাদ, গয়রহ একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ নেই। অতএব তাবৎ কাব্য-উদ্ধৃতি আমার জরাজীর্ণ স্মৃতি দৌর্বল্যের উপর নির্ভর করে এ স্থলে লিখতে হচ্ছে—মায় সুলতানের সুভাষিত।

বিলেতের স্বপ্নে বিভোর শ্রীমধু তখন আকুল হৃদয়ে ইংরেজিতে কবিতা লিখছেন (বয়স চোদ্দ / পনেরো, "পৃথিবী", না "প্রথিবী" কোন্‌টা শুদ্ধ জানেন না ; পরবর্তী-

poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it. (··· ···) What a vast field does our country now present for literary enterprise! I wish to God, I had time. Poetry, Drama, Criticism, Romance—a man would bare a name behind him, above all Greek, above all Roman fame". শুধু হিন্দু পুরাণাদিই না। অন্যত্র শ্রীমধু লিখছেন, "We have just got over the noise of Mohurrum. I tell you what—if a great Poet were to rise among the Mussulmans of India, he could write a magnificient Epic on the death of Hossain and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject." (অর্থাৎ হিন্দু পুরাণাদিতে নেই।) ডঃ মনিরুজ্জামান, নাট্যগ্রন্থাবলী, পৃঃ ৭১৩, ৮১৬।

কালে নিজেই বলছেন সে-সময় কেউ "শিব" না লিখে "ষীব" লিখলে সেটাকে তিনি উদ্ভট মনে করতেন না),—

I sigh for the distant Albion shore
Its valley green its mountains high,
Though friends none relations have I nor
In that far clime, yet oh ! I sigh
To cross the vast Atlantic wave,
For glory or a nameless grave !

(উদ্ধৃতি নিশ্চয়ই ভুল আছে)

অনেক বৎসর পরে কবিগুরু রবির অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেন :—

দূর শ্বেতদ্বীপ তরে পড়ে মোর
আকুল নিঃশ্বাস,
যেথা শ্যামা উপত্যকা, উঠে গিরি
ভেদিয়া আকাশ।
নাহি সেথা আত্মজন, তবু লঙ্ঘি
অপার জলধি,
সাধ যায় লভিবারে যশ, কিংবা
অ-নামা সমাধি ॥

গিয়েছিলেন মধু। গিয়েছিলেন বলেই বিদেশী ভাষার প্রতি সমসাময়িক সর্বজনীন চিত্ত-দৌর্বল্যজনিত মোহ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন অতি সত্বর। বিদেশের প্রতি তাঁর কুহেলিকাচ্ছন্ন চক্ষুঃজ্যোতিও নিরাবিল হয়ে যায় যুগপৎ।

বস্তুত কলকাতায় ফিরে এসেও মধু সেই পরবাসীই থেকে গেলেন। শ্রীমধু চিরকালই খাঁটি যশোরে "বাঙাল"। কলকাতার 'ঘটি'-রাজরা যখন তাঁকে তাঁর সরস তথা দার্ঢ্যগুণসম্পন্ন, সরল অপিচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভব প্রকাশে পটিয়ান, মধুর অপরঞ্চ গুরুগম্ভীর, অকৃত্রিম বিদগ্ধ বঙ্গভাষার সর্বাধিকারাধার প্রতিভূরূপে নতমস্তকে স্বীকার করে নিয়েছেন তখন অকস্মাৎ নয়া এক ভেল্কিবাজি দেখিয়েছিলেন যশোরের খাঁটি 'বাঙাল'। পশ্চিমবঙ্গের অকৃত্রিম ঘটির ভাষা পেরিয়ে মধু ছাড়লেন বাঙাল ভাষার রঙ বেরঙের আতশবাজি।

শ্রীমধু মাতৃভূমি সাগরদাঁড়ি ছাড়েন বাল্যে। কিন্তু এ কী তিলিস্মাৎ, কী অলৌকিক কাণ্ড! শুধু যে যশোরের হিন্দু ভদ্রলোকের ভাষা (ভক্ত-প্রসাদের

ভাষা) স্মরণে রেখেছেন তাই নয়, হিন্দু চাকরের ভাষা (রাম), বামুন পণ্ডিতের সংস্কৃতে ভেজা সপসপে ভাষা (বাচস্পতি), মুসলমান চাষার ভাষা (হানিফ), তার বউয়ের ভাষা (ফতেমার ভাষাতে বিদেশী-শব্দ হানিফের তুলনায় কম)—কে কতখানি সংস্কৃতে ভরা ভাষায় কথা বলবে, কে কোন্ পরিমাণে আরবী-ফার্সী এস্তেমাল করবে তার ওজন করে শ্রীমধু চালাচ্ছেন একসঙ্গে গোটা পাঁচ ছয় মূলত যশোরী ভাষার ভিন্ন ভিন্ন আড় বা ঢং—যাদুকর যে-রকম ছ'টা বল্ নিয়ে খনে এক হাতে খনে দু'হাতে নাচায়। এমন কি সদ্য কলকেতা ফের্তা কলেজের ছোকরাকেও দিব্য চেনা যাচ্ছে। বলছে "এমন ক্লেবর ছোকরা দুটি নেই।" ওদিকে ভক্তপ্রসাদ জমিদারির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে বরঞ্চ যাবনিক শব্দ দিব্য চেনেন। তাই ক্লেভার শব্দের দু'দুটি প্রতিশব্দ 'সুচতুর' 'মেধাবী'ও তাঁর পছন্দ হল না। বললেন, " 'জহীন' কিম্বা 'চালাক' বললে বুঝতে পারি।"—আজ আর জহীন শব্দ কোনো বাঙলার লোকই বোঝে না। আরবী "জেহ্‌ন্" দু'একখানা কোষে পাওয়া যায়। বলা নিতান্তই বাহুল্য 'চালাক' ফার্সী।

একাধিক লেখক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে একাধিক ভাষা নিয়ে কারচুপি দেখিয়েছেন কিন্তু শ্রীমধুর ন্যায় এ-রকম ভেল্কিবাজি, কেউই দেখাতে পারেননি।

কলকাতার বুকের উপরে বসে তিনি নির্ভয়ে বাংলাদেশের 'বাঙাল' ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ শুধু যে পাঙক্তেয় করে তুললেন তাই নয়, তারা সেদিন যে-সব উচ্চাসনে বসেছিল সে-সব আসন নিয়ে খাস কলকেত্তাই বা অন্য কোনো আঞ্চলিক ভাষা উপভাষা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি।

যদ্যপি শান্তিনিকেতনের গীতিরস-পরিবেশে আমার কৈশোর কেটেছে, তবু শ্রীমধু আমার বড়ই প্রিয় কবি। তাই এতখানি লেখার পরও দেখি কই, কিছুই তো বলা হল না। মনস্তাপ রয়ে গেল।

সেটা হালকা করার জন্য অবনী ঠাকুরের অনুকরণে গান জুড়ি

"শ্রীমধুরে ঠ্যাকায় কেডা
খুল্‌নে যশোর কইল্‌কেতা।"

অশ্রুসিক্ত সিন্ধুবারি

এই ক্ষুদ্র রচনাটির অবতরণিকাতেই আমার একটি সামান্য কৈফিয়ৎ নিবেদন করার আছে। যদিও বহু বৎসর ধরে আমার লেখা কেউ বড় একটা পড়ে না, তবুও

"বেতার বাংলার" সম্পাদক মণ্ডলীতে দু'একজন নিতান্তই "অকালবৃদ্ধ" সজ্জন, তথা তাঁদের বড় কর্তা আমার প্রতি নিতান্ত অকারণ সদয়। 'বেতার বাংলা'ই স্বাধীনতার পর এই অনারারী পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত অস্তমিত লেখকের কাছ থেকে সসম্মানে দাক্ষিণ্যসহ একটি রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমারও স্পর্ধা বেড়ে গেল। জীবনে যা কখনো করিনি, সেই নিবেদন জানালুম; আসছে শ্রাবণের ১৩ তারিখ (২৯ জুলাই) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুদিবস। তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু নিবেদন করতে চাই। তাঁরা সম্মত হয়েছেন।

নিঃসঙ্কোচে বলবো, চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর হিন্দু সমাজের ইনিই সর্বোত্তম মহাপুরুষ। রবীন্দ্রনাথ যেসব মহাত্মাদের জীবনী লিখেছেন তার মধ্যে সর্বাধিক বিস্তীর্ণ স্থান দিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্রকে। তিনি বলেছেন, "বিদ্যাসাগর নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল; এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই একজনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।"

আমার সবিনয় নিবেদন, আমি গুরুর সঙ্গে একমত নই। অবশ্য "আর দুই একজন" বলতে গিয়ে গুরু যদি ঈশ্বরচন্দ্রকে বাদ দিয়ে রামমোহনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে থাকেন তা হলে সে অভিমত সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নেই।

গত দুই শতাব্দীতে যে-সব মহাপুরুষ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন—রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ—তাঁরা সকলেই হিন্দুধর্মের মূর্তমান প্রতীক। ঈশ্বরচন্দ্র তা নন। হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের জ্ঞান গত আড়াই শতাব্দীর কারো চাইতে কণামাত্র কম ছিল না। বরঞ্চ হিন্দু শাস্ত্রে আমার যে নগণ্য যৎসামান্য জ্ঞান আছে তার পথ-প্রদর্শক ঈশ্বরচন্দ্র। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, শাস্ত্রাধ্যয়ন-লব্ধ পাণ্ডিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র অতুলনীয়। বঙ্গদেশ বাদ দিন, সর্ব ভারতের হিন্দু শাস্ত্রাধ্যয়নের কেন্দ্রভূমি কাশীর শাস্ত্রীরা তাঁকে সমীহ করে চলতেন; ঈশ্বর যখন বিধবা-বিবাহ হিন্দু শাস্ত্র-সম্মত বলে বিধান দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেন, কাশীর শাস্ত্রীরা মল্লভূমিতে নামতে সাহস পাননি।

অথচ, পাঠক বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্র মানতেন না। তাঁর ঋজু, সত্যশীল, দৈনন্দিন আচার-আচরণ সর্বধর্ম, বিশ্ব ধর্মসম্মত ছিল,—হিন্দু শাস্ত্রের বিধান তিনি সর্বজন সমক্ষে পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন করেছেন—অথচ সে যুগের হিন্দু সমাজপতিরা হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ বিধবা-বিবাহ বিরোধী সমাজপতিগণ তাঁকে সমাজচ্যুত করার দুরাশা স্বপ্নেও স্থান দেবার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারেননি। তিনি তাঁর

"অন্নসত্রে ভোজনকারিণী মুচি হাড়ি ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈলাভাবে বিরূপ কেশগুলিতে স্বহস্তে তৈল মাখাইয়া দিতেন।" স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখছেন "বর্ধমান-বাস-কালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমান-গণকে আত্মীয়-নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন।" এ-স্থলে রবীন্দ্রনাথ ভাবোচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়ে "আত্মীয়-নির্বিশেষে" বাক্য প্রয়োগ করেননি—করেছেন—সজ্ঞানে সসম্মানে শব্দার্থে। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা-বিবাহ বিরোধী ছিলেন। তাঁর এক উপন্যাসে তিনি ঐ নিয়ে কিঞ্চিৎ কৌতুক করেছেন। অথচ ঠিক ঐ সময়ই বঙ্কিমের অগ্রজ সদানন্দ, সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতামুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র অনুজ বঙ্কিমকে নিয়ে বর্ধমানে ঈশ্বর সকাশে উপস্থিত হয়ে কুশলাদির পর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভোজনেচ্ছু হন। ঈশ্বরচন্দ্র মোগলাই পদ্ধতিতে উত্তম মাংসরন্ধনে সুপটু ছিলেন। সঞ্জীব আহারের সময় বিদ্যাসাগরের রন্ধননৈপুণ্যের প্রশংসা করে বলেন, তিনি যে বহুগুণধারী, সে-তথ্য সঞ্জীব জানতেন, কিন্তু রন্ধনেও যে তিনি সুপটু সে তত্ত্ব তাঁকে বিস্মিত করেছে। বার্ধক্যে স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ছলনাময়ী। তারই উপর নির্ভর করে সঠিক বলতে পারছি না, বিদ্যাসাগর "কিন্তু আপনার ভায়া তো ভাবেন, আমি—" বলার পর "মূর্খ" না ঠিক ঠিক কোন্ বিশেষণটি প্রয়োগ করেছিলেন। এর কিছুদিন পূর্বে বঙ্কিম ঈশ্বরচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন তার সারমর্ম এই যে, "আপনি শাস্ত্র-দ্বারা কেন প্রমাণ করতে গেলেন, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করা উচিত!" ঈশ্বরচন্দ্র আত্মম্ভরী বা দম্ভী ছিলেন না, কিন্তু তিনি আত্মদ্রষ্টা ছিলেন, তাই বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, বঙ্কিম প্রভৃতি "নব হিন্দু ধর্মের" প্রবর্তকগণ কী ব্যক্তিগত জীবন যাপন পদ্ধতিতে, কী শাস্ত্রজ্ঞানে কী প্রকৃত ধর্মতত্ত্বানুশীলনে তাঁর বহু বহু পশ্চাতে। ঈশ্বরচন্দ্র সে পত্রের উত্তর দিয়ে বঙ্কিমকে অহেতুক সম্মান দেখাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু এর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর ঈশ্বর ও বঙ্কিম উভয়ই যখন পরলোকে তখন রবীন্দ্রনাথ মল্লভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে লিখেছিলেন, "অনেকে বলেন, তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ মাত্র ছিল; তিনি অন্যায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে তো শাস্ত্র বচনের প্রভাব নয়।" এ যে কী মোক্ষম সত্য আমার গুরু আপ্তবাক্যপ্রায় বলেছেন, সে আমার অক্ষম লেখনী কি করে প্রকাশ করবে! প্রকৃত গুণী, মোহমুক্ত সত্যদ্রষ্টাই শাস্ত্রের এই জটিল তর্কজাল ছিন্ন করে মানুষকে ইঙ্গিত দেন, শেষ সত্যের উৎসস্থল কোথায়? কবি বলছেন, "তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) তাঁর করুণার ঔদার্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ত্রবচনের বাহকরূপে দেখেননি।" শাস্ত্র মানুষকে সত্যের দিকে পথনির্দেশ করে, হয়তো বা অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে

উপদেশ দেয়, কিন্তু শাস্ত্র কবে কোন্ মানুষের পাষাণ-হৃদয়কে করুণা ধারায় প্লাবিত করতে পেরেছে ?

* * *

এতক্ষণ অবধি যাঁরা আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন তাঁরা হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। শাস্ত্র, তাও হিন্দুশাস্ত্র, সেও গত শতাব্দীর পুরনো এক সমস্যা নিয়ে এত কচকচানি শুনে কীইবা এমন চরম মোক্ষ লাভ হবে ? কিচ্ছুটি না। তবে শুধু স্মরণে এনে দিতে চাই, মাত্র দু'টি বৎসর আগে স্বৈরাচারী নরঘাতক সম্প্রদায় আমাদের মুসলিম শাস্ত্র নিয়ে পেশাওয়ার থেকে সিলেট অবধি কী প্রতারণাই না করেছিল। আমাদের জনপ্রিয় নেতা, মুক্তি ফৌজের আত্মোৎসর্গ, জনপদবাসীর বিদ্রোহ এর সবই নাকি ছিল ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ! আমরা ইংরিজি পঞ্জিকার উপর নির্ভর করে দিবারাত্রির নামকরণ করাতে এতই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে এখনো বলি ২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার রাত্রি এগারোটার সময় এক অভূতপূর্ব তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু মুসলিম পঞ্জিকানুযায়ী বৃহস্পতিবারের সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল পবিত্র জুম্মাবার, শুক্রবারের রাত্রি। তারপর এল শুক্রবারের দিন। আল্লাতালার আদেশ :

"ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু, ইজা নূদিয়া লিস্‌সলাতি মিন্‌নি-ইয়োমিল্‌-জুমুয়া (তি), ফাস্ আ'ও ইলা জিক্‌রিল্লাহ (ই)"

"হে ইমানদারগণ, যখন জুমার (সম্মিলন দিবসের) নমাজের জন্য তোমাদের প্রতি আহ্বান (আজান) ধ্বনিত হয় তখন আল্লাকে স্মরণ করার জন্য ধাবমান হও।"

শব্দার্থে "ধাবমান" হয়েছিলেন আমার এক বন্ধুর পরহেজগার প্রতিবেশী ২৬ মার্চ জুমার নমাজের দিনে। তিনি জানতেন যে পুরোদিনের তরে কারফ্যু। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বার বার মানা করেছিলেন। বাড়ির সামনের রাস্তা জনশূন্য। অপর ফুটের হাত পাঁচেক ডাইনে মসজিদ। তিনি বিবিকে বললেন, "আমি এক দৌড়ে মসজিদে পৌঁছে যাব।" রাস্তা যখন প্রায় ক্রস্ করে ফেলেছেন তখন তীর বেগে এল মিলিটারী গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ। আরেকটি শহীদ। ইনি অতিশয় উচ্চ পর্যায়ের শহীদ। কারণ আল্লার আদেশ অনুযায়ী শব্দে শব্দে "ধাবমান" হয়েছিলেন তিনি আল্লার নাম জিক্‌র করতে। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করে, আল্লার আদেশ পালন করতে যে বাধা দেয় (কারফ্যু জারী ক'রে), যে-মানুষের আদেশে আল্লার আদেশ লঙ্ঘন করে তাঁকে খুন করে সে মানুষ শহীদহন্তারূপে কি খেতাব পায়! এবং এই ইয়াহিয়াই ডিসেম্বর মাসে পরাজয় আসন্ন জেনে আপন শীয়া

ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে সুন্নীদের মসজিদে গেলেন জুম্মার নমাজ পড়তে। সুন্নীদের ভিতর তখন গুঞ্জরণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে,—"এই শীয়াটাই যত নষ্টের গোড়া" যেন হুজুররা এ্যাদ্দিন ধরে জানতেন না ইয়াহিয়া খান পুরো পাক্কা কিজিল পাশ্ শীয়া।

বিশ্বধর্মে দীক্ষিত ঈশ্বরচন্দ্র আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীন ছিলেন কিন্তু ধর্ম নিয়ে প্রতারণার প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ঘৃণা। তাই একদা তিক্ত কণ্ঠে তিনি ব্যঙ্গ করেছিলেন,

"প্রতারণাসমর্থে বিদ্যয়া কিং প্রয়োজনং ?
প্রতারণাসমর্থে বিদ্যয়া কিং প্রয়োজনং ?"

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, দুটি ছত্রই হুবহু একই বানানে লেখা, কিন্তু অর্থে আসমান-জমীন ফারাক, এবং দুই ছত্রে মিলে একই সত্য নির্ধারণ করে।

প্রতারণা-সমর্থ জনে, যে প্রতারণা করতে সমর্থ তার (শাস্ত্র) বিদ্যার কি প্রয়োজন ? প্রতারণা দ্বারাই সে সব-কিছু গুছিয়ে নেবে। দ্বিতীয় ছত্রে কিন্তু পড়তে হবে প্রতারণা অসমর্থ। এখানে সন্ধি করলে পূর্ব ছত্রের মতই "প্রতারণা-সমর্থ" রূপ নেয়। অর্থ : প্রতারণা করতে যে জন অসমর্থ কোনো বিদ্যাই তার কোনো কাজে লাগবে না। অর্থাৎ বিদ্যা কোনো অবস্থাতেই কারো কোনো কাজেই লাগে না। কাজ হাসিল হবে প্রতারণা মারফৎ। বড্ড সিনিক্-এর মত তত্ত্বটি প্রকাশ করলেন বিদ্যাসাগর। বিশেষ করে বোধ হয় এই কারণে যে তাঁকে বিদ্যার সাগর উপাধি দেওয়া হয়েছিল। এবং হয়তো বা ঐ সময়েই মাইকেল তাঁর প্রশস্তি আরম্ভ করেন। "বিদ্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে" শ্রীমধুর মধুময় ছত্রটি বিদ্যার সাগর দিয়ে আরম্ভ হয়। সর্বশেষে এ তথ্যটিও প্রাতঃস্মরণীয় যে, বহু-লোক বহু উপাধি পায় কিন্তু সেগুলো এ রকম টায় টায় খাপ খায় না বলে লোকে উপাধিধারী কাউকে কখনো তার পদবী যেমন "বাঁড়ুয্যে" কখনো "কালীকৃষ্ণ" কখনো "ন্যায়রত্ন" বলে উল্লেখ করে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে কখনো বাঁড়ুয্যে মশাই (যতদূর মনে পড়ে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ দু'জনাই বন্দ্যোপাধ্যায়, সংক্ষেপে বাঁড়ুয্যে, হয়তো বা রামমোহনও) বা "ঈশ্বরচন্দ্র" বলে উল্লেখ করেনি। প্রবন্ধ-লেখার সময় অবশ্যই আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ বলে উল্লেখ করি ভাষার অনুপ্রাস, কবিতার ছন্দ শ্রুতিমাধুর্য বা অর্থগৌরব অনুযায়ী যখন যে-রকম মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়—হয়তো বা কিঞ্চিৎ হার্দিক নৈকট্যের ইঙ্গিতসহ। কিন্তু বিদ্যাসাগর নিত্যদিনের চিরন্তন বিদ্যাসাগর। শুনেছি বিধবা-বিবাহ আইন পাস হবার পর ফরেসডাঙ্গার (চন্দননগর) তাঁতীরা কাপড়ের পাড়ে বোনে—"বেঁচে থাকো বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে তুমি।" এবং এ-উপাধি যে কত সত্য, কত গভীর তার

চরম স্বীকৃতি দিয়েছেন সে-যুগের অন্যতম ধর্মগুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস। তিনি স্বয়ং এসেছিলেন বিদ্যেসাগরের দর্শন লাভার্থে তাঁর ভবনে। উভয়ের পন্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রামকৃষ্ণ সাধক, আর বিদ্যেসাগর ছিলেন মোক্ষ, মুক্তি, বৈকুণ্ঠলাভ বা শিবত্ব প্রাপ্তি বাবদে নিরঙ্কুশ উদাসীন। বিদ্যাসাগর অতিশয় সযত্নে রামকৃষ্ণকে সম্মুখের আসনে বসালেন। রামকৃষ্ণ মুগ্ধ নয়নে এক দৃষ্টিতে দীর্ঘকাল তাঁর দিকে তাকিয়ে শেষটায় ভাবোদ্বেল কণ্ঠে বললেন, এতদিন দেখেছি শুধু খাল বিল ডোবা; এই বারে সত্যই "সাগর দর্শন হল।" রামকৃষ্ণ "বিদ্যাসাগর" না "দয়ার সাগর"—শ্রীমধুর মধুর ভাষায় "করুণার সিন্ধু তুমি!"—বা উভয়ার্থে বলেছিলেন সেটা পরিষ্কার হয়নি; আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস উভয়ার্থে। বলা নিতান্তই অনাবশ্যক যে, রামকৃষ্ণ স্পষ্টভাষী ছিলেন। সে-যুগের বহুজন সম্মানিত বঙ্কিমচন্দ্র "কৃষ্ণচরিত্র" তথা নব-হিন্দু ধর্মব্যাখ্যান মাসের পর মাস লিখে যাচ্ছেন তখন তিনি প্রায়ই রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা বা যাই-হোক সে-সন্ধানে যেতেন তাঁর আশ্রয়স্থলে—বিদ্যেসাগর কখনো যাননি। একদিন রামকৃষ্ণ হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন, "আপনার নাম যে-রকম বঙ্কিম, আপনি ভিতরেও বাঁকা বটে।" সম্পূর্ণ মন্তব্যটি আমার মনে নেই। তবে সেটা যে অতিশয় শ্রুতিমধুর ছিল না তা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

বিদ্যেসাগর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্রকণ্ঠে ব্যত্যয়হীন বিরোধিতা প্রকাশ করতেন বলে তাঁকে অজ্ঞজন রূঢ়স্বভাবের লোক বলে কখনো কখনো মনে মনে সন্দেহ করেছে। এ স্থলে কবি ভর্তৃহরির দুটি ছত্র তুলে দিলেই বিষয় সরল হবে:

"আচারনিষ্ঠে ভণ্ড বলেছে,
ধীরজনে ভীরু, সরলে মূঢ়
প্রিয়ভাষীজনে ধনহীন গোপে,
বীরেরে নির্দয়, তেজীরে রূঢ়।"
(সত্যেন দত্তের অনুবাদ)

এই ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীন যুগে এ-কথা স্মরণে এনে বড় আনন্দ পাই যে বিদ্যাসাগরের মত রূঢ়তাবর্জিত তেজীজন এ-দেশে জন্ম নিয়েছিলেন। আমি বিদ্যাসাগর-চরিত্র যদি কণামাত্র চিনে থাকি তবে রূঢ়তম কণ্ঠে রূঢ়তার প্রতিবাদ জানিয়ে বলবো, তাঁর মত বিনয়ী লোক ইহসংসারে হয় না।

রামকৃষ্ণের মুগ্ধ মন্তব্যের উত্তরে বিদ্যেসাগর মৃদু হেসে বলেছিলেন, "সাগরেই যখন এসেছেন তখন খানিকটে লোনা জল নিয়ে যান।" রামকৃষ্ণ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সুস্পষ্টভাষায় প্রতিবাদ করেছিলেন।

পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর ধরে দেশ বিদেশে যখনই আমি কাউকে চোখের জল ফেলতে দেখেছি তখনই আমার মনে জেগেছে প্রথম দিনের প্রশ্নটা, করুণাসাগর "লোনা জল" বলতে সেদিন কি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ?

তবে কি তিনি বলতে চেয়েছিলেন, তাঁর সর্ব সত্তাতে আছে শুধু চোখের জল, অশ্রুধারা—লোনাজল ?

Tagore as Nationalist

আজকের দিনে অটোগ্রাফ, অটোগ্রাফের বই কলকাতার পাঁচ বছরের বাচ্চাও জানে। আমি যে যুগের কথা বলছি তখন কলকাতার সবচেয়ে নামজাদা বিলিতি দোকানেও অটোগ্রাফের বই চাইলে সেলসম্যানদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে যেত জিনিসটা কি এবং শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেলেও মাত্র দু'এক খানা।

তাই আজকের দিনের মত আমরা তখন অবহেলায় ফোয়ারা স্বাক্ষর নিয়েই সন্তুষ্ট হতুম না, এবং যাঁদের কাছে পেতুম তাঁরাও বেশ যত্ন করে, সাবধানে ভেবে-চিন্তে কিছু একটা মনে রাখবার মত কথা লিখে দিতেন।

শরৎচন্দ্র তখন থাকতেন বাজে শিবপুরে, ছোট্ট
এক খানি বাড়িতে। খুঁজে নিতে রীতিমত বেগ পেতে হত।
তবু আমি গাঁয়ের ছেলে বললেও হয় —
নিবাস শান্তিনিকেতন।

শরৎচন্দ্র শুধালেন, 'আমারই কাছে এসেছ কেন?'
কিছুমাত্র না ভেবে বললুম, 'আপনার লেখা
আমার বড় ভালো লাগে।'

শরৎচন্দ্র কলম হাতে নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ
চিন্তা করে লিখলেন, 'তোমার কাজই যেন আমার
সকল কাজের বড় হয়।'

এখানে একটু বুঝিয়ে বলতে হয়। শরৎচন্দ্র তখন
লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও কংগ্রেসে যোগদান করেছেন।
ওদিকে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফিরে সমস্ত
অসহযোগ-আন্দোলনের সমালোচনা করে প্রবন্ধ
লিখেছেন। এই নিয়ে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথে কিছুটা
মসীযুদ্ধও হয়ে গিয়েছে — যদিও তেমন কিছু তীব্র নয়,

এবং সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের ছিল অকৃত্রিম এবং গভীর শ্রদ্ধা — তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত — এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে দেখতেন অত্যন্ত স্নেহের চোখে।

আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র, একথা জেনেই বোধহয় শরৎচন্দ্র বিশেষ করে আমার দৃষ্টি তাঁর লেখার কাজের দিকে আকৃষ্ট করলেন। তাছাড়া আমি তো বলেইছি যে তাঁর লেখা আমার বড় পছন্দ।

তারপর অভ্যুদয় বই নিয়ে গেলুম, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে।

আমরা তাঁর ছাত্র বলে তিনি একটু বিশেষ ভাবে নিয়েই আমাদের অভ্যুদয় বইয়ে ভালো লেখা, উক্তি এমনকি কবিতাও লিখে দিতেন। অতি খুশী হয়ে বললেন, রেখে যাও, ভালো করে লিখে দেব। দিন পনেরো পরে ফের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, কিংবা সময় করে উঠতে পারেননি। কয়েকদিন পর আবার এসেছি? আজো

দিলেন। এবারেও পূর্ববৎ। কিন্তু হয়তো আমার বিমূঢ় ভাব দেখে বললেন, 'তুই দাঁড়া। আমি এখখুনি লিখে দিচ্ছি।'

তার পর অলস হস্তে আমার অটোগ্রাফ বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। হঠাৎ চোখে পড়ল, শরৎচন্দ্রের লিখনটি তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে আর কোনো চিন্তা না, ভাবনা না। প্রথম সাদা পাতাতেই লিখে দিলেন,

'আমার দেশ যেন উপলব্ধি করে, সকল দেশের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ দ্বারাই তার সার্থকতা।'

× × ×

এই কথাটির ভিতরেই আছে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা।

রবীন্দ্রনাথ যে আপন দেশকে কতখানি ভালোবাসতেন, কতখানি শ্রদ্ধা করতেন, সে দেশ যেন জনসমাজ মাঝে আপন আসন বেছে নেয়, পূর্ব-পশ্চিম যেন সে দেশের অভ্যর্থনার সিংহাসন পাশে এসে সম্মিলিত হয় এই মহান প্রার্থনা— আজ কোন বাঙালীর কণ্ঠে তাঁর কণ্ঠস্বর মন্দ্রিত ধ্বনিত হচ্ছে না?

কিন্তু তিনি জানতেন, দেশের প্রতি ভালোবাসার মত নির্মল জিনিসও যখন স্বাধিকারপ্রমত্ততার সঙ্গে

সংযুক্ত হয়, তখন তার বিকৃততম রূপ দেখা দেয় চরম বিক্ষুব্ধ মৎস্যন্যায়ে। তাঁর জাতীয়তাবাদী তখন নৃশংস, তার বর্বরতা তখন দেখা যায়। আজ থেকে ষাট বৎসর পূর্বে তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ-রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম — প্রলয়মন্থনক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চিৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি।

আজ তাই পুনরায় স্মরণ করি,
সকল দেশের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ
দ্বারাই আমার দেশের সার্থকতা ॥

সৈয়দ মু. আলী

বিচিত্র ছলনাজাল

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনেছি, স্বকর্ণে একাধিকবার তাঁর মৃত্যুদিন যেন পালন না করা হয়। করতে হয় তো করি যেন তাঁর জন্মদিন।

স্বভাবতই আমাদের সকলের মনে প্রশ্ন জাগবে, কেন?

রবীন্দ্রনাথ তো চার্বাকপন্থী ছিলেন না। চার্বাক বলতেন, দেহ ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার পর পুনরাগমন কোথায়? এ স্থলে পুনরাগমন সমাসটি পুনর্জন্ম বা শেষ বিচারের দিন, যে কোনো অর্থে নেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তো এতখানি জড়বাদী ছিলেন না।

বরঞ্চ তিনি বার বার কত বার যে বলেছেন, মৃত্যুতে একদিকে আছে পরিসমাপ্তি অন্যদিকে আছে নব অভ্যুদয়। তাঁর অতিশয় অন্তরঙ্গ সখা ও শিষ্য, কবি সত্যেন্দ্রনাথের তিরোধানে তিনি যেন, যে অমর্ত্য-লোকে তাঁর প্রিয় কবি নতুন আনন্দ গান ধরেছেন তার সুর শুনতে পাচ্ছেন:

"—সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে
মিলিত মধুর
প্রভাত আলোকে আজি;
আছে তাহে সমাপ্তের ব্যথা,
আছে তাহে নবতম আরম্ভের
মঙ্গল-বারতা;
আছে তাহে ভৈরবীতে
বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে
মিলনের আসন্ন অর্চনা।"

শুধু কি তাই? যারা এ জীবনে কৃপণ ভাগ্য বশে বিড়ম্বিত হয়েছে, কবি তাদের মৃত্যুতে তাদের জন্য বিরাট একটা অপ্রত্যাশিত বৈভব গৌরব দেখতে পাচ্ছেন। আল্লাহতালা রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে বহু বিচিত্র অমূল্য সম্পদ দিয়েছিলেন কিন্তু একটি অতি সাধারণ ব্যাপারে তাঁর প্রতি বিমুখ। [তাঁর পত্নী, দুই কন্যা, এক পুত্র (অন্য পুত্র রথীন্দ্রনাথ নিঃসন্তান, এক কন্যা মীরা দেবী)—এই চারজন পর পর মারা যান। এঁদের বয়স যথাক্রমে, স্ত্রী—উনত্রিশ, কন্যা—তেরো (নিঃসন্তান), পুত্র—এগার, কন্যা—বত্রিশ (নিঃসন্তান)। এর

পরও রবীন্দ্রনাথ রেহাই পাননি। পুত্র রথীন্দ্রনাথ তো নিঃসন্তান—রবীন্দ্রনাথ জানতেন তাঁর পুত্রবধূর কোনো সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অন্য পুত্র এগারো বৎসর বয়সে গত হয়েছে—কলেরায়। পুত্রের দিক দিয়ে তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি নেই। আছে কেবল কন্যা মীরার একটি পুত্র ও কন্যা। রবীন্দ্রনাথের আশা ছিল এই মেয়ের দিক দিয়ে তাঁর বংশ রক্ষা হবে। আমাদের হজরতের বেলা যা হয়েছে। ছেলেটির নাম নীতীন্দ্রনাথ, ডাক নাম নীতু। মীরাদেবী দাম্পত্য-জীবনে সুখী হতে পারেননি বলে পুত্রকন্যা নিয়ে পিতার কাছে চলে আসেন ১৯১৯/২০-তে। বলা বাহুল্য ২৭ বছর বয়সে কোন কন্যা যদি চিরতরে পিত্রালয়ে চলে আসে তবে পিতার মনের অবস্থা কি হয়; মীরা দেবীর বিবাহিত জীবনের কঠোর দ্বন্দ্বের অনেকখানি সন্ধান পাঠক পাবেন 'যোগাযোগ' উপন্যাসে। কিন্তু সেখানে কুমুদিনীর পিতার মৃত্যু তার বিবাহের পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল, বলে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে কন্যা মীরার প্রত্যাবর্তন কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, সেটা উপন্যাস থেকে জানবার উপায় নেই। পাছে কেউ ভুল বোঝেন, তাই বলে রাখা ভালো, কুমুদিনীর পিতা এবং মীরা দেবীর পিতা রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে বিন্দু-বিসর্গের মিল নেই।

এতদিন এ-সব বিষয়ে আমি সবিস্তর আলোচনা করাটা যতখানি পারি এড়িয়ে গিয়েছি কারণ মীরাদির স্নেহ আমি বাল্যবয়সে পেয়েছি। তাঁর মেয়ে নন্দিতা ডাক নাম 'বুড়ী'-কে আমি তার পাঁচ বৎসর বয়স থেকে চিনি। আমার বয়স তখন ষোল (নীতুর বয়স নয়); পাঁচ বৎসর ধরে নানা মান-অভিমানের ভিতর দিয়ে আমাদের প্রতি সম্পর্ক নিবিড়তর হয়। এর প্রায় ত্রিশ বৎসর পর দিল্লীতে আমরা যখন প্রতিবেশী তখন তো আর কথাই নেই। এর দশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ গত হয়েছেন। বুড়ীর সঙ্গে শেষ দেখা হয় বছর চারেক পূর্বে। বুড়ী নিঃসন্তান বলে কথাবার্তার সময় আমি কাচ্চাবাচ্চাদের প্রসঙ্গ কখনো তুলতুম না। এখন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ, তাঁর স্ত্রী প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী, তাঁর সন্তানদ্বয় কেউ আর এলোকে নেই; আমার অক্ষম লেখা কারো পীড়ার কারণ হবে না।

এক যে ছিল চাঁদের কোণায়
চরকা-কাটা বুড়ী,
পুরাণে তার বয়স লেখে
সাতশ' হাজার কুড়ি।

রবীন্দ্রনাথ ১৯২১-এ যখন এ-কবিতাটি লেখার পরদিন আমাদের পড়ে শোনান, তখন বুড়ী সেখানে উপস্থিত ছিল। পাঁচ বছর বয়সের বুড়ী কবিতাটির আর

কতখানি বুঝবে। তবে তার দাদা নীতুর বয়স নয়। সে নিশ্চয়ই অনেকখানি বুঝেছিল। মাঝে মধ্যে বুড়ীকে 'বুড়ী বুড়ী' বলে ক্ষ্যাপাতো বলে ঐ কবিতার শেষের দিকে আছে :

বয়সখানার খ্যাতি তবু
রইল জগত জুড়ি
পাড়ার লোকে যে দেখে সেই
ডাকে, 'বুড়ী বুড়ী'।

নীতুর মত সুন্দর প্রিয়দর্শন ছেলে আমি জীবনে কমই দেখেছি। তার বিশেষ বন্ধু ছিল, আমার রুমমেট চাটগাঁয়ের (বোধ হয় পাহাড়তলী অঞ্চলের) জিতেন হোড়। নীতু প্রায়ই আমাদের রুমে এসে গালগল্প জমাতো। সে ছিল স্বল্পভাষী, আর জিতেন কথা কম বললেও ছিল বাক-চতুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন পুত্র কন্যাকে কতখানি ভালোবেসেছিলেন সে আমার জানার কথা নয়, কিন্তু নীতুকে তিনি তাঁর সমস্ত হৃদয় উজাড় করে যে কতখানি ভালোবেসেছিলেন তার সাক্ষ্য দেবে সে যুগের দু'পাঁচজন যাঁরা এখনো এ পারে আছেন।

পাঠকের মনে থাকতে পারে কবির 'ঠাকুরদা' গল্পে নয়নজোড়ের বাবুদের কাহিনী। সে বাবুদের শেষ বংশধর পাড়ার ঠাকুরদা অর্থাভাবে "ভৃত্যাভাবে অনেক সময় ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া তিনি নিজের হস্তে অতি পরিপাটি করিয়া ধুতি কোঁচাইতেন এবং চাদর ও জামার আস্তিন বহু যত্নে ও পরিশ্রমে গিলে করিয়া রাখিতেন—"

রবীন্দ্রনাথের 'ভৃত্যাভাব' ছিল না এবং তাঁর উড়িয়া সেবক বনমালী যে পাঞ্জাবির আস্তিন ও ধুতির কোঁচা খুব একটা সাধারণভাবে গিলে করতো, তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিপুণ হাতের সুচিক্কণ গিলে করার পদ্ধতির সঙ্গে সে পাল্লা দিতে পারবে কেন? একদিন নীতু এসেছে আমাদের রুমে। পরনে গিলে করা 'অতি পরিপাটি' সিল্কের ধুতি পাঞ্জাবি, কাঁধে সিল্কের উড়ুনি। আমাদের জানালে সে দিনটা তার জন্মদিন। শেষটায় ধরা পড়লো, স্বয়ং দাদামশাই স্বহস্তে কাপড়-জামা গিলে করে তাকে সাজিয়ে দিয়েছেন।

১৯৩১-৩২-এ নীতু জর্মনিতে গেল পড়াশুনো করতে। কয়েক মাসের ভিতরই হল ক্ষয় রোগ। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সখা সি এফ এ্যাণ্ড্রুজ বিলেত থেকে জর্মনি গেলেন তার দেখ-ভাল করতে। অবস্থা খারাপের দিকে খবর পেয়ে মীরা দেবীও গেলেন জর্মনি। ঐ সময় বরানগরে রবীন্দ্রনাথ কিছু দিন কাটাতে এসেছেন প্রশান্ত রাণী মহলানবিশের সঙ্গে। ৭ই অগস্ট (আমি প্রচলিত বইপত্রে সঠিক

তারিখ বের করতে পারিনি) নীতু মারা গেল।

রাণী মহলানবিশ লিখছেন, "পরদিন রয়টারের টেলিগ্রামে দেখলাম জার্মানীতে নীতুর মৃত্যু হয়েছে।" এ খবরটা রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাঙা যায় কি প্রকারে ?

"শেষে স্থির হল খড়দায় কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে ফোন করে আনিয়ে আমরা চারজন এক সঙ্গে কবির কাছে গেলে কথাটা বলা হবে। প্রতিমাদিরা এলে সবাই মিলে কবির ঘরে গিয়ে বসা হল। রথীন্দ্রনাথকে কবি প্রশ্ন করলেন, "নীতুর খবর পেয়েছিস ? সে এখন ভাল আছে, না?" (এর কারণ কবি তার আগের দিন, এনগুজের কাছ থেকে চিঠি পান—তখনো এ্যার মেল চালু হয়নি—যে, নীতুর তখন একটু ভালোর দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে—লেখক) রথীবাবু বললেন, "না, খবুর ভালো না।" কবি প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। (ঐ সময় থেকেই কবি কানে একটু খাটো হয়ে গিয়েছিলেন—লেখক)। বললেন "ভালো ? কাল এনগুজও আমাকে লিখেছেন যে নীতু অনেকটা ভালো আছে। হয়তো কিছুদিন পরেই ওকে দেশে নিয়ে আসতে পারা যাবে।" রথীবাবু এবারে চেষ্টা করে গলা চড়িয়ে বললেন, "না, খবর ভালো নয়। আজকের কাগজে বেরিয়েছে।" কবি শুনেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে রথীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। একটু পরেই শান্তভাবে সহজ গলায় বললেন, "বৌমা আজই শান্তিনিকেতনে চলে যান, সেখানে বুড়ি একা রয়েছে।"

এটা যে কত বড শোক তার জন্যে কোন মন্তব্য বা টীকার প্রয়োজন হয় না। ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেয়ে মীরার জন্য যে দুটি কবিতা লেখেন, তিনি বা মীরাদি তখন কোনো পত্রিকায় সে দুটি প্রকাশ করেননি। প্রকাশিত হয় তিন বৎসর পরে "বীথিকা" কাব্যগ্রন্থে ; তাই অনেকেরই দৃষ্টি এ কবিতা দু'টির প্রতি আকৃষ্ট হয়নি।...সকলেই জানেন, ঈশ্বরে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল অতিশয় গভীর। 'দুর্ভাগিনী' কবিতায় স্তম্ভিত হয়ে দেখি, সে বিশ্বাসে চিড় লেগেছে।

"—চিরচেনা ছিল চোখে চোখে
অকস্মাৎ মিলালো অপরিচিত লোকে।"

তখন দুর্ভাগিনী মাতা যখন সান্ত্বনার জন্য ইষ্টদেবতার সম্মুখীন হল তখন কি পেল সে।

"—দেবতা যেখানে ছিল সেথা জ্বালাইতে গেলে ধূপ, সেখানে বিদ্রূপ।"

ঈশ্বর-বিশ্বাসীজন এর চেয়ে নির্মম নিষ্ঠুর কী বলতে পারে! ঈশ্বর বিদ্রূপ করেন।

এখানেই কি শেষ? প্রায় তাই। কিন্তু দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করলে তার মূল্যও দিতে হয়। একে একে অনেক বন্ধু চলে গেলেন ওপারে। এদিকে তাঁর শরীরও ভেঙে পড়েছে। মৃত্যুর ষোল মাস পূর্বে খবর এল কলকাতায় এনণ্ড্রুজ গত হয়েছেন। বন্ধুত্ব তো ছিলই কবে, সেই নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগের থেকে, তদুপরি বিশ্বভারতীর বছরের পর বছর ব্যাপী অর্থকষ্ট কঠিন সঙ্কটে পৌঁছলেই কবিকে না বলে, এণ্ড্রুজ তাঁর মিত্র মহাত্মা গান্ধীর মাধ্যমে অহমদবাদের কোটিপতিদের কাছ থেকে বিপদতারণ অর্থ সংগ্রহ করতেন। এনণ্ড্রুজের স্বাস্থ্য ছিল কবির চেয়ে অনেক ভালো। কবির মানসপুত্র, বিশ্বভারতীর খুল্লতাত চলে গেলেন জনকের আগে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, কিন্তু পাঁচটি বৎসর তিনি আমাদের সেই গ্রীক লাতিন থেকে আরম্ভ করে বর্তমান ইংরেজি সাহিত্য পড়িয়েছেন। আরো কত কী! সে তো ভোলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে-ভাইপোকে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন, তাঁর চেয়ে মাত্র এগারো বছরের ছোট সুরেন্দ্রনাথ গত হলেন ঠিক তার এক মাস পরে, কবির জন্মদিনের মাত্র চার দিন পূর্বে :

আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয়-মৃত্যুবিচ্ছেদের এসেচে সংবাদ

সর্বশেষে লিখছেন, শেষ জীবনে সুরেন্দ্রনাথের ভাগ্য বিপর্যয়ের স্মরণে, যেটি পূর্বেই উল্লেখ করেছি,

তাঁর মৃত্যুর জ্বলন্ত শিখায়
আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্ম মৃত্যু এক
হয়ে আছে ;
সে মহিমা উদবারিল যাহার উজ্জ্বল
অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে।

শোকের পর শোক, প্রতি শোকে কবি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বার বার অনুসন্ধান করছেন,—এ কী সব অর্থহীন? এর চরম মূল্য কি কোনোখানেই নেই?

অথচ তিনি অতি উত্তমরূপেই জানতেন, এ সংসারে এমন কোনো মহা সুপার-ম্যান অবতীর্ণ হননি যাঁর তিরোধানবশতঃ ভাবল্লোক গভীর শোকসাগরে নিমজ্জিত হবে, কিম্বা আপন আপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দের দ্বার খুলে তার থেকে নিষ্কৃতির পথ খুঁজে নেবে না। তাই তাঁর শেষ জন্মদিনের প্রাক্কালে বলছেন :

জানি জন্মদিন
এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এখনি,
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে
পুষ্পবীথিকার ছায়া এ-বিষাদে করে না করুণ,
বাজে না স্মৃতির কথা অরণ্যের মর্মরে গুঞ্জনে
নির্মম আনন্দ এই উৎসবের বাজাইবে বাঁশি
বিচ্ছেদের বেদনারে পথপার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া।

অতি সত্য কথা। কিন্তু যে লোকটা আমাদের এত কিছু দিয়ে গেল, অনাগত যুগের তরেও তুলনাহীন বৈভব রেখে গেল, তাঁকে স্মরণ করবো না এই দিনে? এই দ্বন্দ্বর কি কোন সমাধান নেই? যে এত দিল তাকে স্মরণে না আনা সে তো ছলনা।

কবিগুরুর সর্বশেষ কবিতা স্মরণে আনি:

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে,
হে ছলনাময়ী!

এক দিকে "বিচ্ছেদ বেদনা", অন্য দিকে "নির্মম আনন্দ" এ তো ছলনা। তাই

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার॥

রামানন্দ-তর্পণ

স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রাপ্য সম্মানের শতাংশের একাংশও পাবেন বলে আমি আর আশা করি না।

এই যে আজ আমরা অজন্তা বাঘ গুহার ছবি নিয়ে এত দাপাদাপি করি, অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ নন্দলাল বসুর কীর্তিকলাপ নিয়ে গর্ব অনুভব করি,— আমাদের চোখের সামনে এঁদের তুলে ধরলো কে? এবং তখন তাঁকে কী অন্যায় প্রতিবাদের সামনে না দাঁড়াতে হয়েছিল। শুধু প্রতিবাদ নয়, নীচ আক্রমণ।

আজ আর তাই নিয়ে ক্ষোভ করি না। তার কারণ, প্রতিবাদ এবং ভিন্নমত (অপজিশন) না থাকলে অসৎ মানুষ যে আরো কতখানি অসততার দিকে এগিয়ে

যায় সে তো আজ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পারছি। রামানন্দের শতদোষ থাকতে পারে কিন্তু তিনি অসৎ একথা বললে আমাদের মত লোক মানবজাতির উপর শ্রদ্ধা হারাবে। তিনি সৎ ছিলেন তৎসত্ত্বেও তাঁর অপজিশনের দরকার ছিল। পেয়েছিলেন পূর্ণমাত্রার চেয়েও বেশী।

এই বক্তব্যটি আবার উল্টো করেও দেখা যায়।

আশুতোষ কৃতী পুরুষ। রামানন্দ ও আশুতোষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। কিন্তু একটি বিষয়ে দুজনাতে বড়ই মিল। দুজনাই জহুরী। ভারতের সুদূরতম প্রান্তের কোন্ এক নিভৃত কোণে কে কোন্ গবেষণা নিয়ে পড়ে আছে, আশুতোষ ঠিক জানতেন। তাকে কি করে ধরে নিয়ে আসা যায় সেই সন্ধানে লেগে যেতেন। রামানন্দের বেলাতেও ঠিক তাই। কোথায় কোন্ এক অখ্যাত-নামা কাগজে তার চেয়েও অখ্যাতনামা এক পণ্ডিত তিন পৃষ্ঠার একটি রচনা প্রকাশ করেছে—ঠিক ধরে ফেলতেন রামানন্দ। আপন হাতে চিঠি লিখে তাঁকে সবিনয় অনুরোধ জানাতেন তাঁর কাগজে লেখবার জন্য। শুধু তাই নয়, এ-পণ্ডিত কোন্ বিষয়ে হাত দিলে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিপূর্ণ জ্যোতি বিকশিত হবে সেটি ঠিক বুঝতে পারতেন—সে দিকে ইঙ্গিতও দিতেন কোনো কোনো স্থলে।

তাই রামানন্দ ছিলেন আশুতোষের অপজিশন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন কৈশোরে পা দিয়েছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি অতিশয় স্বাভাবিক। আশুতোষ তার গুরু, রামানন্দ তার গার্জেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সৌভাগ্য যে সে এই মণি-কাঞ্চন সংযোজিত বিজয়মাল্য একদিন পরতে পেরেছিল।

* * *

সে যুগের প্রবাসীতে এক মাসে যা নিরেট সরেস বস্তু বেরুতো, এ যুগের কোনো মাসিক কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকা পূর্ণ এক বছরেও তা দেখাতে পারবে না। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করি,—ঈশান ঘোষ 'জাতক' অনুবাদ করলেন বাঙলায় (জর্মন, হিন্দী বা অন্য কোনো অনুবাদ তার শত যোজন কাছেও আসতে পারে না) এবং তার সমালোচনা করলেন বিধুশেখর। এ যুগে কই ঈশান, কোথায় বিধুশেখর? এ সুবাদে আরেকটি কথার উল্লেখ করি। রামানন্দের উৎসাহ না পেলে বহু পণ্ডিতই হয়তো তাঁদের গবেষণা ইংরেজিতে প্রকাশ করতেন; বাঙলা সাহিত্যের বড় ক্ষতি হত।

* * *

রামানন্দ ছিলেন চ্যামপিয়ন অব্ লস্ট কজেস্—তাবৎ বাঙলা দেশে দু'জন

কিংবা তিনজন হয়তো লেখাটি পড়বে, তিনি দিতেন ছাপিয়ে, কারণ দার্শনিক রামানন্দ জানতেন 'কান্টিয় দর্শন ও পতঞ্জলির পথমধ্যে কোলাকুলি'[১] জাতীয় প্রবন্ধ লিখতে পারে এমন লোক দ্বিজেন্দ্রনাথের মত আর কেউ নেই। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে রামানন্দ মাসের পর মাস দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অপাঠ্য' প্রবন্ধরাজি প্রকাশ করেছিলেন, কারণ দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রায়ই কোনো প্রবন্ধ লেখার কিছুদিন পরেই সেটি ছিঁড়ে ফেলতেন। (ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আমার যেটুকু সামান্য জ্ঞান সে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বাকিটুকু রমন মহর্ষির কাছ থেকে ও বিবেকানন্দ পড়ে। হিন্দু দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাকে সূফীতত্ত্বের মূল মর্মকথা বুঝিয়ে দেন। সূফী-তত্ত্বে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে)।

এই দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঙলায় শর্টহ্যাণ্ড বই ছাপিয়েছিলেন। তার ১২।১৪ বছর পর রামানন্দের অনুরোধে বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ সেটি আবার নূতন করে লেখেন। রামানন্দ তাবৎ বইখানা নিজের খর্চায় ব্লক করে ছাপান (কারণ এতে প্রতি লাইনে এত সব সিম্ব্‌ল্ বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন ছিল যে এছাড়া গত্যন্তর ছিল না)। এটা আরেকটা লস্‌ট্ কজ্। এ রকম বই কেউ পড়েও না। কিন্তু রামানন্দ ঘন ঘন তাড়া না লাগালে এই অতুলনীয় পুস্তক সৃষ্ট হত না।

আবার অন্যদিকটা দেখুন। পাবলিসিটি কারে কয় সেটা মার্কিনদের পূর্বেই রামানন্দ জেনে গিয়েছিলেন। সে যুগের যে কোনো 'প্রবাসী' সংখ্যা নিলেই পাঠক তত্ত্ব কথাটি বুঝে যাবেন।

রামানন্দ কোহিনূর বেচতেন আবার সঙ্গে সঙ্গে মুড়িও বেচতেন। কিন্তু কখনো ভেজাল বেচেননি।

এই পাব্‌লিসিটি ব্যাপারে স্বর্গত চারু বাঁড়ুয্যেকে স্মরণে এনে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানানো উচিত।

'প্রবাসী'র কথা (এবং শুদ্ধমাত্র সে কথা লিখতে গেলেই পুরোপুরি একখানি ভলুম লিখতে হয়; আমার মনে হয় প্রবাসীর কর্মকর্তারা যদি 'প্রবাসী সঞ্চয়ন' জাতীয় একটি ভলুম বের করেন তবে বড় ভালো হয়—এতে থাকবে প্রবাসী থেকে বাছাই বাছাই জিনিস) বাদ দিলেই আসে 'মডার্ণ রিভ্যু'র কথা। তখনকার দিনে মডার্ণ রিভ্যু খাস লণ্ডনে প্রচারিত যে কোনো কাগজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতো। আজও প্রাচ্যভূমিতে এর চেয়ে সেরা ইংরিজি মাসিক বেরোয়নি।

১। হুবহু শিরোনামাটি আমার মনে নেই বলে দুঃখিত।

প্রবাসী ও মডার্ণ রিভ্যু ('বিশাল ভারতে'র সঙ্গে আমি পরিচিত নই ; পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে—'হিন্দীর পৃষ্ঠপোষক রামানন্দ'—লিখবেন) এই পত্রিকার মাধ্যমে রামানন্দ ভারতের রাজনৈতিক চিন্তায় এনে দেন স্পষ্ট চিন্তন, স্পষ্টভাষণ ও সর্বোপরি নির্ভীকতম সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রচার। আমার মত বহু মুসলমান তখন রামানন্দকে চিন্তার জগতে নেতা বলে মেনে নিয়েছিলেন।

তারপর এমন একদিন এল যখন তাঁকে অনুসরণ করা আমার পক্ষে আর সম্ভবপর হল না। কিন্তু একশ বার বলবো, তিনি তাঁর বিবেকবুদ্ধিতে যেটি সত্য-পথ বলে ধরে নিয়েছিলেন সেই পথেই এগোলেন। কোন সস্তা রাজনীতির চাল তাতে এক কানাকড়িও ছিল না।

বিশ্বভারতীতে আমি ছাত্র থাকার সময় পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রামানন্দ কিছু-দিনের জন্য অধ্যক্ষ ছিলেন। সে-সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য না হয়েও তাঁর সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছি। অন্য সব কথা বাদ দিন, আমাকে শুম্ভিত করেছিল তাঁর চরিত্রবল। এবং সঙ্গে সাতিশয় মৃদুকণ্ঠে কঠোরতম, অকুণ্ঠ সত্যপ্রচার।

* * *

এদেশে এরকম একটি লোক আজ চাই। কর্তাদের কানে জল ঢেলে দেওয়ার জন্য।

* * * *

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

অনাদিদেব! অনন্ত ভব!
শতং জীব! সহস্রং জীব!!

একদা শান্তিনিকেতন আশ্রমে সংগীতের কর্ণধার ছিলেন—অবশ্য কবিগুরুকে বাদ দিয়ে—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী। পরম শ্রদ্ধেয় মমাগ্রজসম শ্রীযুত অনাদিকুমার দস্তিদার (শতং জীব, সহস্রং জীব !) তখন ছাত্র। কিন্তু আমি তাঁকে কখনো ছাত্র বলে ভাবতেই পারিনি। তাঁর আসন কার্যত এই দুই গুরুর পদপ্রান্তে ছিল বটে, কিন্তু অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের তুলনায়—ফরাসী-ইংরাজী-বাংলা ক্লাসে আমার সতীর্থা, সুকণ্ঠী, সুবিনয়ী অনন্ত সুরলোকবাসিনী শ্রদ্ধেয়া রমা মজুমদার—যাঁর অকাল মৃত্যুতে কবিগুরুর শোক তাঁর পরমাত্মীয়া-বিয়োগ শোককেও প্রায় অতিক্রম করেছিল—একমাত্র ইনি ছাড়া শ্রীঅনাদি ছিলেন অনেক উচ্চে ; দুই গুরুর আদেশনির্দেশ শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রভৃতি সর্বকর্মের অব্যবহিত

প্রধান। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি রচনায় মনোনিবেশ করলেন। অভিজ্ঞজনমাত্রই জানেন, এক সংগীতসাধনাই মানুষকে অজগরের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে, তদুপরি তাঁর স্কন্ধে চাপানো হল বিশ্বভারতীর "সাহিত্য সভার" সম্পূর্ণ কর্মভার। ঐটিই ছিল সেকালে বিশ্বভারতীর মায় কলাভবনাদির বয়স্ক ছাত্রছাত্রী তথা শিক্ষকদের সাহিত্যচর্চার একমাত্র মুক্ত, পাঞ্চজন্য প্রতিষ্ঠান। গুরুদেব শান্তিনিকেতনে থাকলে সর্বদাই এর অনুষ্ঠানাদির সভাপতিত্ব করতেন। একে তো অধিকাংশ আশ্রমবাসী, সহজেই অনুমেয় কারণে, গুরুদেবের সম্মুখে প্রবন্ধ পাঠ করতে সংকোচ এমন কি কিঞ্চিৎ শঙ্কা অনুভব করতেন, তদুপরি গুরুদেবের নিয়মনিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা, রুচিসম্মত পদ্ধতিতে সভার আয়োজন করা, পরবর্তী সভায় পূর্ব সভার সুষ্ঠু প্রতিবেদন রচনা করা যে কোনো আর্টস্ বিভাগের ছাত্রের পক্ষেই নিঃসন্দেহে সুকঠিন কর্মরূপে বিবেচিত হত; এবং অনাদিদা ঐ সময়ে যুগপৎ অভ্যাস করছেন শাস্ত্রীয় ও রবীন্দ্রসংগীত, তদুপরি নবাগতদের সংগীতে শিক্ষাদান, এবং স্বরলিপি রচনায় প্রচুর কালক্ষেপণ। ইতিমধ্যে যদি বাইরের কোনো কলেজ থেকে ক্রিকেট বা ফুটবল টীম খেলার নাম করে শান্তিনিকেতনের "চিড়িয়াখানা" দেখতে আসতো তখন অনাদিদার উপরেই ভার পড়তো সন্ধ্যাবেলায় তাদের জন্য সংগীতামোদের ব্যবস্থা করা।

অজাতশত্রু নিরীহ, স্বল্পভাষী এই লোকটির স্কন্ধে যে কত প্রকারের গুরুভার বে-দরদ চাপানো হয়েছিল তার ফিরিস্তি তিনি, স্বয়ং, আজ আর দিতে পারবেন না।

হয়তো বা আমিই সেই লাস্ট্ স্ট্র দ্যাট ব্রোক দি ক্যামেল্স্ ব্যাক!

তাই যদি হয়, তবে সে অপরাধের জন্য অংশত দায়ী শ্রীযুত অনাদি।

অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই এ-স্থলে বলে রাখি, অনাদিদার রবীন্দ্রসংগীতানুভূতি ও জ্ঞান, শাস্ত্রীয় সংগীতের পটভূমিতে রবীন্দ্রসংগীত পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ, সে সংগীতের ক্রমবিকাশ বিবর্তন, রবীন্দ্রসংগীতের প্রচলিত স্বরলিপির মূল্যায়ন, সে-যুগে দিবান্ধ কলকাতাতে রবীন্দ্রসংগীত প্রবর্তন—এর কোনোটা সম্বন্ধেই আমার মতামত প্রকাশ করাটা হবে অমার্জনীয় অপরাধ। বাইরের থেকে শুধু এইটুকু বলতে পারি, সর্বশেষের কর্মটি করতে গিয়ে তাঁকে বিস্তর তিক্ততা, অর্থকৃচ্ছ্রতা, রুচিহীনের সদম্ভ প্রলাপ এবং উপদেশ, একাধিক স্থলে বাধ্য হয়ে "ভঁয়সকে সামনে বীণ বাজানা" অর্থাৎ সুর-কালা প্যাঁচাগলা মুর্গী-মগজ 'কলচর'-লোভিনী বিত্তবান-নন্দিনীকে রবীন্দ্রসংগীত শেখাবার বন্ধ্যাগমন (শেষোক্তটি অনাদিদার জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষীর মুখে শোনা) ইত্যাদি নানাপ্রকারের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে

হয়েছিল। যে নম্রস্বভাব স্বল্পভাষী প্রিয়দর্শন তরুণকে প্রায় "মুখচোরা" বলা যেতে পারে, তাঁর ছিল, সুপ্রতিষ্ঠিত জনের পক্ষে প্রশংসনীয়, নবীন পন্থা নির্মাণ-কারীর পক্ষে নিন্দনীয় একটি অপরিবর্তনীয় স্বভাব—তর্কাতর্কির প্রতি প্রকৃতিগত সহজ অনীহা, কিন্তু প্রচুরতম সহিষ্ণুতা মিশ্রিত। সহিষ্ণুতা মিশ্রিত ধৈর্যকে কুরান শরীফ এক শব্দে বলেন "সব্‌র্" যার থেকে বাংলা "সবুর্" সুদ্ধমাত্র অপেক্ষা করা, স্থল-বিশেষ ধৈর্য ধারণ করা অর্থে ব্যবহার হয়। আল্লাতালা অগণিতবার তাঁর প্রেরিত পুরুষকে অবিশ্বাসীদিগের প্রতি "সব্‌র" করতে আদেশ দিয়েছেন। অনাদিদেব অকৃপণ হস্তে এই মহৎ গুণটি অনাদিদার উপর বর্ষণ করেছিলেন।

এসব গুণ নির্ণয় আমার পক্ষে ধৃষ্টতা—কিন্তু অনাদিদার অফুরন্ত "সব্‌র্"ই আমার ভরসা। কারণ তিনি শব্দার্থে, ভাবার্থে, সর্বার্থে ছিলেন আমার গার্জেন, এখনো তাঁকে গার্জেনরূপেই মানি। আমি স্থির প্রত্যয়, তিনি আমাকে কখনো বর্জন করতে পারবেন না। আমি পাষণ্ডতর আচরণ করলেও। তাঁর স্নেহ আমার নিকৃষ্ট রচনাকে আদরের চোখে দেখে।

একে বাঙাল,—খাজা বাঙাল—তদুপরি বাচাল, সর্বোপরি সহজ মেলামেশায় অভ্যস্ত মহিলা মিশ্রিত ব্রাহ্মসমাজ ঘেঁষা তৎকালীন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আবহাওয়া বাবদে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, বয়স ষোল বছর হয়-কি-না-হয়, চঞ্চল প্রকৃতির মুসলমান ছেলের পক্ষে সে বাতাবরণে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উৎকট সংকট, বিভীষিকাময় খণ্ড প্রলয় থেকে তাকে উদ্ধার করেন, আশ্রয় দেন, প্রথম দিন থেকেই ; স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, সম্ভ্রান্তবংশজাত অতি সহজ আড়ম্বর-হীন আচরণ দ্বারা, পথ নির্দেশ করেন সামান্যতম নিতান্তই অবর্জনীয় দু'চারিটি শব্দ দ্বারা—অনাদিদা। শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমার গার্জেন। তাঁর শান্ত সমাহিত আচরণ সংযতবাক্ দিক নির্দেশ আমাকে প্রথম দিনই মুগ্ধ করেছিল, তিনি তাবৎ ছাত্রদের মধ্যমণিরূপে কতখানি সম্মানিত—সে-সত্য-নির্ধারণ করতে আমাকে আশ্রম পরিক্রমা করতে হয়নি—এদের মধ্যে আছেন আশ্রমপালিত লেখকদের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীযুত প্রমথনাথ, পাণ্ডিত্য তথা রসময় সর্বরচনপদ্ধতিতে সিদ্ধহস্ত বাগ্‌বিদগ্ধ গোস্বামীগৌরব শ্রীযুত পরিমল, অহরহ চটুল হাস্যরসে উচ্ছলিত শ্রীযুত অনিলকুমার, প্রসিদ্ধ চিত্রকর সত্যেনদা, বিনোদবিহারী, সিংহলাগত কিশোর শ্রমণ শরণাঙ্কর সাধু, একাধিক ভাষায় অগ্রগামিনী এবং স্বল্পকাল মধ্যেই নৃত্যকুশলীরূপে সুপরিচিতা শ্রীমতী হটীসিং (ঠাকুর), সর্বসংগীত প্রচেষ্টায় অনাদিদার প্রীতিময়ী সহচারিণী রমা মজুমদার··· কিন্তু এ-নির্ঘণ্ট অফুরন্ত। স্বয়ং গুরুদেব, দিনেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী তাঁকে

শুধু যে অশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন তাই নয়, ছাত্রদের মধ্যে তিনি যে রবি-সঙ্গীতের ভাণ্ডারী, কার্যত সেটা বার বার স্বীকার করেছেন তাই নয়—আমার মনে হয়, শিষ্যকে গুরু যে স্বীকৃতি যে সম্মান দিতে পারেন অনাদিকুমার পেয়েছিলেন সেটি পরিপূর্ণমাত্রায়। তাঁর পূর্বে বা পরে কোনো শিষ্য গুরুপদপ্রান্ত থেকে এতখানি সম্মান আহরণ করতে পারেননি।

কিন্তু আজ যতই প্রাচীন দিনের ছবি চোখের সামনে তুলে ধরি ততই মনে হয়, এ-সব কারণ তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রতিদিন গভীরতর করেছে বটে কিন্তু তিনি আমার গার্জেন ছিলেন একেবারে অকারণে, আমি তাঁর প্রথম আদেশেই দ্বিধাহীন চিত্তে কেন পালন করেছিলুম তার কারণ অনুসন্ধান করার কোন প্রয়োজন আমি কস্মিনকালেও অনুভব করিনি। বাহান্ন বৎসর পর আজও তিনি আমার গার্জেন। কারণ অনুসন্ধান করে আমার কোন্ মোক্ষলাভ হবে? এই বৃদ্ধ বয়সে আমি গার্জেনহীন হতে চাইনে।

ইন্দিরা সঙ্গীত শিক্ষায়তন স্মারণ গ্রন্থে প্রকাশিত।

মরহুম শেখ মুহম্মদ মুস্তাফা অল-মরাগী

অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ওস্তাদ শেখ অল-মরাগী দেহত্যাগ করিয়াছেন। অজহরে চীন, মালয়, ভারতবর্ষ, তুর্কীস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যপ্রাচ্য লইয়া একদিকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত, অন্যদিকে তুর্কী হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীস, আলবেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ইত্যাদি বল্কানদেশ ও রুশ, আফ্রিকার নানা প্রদেশ এমন কি আরব সাগরের মালদ্বীপ লাক্ষা দ্বীপ হইতে বহু মুসলমান ছাত্র অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যায়। তাহাদের জন্য ছাত্রাবাস আছে; ভারতবাসীদের জন্য বিশেষ বাসস্থান ও অন্যান্য বন্দোবস্ত আছে।

অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিঞ্চিৎ বর্ণনা এখানে হয়ত সম্পূর্ণ অবান্তর হইবে না। পৃথিবীর যে কোনো বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা ইহার বয়স অন্ততঃ তিনশত চারিশত বৎসর বেশী। ইয়োরোপে যখন বর্বর, অন্ধকার মধ্যযুগ তখন অজহরের বিদ্যায়তন গ্রীক দর্শনের আরবী তর্জমা বাঁচাইয়া রাখিয়া তাহাকে বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভারতবর্ষ ও চীন বাদ দিলে সে যুগে অজহরই ছিল মধ্য ও পশ্চিম ভূভাগের শিক্ষাকেন্দ্র। দমস্কস ও বাগদাদে পণ্ডিতরা যে জ্ঞান-চর্চা করিয়াছিলেন, তাহা কেন্দ্রীভূত হয় কাইরোর অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

পরবর্তী যুগে সেই অজহরের প্রচলিত ইবনে রুশদের (লাতিন ও বর্তমান

ইয়োরোপীয় ভাষায় আভেরস নামে খ্যাত) দর্শন লাতিন তর্জমাযোগে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। ইয়োরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তৃষ্ণার সৃষ্টি করেন ইবনে রুশদ ও ইবনে সীনা (আভিচেন্না বা আভিসেনা)। ইঁহাদের দৌত্যে ইয়োরোপ আপনার গ্রীক-দর্শন আবার ফিরিয়া পায়। তখনই প্রথম লাতিনে গ্রীক দর্শন, আয়ুর্বেদের অনুবাদ হইল। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে ছেলেরা যে গাউন পরে, তাহা অজহরের নকলে। মধ্যযুগে নিঃস্ব বিদ্যার্থীরা এই বিরাট গাউন বা 'আবায়' দ্বারা ছিন্নবস্ত্র ঢাকিয়া বিদ্যায়তনে উপস্থিত হইত।

এক হাজার বৎসর ধরিয়া ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা ফী-সবীলিল্লা (অর্থাৎ 'আল্লার পথে', দান-খয়রাতের ধর্মপথে) হিসাবে অজহরকে জমিজমা অর্থদা নকরিয়া গিয়াছেন। সে সম্পত্তির আয় এখন প্রচুর, কিন্তু অধ্যাপক ও ছাত্রসংখ্যা তদপেক্ষা প্রচুর। তবু অজহর কোনো ছাত্রের নিকট হইতে অর্থ (ফীজ্) গ্রহণ করেন না, প্রত্যেক ছাত্রের জন্য বাসস্থান দেয় ও প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক তিন হইতে পাঁচ টাকা দক্ষিণা দেয়। তাহারি জোরে নিতান্ত কপর্দকহীন ছাত্র দুই-তিনজনে মিলিয়া ক্ষুদ্র মেস করিয়া ও গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ আটা-আলু আনাইয়া দিন গুজরান করিতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে যখন বিদ্যা ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যদ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে, যখন ধন না থাকিলে তোমার বিদ্যায় অধিকার নাই, যখন ধন থাকিলে তুমি হেলাফেলায় বিদ্যায়তনের আবহাওয়া মর্জিমাফিক বিষাক্ত করিতে পারো, তখনও অজহর বিশ্বাস করে যে, বিদ্যায় সকলের সমান অধিকার! যে কোনো ছাত্র, যে কোনো দেশ হইতেই হউক অজহরে উপস্থিত হইয়া তাহার অতি অল্প আরবী জ্ঞান দেখাইতে পারিলেই বিদ্যায়তনে ভর্তি হইতে পারে ও বরাদ্দ দক্ষিণা পায়। পূর্বে অ-মুসলমান ছেলেদেরও লওয়া হইত, কিন্তু শুনিয়াছি, কয়েকটি ক্রীশ্চান পাদ্রী ছাত্র ধর্ম শিক্ষার ভান করিয়া নানা অপ্রিয় বাক্য বলিয়া এমন কাণ্ড করিলেন যে ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত অজহর তাঁহাদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে বলিল, কে জানে, কোন দিন তাঁহাদের 'প্রটেকশনে'র প্রয়োজন হইবে। এই আফ্রিকার আরেক অংশেই তো সেদিন এক নিগ্রোকে বলিতে শুনিলাম, ইয়োরোপীয়রা যখন প্রথম আমাদের দেশে আসিল, তখন তাহাদের হাতে ছিল বাইবেল, আমাদের ছিল জমি। এখন অজহরীর তুলনা করা ভুল হইবে।

অজহরের ছাত্ররা ধর্মশাস্ত্র পড়ে। সম্প্রতি ইংরিজি ফরাসী ইতিহাস, ভূগোল ও অন্যান্য বিষয়ও পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সর্বাপেক্ষা অভ্রভেদী নেশা খবরের কাগজ পড়ার। সকালে যে কোনো ক্লাসে প্রবেশ করুন না কেন, দেখিবেন শতকরা ত্রিশটি ছেলে আপন আপন খবরের কাগজ নিবিষ্ট মনে

পড়িতেছে। এদিকে পড়িতেছে তেরশত বৎসরের পুরানো শাস্ত্র ওদিকে দুনিয়ার হালচালের প্রতি কড়া নজর। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। আমাদের টোল বা মাদ্রাসার নিরীহ শান্ত ছাত্রের সঙ্গে অজহরীর তুলনা করা ভুল হইবে।

কাইরোতে আরো দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে; একটি মিশর সরকার চালান (অজহর নিজের সম্পত্তিতে চলে) ও অন্যটি মার্কিনরা। এই দুইটি আমাদের কলিকাতা-ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মত হরেকরকম্বা করে।

কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে অজহর পয়লা নম্বর।

সাইবেরিয়া হইতে জিব্রাল্টর পর্যন্ত শেখ অল-মরাগীর শিষ্যেরা শোকাতুর হইবেন। অনুমান করি, অন্ততঃ ছয় মাস ধরিয়া তার চিঠি, সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা, শেখের জীবনী ইত্যাদি পৃথিবীর নানা দেশ-বিদেশ হইতে নানা ভাষায় কাইরোর দিকে প্রবাহিত হইবে ও শেখের পূতজীবন ও অপূর্ব প্রতিভা বিশ্ব-মুসলিমকে কি প্রচুর পরিমাণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহা সপ্রমাণ করিবে।

অজহরের নিয়ম যে যিনি প্রধান শেখ বা রেক্টর হইবেন, তাঁহার শুধু পণ্ডিত হইলেই চলিবে না, তাঁহার চরিত্র যেন অকলঙ্ক হয়। অগাধ পাণ্ডিত্য ও অনাড়ম্বর ধর্মপরায়ণতার সম্মেলন শেখ অল-মরাগীতে ছিল বলিয়াই তাঁহার হাজার হাজার শিষ্যের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শেখের পাণ্ডিত্যের বিচার আজ করিব না। ধর্মভীরু ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অনিচ্ছায় রাজনীতিক্ষেত্রে নামিতে হইয়াছিল। শেখ বিশ্বাস করিতেন যে, দেশে যখন অত্যাচার অবিচার চলে, তখন তাহারই একপার্শ্বে সঙ্গোপনে ধর্মচর্চা করিয়া অনাচারকে নীরবে স্বীকার করিয়া লওয়া অধর্ম, পাপ। তাই যখন বিদেশী শক্তির চাপে পড়িয়া মিশরের রাজা ফুয়াদ ওয়াফদ দলকে তাড়াইয়া প্রচলিত শাসনবিধি উপেক্ষা করিয়া স্বিদকী পাশাকে 'চোটা মুসোলিনি' কায়দায় (তখনো হিটলার আসর জমাইতে পারেন নাই) ডিক্টেটর বানাইলেন ও স্বিদকী সদম্ভে প্রচার করিলেন যে তিনি 'বজ্র-বাহু দ্বারা মিশর শাসন করিবেন', তখন শেখ অল-মরাগী নির্ভীক বলদৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। স্বিদকীর প্ররোচনায় রাজা শেখকে হুকুম দিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য আশীজন ওয়াফদহিতৈষী অধ্যাপককে যেন বরখাস্ত করা হয়। শেখ উত্তর দিলেন যে, অধ্যাপকেরা ওয়াফদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া ধর্মাচরণ করিয়াছেন মাত্র। ইহাদিগকে শাস্তি দিবার কোনো কথাই উঠিতে পারে না। স্বিদকীর প্ররোচনায় রাজা অটল; বিদেশী শক্তিও অজহরের মেরুদণ্ড ভাঙিতে পণ করিয়াছে।

শেখ পদত্যাগ করিলেন। তামাম মধ্যপ্রাচ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলের মুখে এক প্রশ্ন, রাজা শেখের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিলেন কি করিয়া।

স্বিদকী তাঁহারই এক ক্রীড়নককে অজহরের শেখ নিযুক্ত করিলেন—কোনো ধর্মভীরু পণ্ডিতই তখন স্বিদকীর পদলেহন করিতে সম্মত হন নাই। নূতন শেখ আশীজন দেশমান্য অধ্যাপককে পদচ্যুত করিলেন। অজহরের হাজার বৎসরের ইতিহাসে ঐ একমাত্র মর্কট সিংহাসনে বসিয়াছিল।

তারপর অজহরের ছাত্রেরা যে কাণ্ড করিল, তাহা স্বিদকী সম্প্রদায়ের চিরকাল মনে থাকিবে। ট্রাম জ্বালাইয়া বাস পোড়াইয়া, বোমা ফাটাইয়া স্বিদকীর স্বাধিকার প্রমত্ততাকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিল। বাঙালী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন যে, সা'দ জগলুল পাশার আমল হইতে আজ পর্যন্ত মিশরে যত রাজনৈতিক আন্দোলন হইয়াছে, তাহাতে নেতা ও কর্মীর অধিকাংশ অজহরী। তাঁহাদের জাল মিশরের সর্বত্র ছড়ানো। তুলনাস্থলে ১৯২০-এর খেলাফত আন্দোলনের একাগ্রতা পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেই।

স্বিদকীর মেরুদণ্ড ভাঙিল। আন্দোলনের শেষ দিকে তাহার দক্ষিণহস্তে সেই দম্ভকর বজ্রবাহুতে পক্ষাঘাত হইল। মিশরী পরম সন্তোষের সঙ্গে বলিল—'আল্লা-হু-অকবর'। বিদেশী শক্তি ম্রিয়মাণ। রাজার চেতনা হইল। ওয়াফদকে আবার ডাকা হইল।

অজহরের ছাত্রেরা পরমানন্দে শেখ অল-মরাগীকে অজহরে ফিরাইয়া আনিতে গেল। শেখ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, যে দেশের রাজা বিদেশীর ক্রীড়নক হইয়া গণ্যমান্য দেশপ্রিয় অধ্যাপকদের লাঞ্ছনা করে, তাহার অধীনে কর্ম করার মত বিড়ম্বনা আর কিছু নাই। ছাত্রেরা অনেক অনুনয় বিনয় করিল; কিন্তু শেখ অটল। তখন তাহারা শেখের অন্ধ বৃদ্ধ গুরুর দ্বারস্থ হইল। তিনি বলিলেন, 'শেখকে গিয়া বল আমি বৃদ্ধ, মৃত্যুর সম্মুখীন, কিন্তু এমন কোনো পুণ্য করিতে পারি নাই যে, জিন্নতের (স্বর্গের) আশা করিতে পারি। আমার একমাত্র ভরসা যে, মরাগীর মত শিষ্য আমার কাছে অধ্যয়ন করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যদি কর্তব্য-পথ হইতে বিচ্যুত হন, তবে জিন্নতে যাইবার আমার শেষ আশা বিলীন হইবে।'

শেখ অল-মরাগী তৎক্ষণাৎ গুরুবাক্য শিরোধার্য করিয়াছিলেন।

শেখের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা ছিল ইয়োরোপীয় সভ্যতার কতটুকু গ্রহণ করা যায়। বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় জগৎকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষণ অসম্ভব অথচ ইয়োরোপের জড়বাদের তাণ্ডবলীলা তাহার শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে দেশে প্রবর্তন করার অর্থ দীন-দুনিয়ার সর্বনাশ।

মনে পড়িতেছে, প্রশ্ন উঠিয়াছিল রেডিয়োতে কুরাণ পাঠ শাস্ত্রসম্মত কিনা। উগ্রপন্থীরা বলিলেন, রেডিয়োর প্রচুর চলতি শুঁড়িখানা ও বেশ্যালয়ে। সেই উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততার আবহাওয়ায় কুরাণ পাঠ কুরাণের অবমাননা। শেষ ফতোয়া দিয়াছিলেন, শেখ অল-মরাগী। তিনি বলিলেন, 'ধার্মিকের গৃহে কুরাণ পাঠ অহরহ হইতেছে। কিন্তু আমি চাই কুরাণ যেন সর্বত্র পৌঁছে। আকণ্ঠ নিমজ্জিত পাপী তো কুরাণ শুনিতে ধার্মিকের দ্বারস্থ হয় না। সুরাসক্ত যদি অনিচ্ছায়ও একদিন রেডিয়োতে কুরাণ পাঠ শুনিয়া বিচলিত হয়, ধর্মপথে চলিবার তাহার বাসনা হয়, তবে বেতার ধন্য হইবে।'

এই হিমালয়ের ন্যায় বিরাট পণ্ডিতের কথা যখন ভাবি, তখন মনে পড়ে তাঁহার ব্যবহারের জন্য শেখ সেই গাড়ী চড়িয়া দূর আবদীন প্রাসাদে যাইতেন রাজার সঙ্গে দেখা করিতে। সেই সময় মোটর ভ্রমণেচ্ছুক ছেলেরা, বিশেষতঃ গ্রাম্যরা শেখের অফিসের সামনে ঝামেলা লাগাইত। শেখ গাড়িতে উঠিয়া ছেলেদের ডাকিয়া যেন নৌকাতে কাঁঠাল বোঝাই করিতেন। কাহাকেও বাদ দিবার ইচ্ছা শেখের নাই অথচ গাড়ি যত বিরাটই হউক, সে তো গাড়ি। দামী রোলস বটে (এক ধর্মপ্রাণ শেখের ব্যবহারার্থ অজহরকে ভেট দিয়াছিলেন) কিন্তু শেখের আপসোসের অন্ত নাই যে, যথেষ্ট পরিমাণে প্রশস্ত নহে।

আবদীন প্রাসাদের সম্মুখে ছেলেরা নামিয়া যাইত। শেখ পই পই করিয়া আদেশ করিতেন, কেউ যেন ছিটকাইয়া না পড়ে; তিনি যাইবেন আর আসিবেন। তারপর দশবার করিয়া গুণিতেন কয়টি ছেলে আসিয়াছে ও দশবার করিয়া সে আদমশুমারী ভুলিয়া যাইতেন।

রাজাকে সৎপথে চলিবার উপদেশান্তে শেখ বাহির হইয়া সেই একপাল ব্যাঙকে এক ঝুড়িতে পুরিবার চেষ্টা করিতেন। কেউ এ কাফেতে ঢুকিয়াছে, কেউ ঐ দোকানে গুম হইয়া গিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিবার পথে শেখের দুর্ভাবনার অন্ত নাই। কেউ বাদ পড়িয়া যায় নাই তো, ড্রাইভারের আশ্বাসবাক্য কিছুতেই বিশ্বাস করিতেন না। বারে বারে বলিতেন, গাড়ি যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হইতেছে।

সেই শেখ জিন্নতবাসী হইলেন। আল্লাতালা তাঁহার আত্মাকে নিজের কাছে ফিরাইয়া লইয়াছেন। 'নিশ্চয়ই আমরা তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছি ও অবশ্যই আমরা তাঁহারই নিকটে ফিরিয়া যাইব।'

আনন্দবাজার পত্রিকা ২.৯. ১৯৪৫

পল্‌ডি

আমাদের দেশে কালিদাস সম্বন্ধে যে-সব গল্প চলতি আছে, তার অনেকগুলোই তাঁর প্রথম যৌবনের হাবামি নিয়ে। উত্তর ভারতেও নিরেট হাবামির গল্প বানানো হলে সেগুলো সাধারণতঃ শেখ চিল্লির ঘাড়ে চাপানো হয়। (এর উল্টো দিকও আছে—চালাকির গল্প বলতে হলে আমরা সেটা গোপালভাঁড়ের কাঁধে চাপাই)। এই করে করে কোনো কোনো দেশে অজ মূর্খামি অথবা মারাত্মক ফন্দিবাজীর গল্পগুলো কোনো এক বিশেষ কল্পনামূলক বা সত্যিকার চরিত্রের চতুর্দিকে জড়ো হয়।

জার্মানীতে নিরেট হাবামির গল্পগুলো জমেছে পল্‌ডি নামক মহাখানদানী, পয়সাওয়ালা এক হস্তীমূর্খের চতুর্দিকে। পল্‌ডির সবিশেষ পরিচয় দেবার দরকার নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে লোকটি অষ্টপ্রহর কিট-ফিটনাইন, দুনিয়ার তাবৎ লোকের সঙ্গে তার দহরম-মহরম এবং তার ব্রেন-বক্সে কিছু আছে কি-না সে সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অচেতন। গুণের মধ্যে দেখা যায়, পল্‌ডি অত্যন্ত সহৃদয় এবং খাঁটি খানদানী মনিষ্যির মত পাঁচজনকে আপ্যায়িত করবার জন্য তার চেষ্টা-ত্রুটির অন্ত নেই।

পল্‌ডির বাকি পরিচয় পাঠক নীচের লেখাগুলো থেকে পাবেন।

"সে কি পল্‌ডি, আমাকে এখনো চিনতে পারছিস নে? স্কুলে তোরি পাশে এক বেঞ্চিতে বসতুম যে!"

"মাফ করবেন। আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন। স্কুলে আমার পাশে ও রকম লম্বা দাড়িওয়ালা কেউ বসত না।"

*

"সে কি পল্‌ডি, আপনি দাঁড়কাক পুষেছেন কেন?"

"সত্যি বলব? আমি হাতেনাতে দেখতে চাই, এই যে লোকে বলে দাঁড়কাক তিনশ' বছর বাঁচে কথাটা সত্যি কিনা।"

*

"হাঁ হাঁ, ঠিক বুঝেছি কাপ্তেন সায়েব। আপনার কম্পাস সব সময় উত্তর দিক দেখিয়ে দেয়। কিন্তু মনে করুন আপনি যদি আর কোনো দিকে যেতে চান, তাহলে কি করেন?"

*

অধ্যাপক—"এখন আপনাদের যে তারাগুলো দেখাব তাদের আলো পৃথিবীতে আসতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে।"

পল্‌ডি (নেপথ্যে)—"আমি অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না। আমরা আটটার সময় খানা খাই।"

*

"আমার রিটর্ন টিকিট চাই।"

"কোথাকার ?"

"কি মুস্কিল ! এখানে ফেরবার।"

*

"এই যে পল্‌ডি, সুখবর শুনুন, আজ সকালে আমি ঠাকুরমা হলুম।"

"কি যে বলেন। আর এরি মধ্যে দিব্যি চলাফেরা করতে আরম্ভ করেছেন !"

*

পল্‌ডি—"ঐ যে দুর্গ দেখতে পাচ্ছেন, ঐখানে আমার জন্ম হয়। আপনি কোথায় জন্মেছিলেন ?"

টুরিস্ট—"হাসপাতালে।"

পল্‌ডি—"কী ভয়ানক। কেন, আপনার কি হয়েছিল ?

আনন্দবাজার পত্রিকা

উমেদারী

জনাব সহযোগী সম্পাদক মহাশয়

কদম্‌-মবারকেষু,

মহাত্মন !

আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, সম্পাদক মহাশয়ের পরিবর্তে এ পত্র তস্য সহযোগীর উদ্দেশে প্রেরণ করা সখৎ বে-আদবি। কিন্তু আপনি স্বয়ং বিসমিল্লাতেই গলদ করে বসে আছেন বলে আমাকেও বাধ্য হয়ে এই প্রোতকল-বিরুদ্ধ অনাচার করতে হল।

আপনি উত্তমরূপেই জানেন, আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে জানেন, আমার জীবনের সর্বোচ্চাশা, কোনো একটি পত্রিকার সম্পাদক হওয়া—তা সে আজেবাজে মার্কা লণ্ডন-টাইমস্‌-ই হোক, কিংবা তখ্‌ৎ-ই-তাউস-কম্‌-কুৎব্‌মিনার-রূপী 'কালি ও কলম'ই হোক্। অতএব আমার জিগর-কলিজার চিল-চেল্লানীর

ফরিয়াদ, আমাকে সম্পাদক পদটি দিলেন না কেন?

প্রত্যহ ক্রমিক বেকারীর দাওয়াই কর্মখালির বিজ্ঞাপন চা-পানান্তে রকে বসে সেবন করি—সেও আপনার মত হর-ফন্-মৌলা হুজুরি জনের অজানা নয়। কই, কোনো কাগজে তো আপনার কাগজের জন্য "সম্পাদক প্রয়োজন" এমত বিজ্ঞাপন দেখিনি। আপনি আরো জানেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক ভ্যাকেন্সির জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হয়—তা সে কেরানীর চাকরিই হোক আর লক্ষ লক্ষ চাকরি যে মহারাজ দেন তাঁর চাকরিই হোক!

বলতে হবে না, বলতে হবে না! আমি জানি, আপনি বলবেন, 'কিন্তু আখেরে চাকরিটি পায় কে? আপনি পান? আমি পাই? স্বপনকুমার পায়? আসলে কর্তৃপক্ষ মাত্র একটি ব্যাপারে গাফিলী করেন; বিজ্ঞাপন দেবার সময় চাকরিটা যাকে দেবেন তার ফোটোগ্রাফ সঙ্গে ছাপিয়ে দিয়ে যদি ঘোষণা করেন, "None need apply whose photograph does not resemble this!" তা হলেই সর্ব ঝামেলা চুকে যায়।'

বুঝেছি, বুঝেছি, সব বুঝেছি। ক সের ধানে ক সের চাল—সরি, বলা উচিত ক সের গম নিলে ক সের চাল পাবে, কিংবা কটা লুপ্ নিলে কটা বউ পাবে—এসব কাশীমিত্তির নিমতলা আমি চিনি, মুসলমানের ব্যাটা হয়েও। মামদোর উপর ব্রহ্মদত্যি!

আমি আপনাকে সোজাসুজি—বাড়িতে না থাকলে 'লটকাইয়া লটকাইয়া' নোটিশ দিলুম, আমি অডিটার জেনরেল, এনফরস্‌মেন্ট ব্রাঞ্চ, ইনকাম ট্যাক্স সব্বাইকে আপনার কীর্তি জানিয়ে উড়ো চিঠি লিখবো; তখন বুঝবেন ঠ্যালা কারে কয়। ভালো করে বুঝিয়ে বলি।

'মস্‌তান' 'মস্‌তানী' 'মস্‌তানগিরী' শব্দগুলো চেনেন? ঐ যে সিদিনা ছুঁচলো গোঁপ, ছুঁচলো জুতো, ছুঁচলো পাতলুন গয়রহ সমন্বিত গোটাকয়েক ছোঁড়া এসে পূজোর চাঁদা চাইলে—যে ভাবে আপনার দিকে চেয়ে 'চাইলে', তাতে আপনি বাপ্পো বাপ্পো করে টাকা দিতে দিতে ইষ্টনাম স্মরণ করলেন না (কত খসলো?)? মনে মনে আন্দেশা করলেন না, বড় আহাম্মুখী হয়ে গিয়েছে ঢাকা বারান্দায় ট্যুব লম্পটি লাগিয়ে। ওটা গেল। ওরা যদি সন্তুষ্ট না হয়।···কালই দেখতে হবে, বাজারে গডরেজ ইস্পাতের বাল্‌ব্ হয় কিনা!'

এই হল গে মস্‌তানী—বাঙলা ভাষার বাঙলা কথা।

কিন্তু শব্দটা যাবনিক। অর্থাৎ এর উপর আপনার চেয়ে আমার হক ঢের ঢের বেশী। তদুপরি আপনি বর্ণশ্রেষ্ঠ, আমার 'বন্‌নো'-টি আর বললুম, না ঐ সামনে

শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা—মা-আমার অধমের বন্নো পেলে জেল্লাই টেকরাতেন।

শব্দটির বহর দেখুন! Drunk, intoxicated, libidinous—কামোন্মাদ; lustful, wanton, furious; an animal in rut—ভাদ্রমাসীয় সারমেয়, excessively drunk and polluted with neat wine—দ্বন্দ্বটা লক্ষ্য করুন! মদটা উত্তম শ্রেণীর (বা নির্জলা) কিন্তু অস্থলে পড়ে বেবাক নোংরা করলো (গোমূত্র পবিত্র, কিন্তু দুধে পড়লে—তুলনীয়), intoxicated with the wine of rashness—কাঁচের দোকানে পাগলা ষাঁড়, ইত্যাদি ইত্যাদি আরো বিস্তর আছে।

ধন্য, ধন্য যিনি এই শব্দটি বাঙলায় চালিয়েছেন! পাড়ার মস্তানদের কোনো গুণ এতে অবহেলিত হয়নি, বড় তামাকের কল্কে পেয়েছে। 'ভূমা' 'খল্বিদং' ইত্যাদি ডাঁট ভাঁট শব্দ এঁয়ার কাছেই আসতে পারে না।

তারই দোহাই কেড়ে আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি :—

আমাকে পত্রপাঠ সহযোগী অসহযোগী—অনারারী হলেও কণামাত্র আপত্তি নেই, কিন্তু খবরদার, সেস্থলে সেটা যেন পারমেনেন্ট্ হয়—কোনো একটা সম্পাদক যদি না করেন তবে ঐ কথাই রইল! আপনার ট্যুব লম্পোটির প্রতি আমার কিঞ্চিন্মাত্র জুগুপ্সা নেই। আমি দেখে নেব, আপনি কি করে যজমান বাড়িতে আতপ চাল আর কাঁচকলা পান—যার উপর ভরোসা করুকে কারওয়ার বৈঠিয়েছেন, অর্থাৎ 'কালি' ও 'কলম' যোগাড় করেছেন। পয়সায় তিনটে বাগচীর 'কালি' 'বড়ি' আর খাগড়ার 'কলম' তো।

তা বেশ করেছেন।

কিন্তু মনে রাখবেন, ঐ 'কালি ও কলমের' হাফ হিস্সেদার আমি। 'কালি' না হয় আশু-প্রত্যাশিত মা কালীর চর্মনির্যাস হতে পারে কিন্তু 'কলম'* শব্দটি আরবী, যাবনিক। আরব নবী হজরৎ ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। তাই বোধ হয় আল্লা-পাক কুরান শরীফে বাণী দিয়েছেন তাঁকে (আল্লাকে) স্মরণ করে আবৃত্তি করো, তিনি কলমের মাধ্যমে জ্ঞান দান করেছেন।...আপনার পত্রিকার নামকরণের শুরুতে কলমকে স্মরণ করে আপনি আল্লা-নির্দেশিত পথেই যাত্রারম্ভ করেছেন!

এ দৃশ্য দেখে গুণীজ্ঞানীরা বিস্মিত হবেন না। ভবিষ্য পুরাণের প্রক্ষিপ্তাংশে নাকি স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, 'কলিযুগস্য লক্ষণম্ কিং?'—থাক্ সংস্কৃত। মোদ্দা : কলিযুগে 'ব্রাহ্মণে যবনাচরণ করবে, আর যবন আর্যশাস্ত্র রচনা করবে।'

* যদ্যপি কেউ কেউ বলেন ওটা নাকি মূলে গ্রীক

আপনার পথ আপনি বেছে নিয়েছেন ; আম্মো অধুনা গৌড়ভূমে যে নব্যন্থায় সৃষ্ট হয় তারই অনুকরণে একখণ্ড উপাদেয় 'নব্যস্মৃতি' লিখেছি। আপনার শুভবুদ্ধি যদি আমাকে সম্পাদকমণ্ডলীতে ভূম্যাসনও দেয় তবে মল্লিখিত সেই 'স্মৃতিশাস্ত্র' কালি ও কলম মারফৎ তাবল্লোকে শনৈঃ শনৈঃ প্রচারিত হবে। এই সুবাদে কিঞ্চিৎ পূর্বাস্বাদ সাবৃভ্ করছি (ফরাসি মেনু-তে যে আইটিম্ "অর্ দ্য ভ্র্ hors d-oeuvre' নামে সুপরিচিত); যেহেতু অর্বাচান গৌড়সন্তান যাবনিক উপাহারলয়ে তথা ভোজন হর্ম্যে পূর্বাভিজ্ঞতানটনবশত বংশারণ্যে ডোম্বান্ধের ন্থায় আচরণ করত হাস্যাস্পদ হয়, সেহেতু মদ্গ্রন্থে 'ফিরপোতে হবিষ্যান্ন' নামক একটি বিশেষ উল্লাস আছে, তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ কল্লোলে। কোন্ কোন্ তিথিনক্ষত্রে ফিরপো গমনে যাত্রা শুভ তথা যাত্রা নাস্তি একাদশীতে তথায় ষণ্ডপুচ্ছযশ সেবন অবিধেয় কি না ইত্যাদি ইত্যাদি তাবৎ জটিল জটিল সমস্যার নিঘণ্ট্ তথা দফে দফে সবিস্তর বর্ণন অধমাধমের নব্যস্মৃতিতে যাবনিক সংস্কৃতে আলেকজানড্রিয়ান ছন্দে গ্রথিত আছে। একাধিক আই সি এস কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। তাঁরা অবশ্য তাঁদের যবন পূর্বশূরীগণ কর্তৃক স্থাপিত প্রথা অনুযায়ী যথারীতি পুস্তক না পড়েই প্রশংসাপত্র দিয়েছেন কিন্তু এস্থলে পাণ্ডুলিপি পূর্বাহ্ণে অনধীত থাকাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নি—'দি ক্যারাভান (চালিয়াতি উচ্চারণ কারাভাঁ) পাসেজ'—কাফেলা অগ্রগামী। ইতিমধ্যে আমেরিকা-প্রত্যাগত স্বামী বিটলানন্দ (বিটেল নয়, Beatle) ও শ্রীদিদি স্বপ্নযোগে পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করত আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মারকিন বীটল সম্প্রদায়ের জন্ম 'মারিযোয়ানা' হশীশ-ভাঙ-চণ্ডু ইত্যাদি মিশ্রিত 'পঞ্চরঙ' (এটিই প্রকৃত অকৃত্রিম বস্তু—'পঞ্চরসের' অনুকরণে নির্মিত 'Punch' নিরেস, নীরস ভেজাল) এবং বিশেষ করে 'মার্তণ্ড-তাপিত-বকযন্ত্রোদ্গীর্ণ-খর্জুর-নির্যাস'—শাহ্-ইন্-শাহ জহাঁগীরের সুপ্রিয় পেয় 'ডব্ল্-ডেস্‌টিল্‌ড্-এরেক্' এই মহা-কারণবারিরই শ্বেতাঙ্গ দত্ত অভিধা—কি প্রকারে কোন্ শুভলগ্নে পান বিধেয় সবিস্তারে এ তাবৎ শ্লোকবদ্ধরূপে গ্রথিত আছে।—সহজে প্রত্যয় যাবেন না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঘোর সত্য যে যুক্ত ফ্রণ্টের কমন-ইষ্ট তথা প্রতিপক্ষ উভয় সম্প্রদায়ই এ-স্মৃতি সোল্লাসে কামনা করেছেন। বাসনা ধরেন, খবরই প্রসাদাৎ বিধান, ফতোয়া, ফয়তা প্রয়োগ করত একে অন্যকে স্মৃতিভ্রষ্ট জাতিচ্যুত করতে সক্ষম হবেন। আমেন—যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ !

সম্পাদকতার পরিবর্তে এই দেবদুর্লভ গ্রন্থের কপিরাইট অতীব সুলভ। ন্থাখতোনাস্থাথ আপনাদের বাক্-সাহিত্য তামাম বেঙ্গলকে তাক লাগিয়ে অবাক সাহিত্যে পরিণত হবে ! বাঙলা কোন্ ছার, আপনি 'হেলায় লঙ্কা করিবা জয়'।

এইবারে বলুন, শুধু মস্তানীই করি? উদারার খাদেও চড়াক্‌সে নামতে জানি।

* * *

কিন্তু, যাই-বলি-যাই-কই, কিস্তক ব্যাকরণে একটা বিভীষণ ভুল করে বসে আছি আমি। সেটাকে আমার ওয়াটারলু পানিপথ গাল্‌লিপলি আপনার প্রাণ যা চায় তাই তুলে বেইজ্জৎ করতে পারেন। আমার মন নির্দ্বন্দ্ব ছিল, আপনি আপনার পেটুয়া কাকা মামা শালাদের কাউকে হুম্ করে সম্পাদকের দিওয়ান-ই-খাস এর সন্‌গ্‌-ই-মর্‌মর্ তখতে বসিয়ে দেবেন। ও হরি! কোথায় কি? বসিয়ে দিয়েছেন বিদগ্ধ ভদ্র কুলীন সন্তান মিত্রজ শ্রীযুত বিমল মহোদয়কে। সর্বনাশ! আমার। আপনার তো সর্বরক্ষা! এ যে আমার কুল্লে ফরিয়াদের কী বেহদ্ মুখ-তোড় জবাব তার জবাব কড়ি দিয়ে কেনা যায় না। 'কালির' উপর বিমল! সোনার পাতর বাটি আপনিই সব্বপয়লা গড়লেন। কালি সরোবরে বিমল হংসকে ছেড়ে দিয়েছেন। কবীর (বেজোড়ের) বলেছেন, 'বিরল হংস'। 'ম' স্থলে 'র'? তা ঐ ম র ম র ম রা করে করেই শ্রীবাল্মীকি রামচন্দ্র পেয়েছিলেন!

কহাঁ আসমান কা সিতারা, ঔর কহাঁ— — —! কোথায় আসমানের তারা আর কোথায় পাছার পাঁচড়া! কোথায় শ্রীবিমল আর কোথায় আমি!

সাহিত্যিক রূপে খ্যাতি জমানো সর্ব ভূমিতেই সুকঠিন। কঠিনতম গুজরাত মারওয়াড়ে। ঝাড়া দশটি বছর আমি তৎ তৎ অঞ্চলে বসবাস করেছি এবং লক্ষ্য করেছি ঐ সব ভূমিতে 'সাহিত্যিক' নামক বস্তুটি কালোবাজারেও পাওয়া যায় না। অবশ্য শুনে তাক লেগে যাবে ঐ সব অঞ্চলে কালোবাজার হেথাকার তুলনায় ঢের ঢের কম। সো কৈসন? উত্তরে সেই উর্দু প্রবাদটি স্মরণ করিয়ে দি— 'মহল্লেকী রেণ্ডী মা বরাবর'—আপন মহল্লার বেশ্যা মায়ের মত, অর্থাৎ, ঢলাঢলি করবি তো কর, কিন্তু আপন মহল্লাতে নয়। তাই ওদেশের মহাজনরা—উভয়ার্থে—আপন আপন জন্মভূমিকে কর্মভূমিতে পরিণত করেননি। ঐসী গতি সন্‌সার-মেঁ। তা সে যাক্। বলছিলুম কি, ওদেশে সাহিত্যিক বস্তুটি ডুমুরের ঠ্যাং। যদিস্যাৎ সেই ব্রহ্মাণ্ডদুর্লভ প্রাণীটি ওদেশে দেখা দেয় তবে তাকে কারো সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় বলে 'সাহিত্যিক ছে' অর্থাৎ 'ইনি সাহিত্যিক'। অন্য পক্ষ তখন মনে মনে বলছে 'বেচ্‌চারা! না জানি, বউ বাচ্চা ক'মাস ধরে অনাহারে আছে!' এপক্ষ তখন গম্ভীরতম কণ্ঠে স্তবে অহমদাবাদ-গুজরাত-সৌরাষ্ট্র-কচ্ছকে বিস্ময়ে নির্বাক করে দিয়ে বলে 'গের বাঁধ্যুছে!' অর্থাৎ 'ঘর বেঁধেছে?'

"কী বললে? কী কইলে? হুঁ ব্যোলা?' বরঞ্চ চিংড়ি মাছ হিমালয়ের চূড়োয় চড়ে আল্‌পস্‌-চূড়া-প্রবাসিনী চিংড়িনীকে ডেকে তার সঙ্গে রসালাপ করতে পারে—সরু গলির এ-পার ও-পার যে রকম নিত্যি নিত্যি হয়—কিন্তু সাহিত্যিক আপন কামানো কড়ি দিয়ে বাড়ি বেঁধেছে! জয় প্রভু পরস্‌নাথ!

বিমলবাবু কড়ি দিয়ে কি কি কিনেছেন বলেননি। দাদখানি বেল মশুরির তেল থেকে শুরু করে নিশ্চয়ই 'গের'—ঘর—বাড়ি!

ওদিকে দেখুন, পাঠান মোগল ইংরেজকে তিনি কি রকম গুলে খেয়েছেন! শ্রীমিত্র হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রকে হারাতে পারেননি—কে-ই বা পারে—কিন্তু তাঁর ইতিহাস চর্চা বঙ্কিমের চেয়ে কম নয়। সে যুগের তুলনায় আজ লাইব্রেরিতে ফারসী ইতিহাস ঢের ঢের বেশী। এবং সব চেয়ে বড় কথা, অর্বাচীনরা যখন ভেবেছিল, ঐতিহাসিক উপন্যাসের জমানা খতম, 'সাত হাত মিট্টিকে নীচে' তখন শ্রীবিমল দেখিয়ে দিলেন, কোনো বিষয়বস্তু কোনো যুগ, কোনো জাঁর—genre-ই চিরতরে লোপ পায় না। ঐতিহাসিক উপন্যাস আজও লেখা যায়—ঈশপের গল্প পাঁচ হাজার বছর পরেও লেখা চলবে, কলমের জোর থাকলে।

ঐ কলমের জোরটাই আমাকে নিধন করেছে, সহযোগী মশাই, ঐ পোড়া কলমের জোর।

নইলে, স্মরণ করুন, কুবুদ্ধির তাড়নায় একদা আপনি স্বয়ং 'পঞ্চতন্ত্র' ছাপাননি? মহাত্মা বিষ্ণুশর্মার 'জাঁর' পৃথিবীর কোন্ দেশে অপরিচিত? এই শর্মাই বা তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করবে না কেন? কিন্তু আপনার আমার জোড়া কপাল—দৈবের লিখন, আহা, খণ্ডাইতে সাধ্য কার—গর্দিশের গেরোতে গেরনে গেরাস করলে।...শুনলুম বইখানা আপনার হাতছাড়া হয়েছে। তাহলে মৌলা আলীর উদ্দেশে ব্রতোপবাস করে, সেখানে আচারাৎ চতুর্দশ শাক নিবেদন করত চলে যান সোজা কালীঘাট। সেখানে কালী কেলকেত্তাওয়ালীর পদপঙ্কজে বীবী শীরনী চড়িয়ে—এর সমূচহ বিধি বিধান 'নব্যস্মৃতি'তে পাবেন—'ব্রহ্মময়ী মা, বজ্রযোগিনী মা' স্মরণ করতে করতে বাড়ি ফিরে পূজোপাটার বিশেষ বেশ গরদের ইজের-পাজামা ফের শিকের হাঁড়িতে ঝুলিয়ে রাখবেন। কারণ অধুনা 'তোমার বাহন যেটা, দুষ্ট সেই ইঁদুর ব্যাটা—'

সোঁদর বনের বড়-মেঞার মুরশিদ, দক্ষিণ রায়ের ভ্রাতা গাজীপীরের ফিবৃপো প্রবেশ ছাড়পত্র ঈভনিং-জ্যাকেট্‌টির নিকুচি করেছে!

* * *

কিন্তু এই ওয়াটারলুর সামনেও আমার একটি শেষ বক্তব্য আছে।

শ্রীবিমল ক'খানা বই লিখেছেন আমি জানিনে বলে লজ্জিত। কিন্তু তাঁর প্রত্যেক বই যেন অনাবৃজ্‌ সহ পাশ সে তথ্য আমার অজানা নয়! পক্ষান্তরে আমার চোদ্দটি সন্তান—আপনাদের প্রদত্ত 'গ্রেস' সত্ত্বেও—হারাধনের দশটি ছেলের 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে' কপপুর! সবকটা বিলকুল না-পাশ।

তাই শ্রীবিমল better কোআলিফাইড!

এই তো আপনার বুদ্ধি!

চৌদ্দটি ব্যাঙ্ক যে ডকে তুলেছে সে সন্ধি সুড়ুক বেশী জানে, না যে সগৌরবে বেশুমার ব্যাঙ্কের উন্নতি করেছে সে বেশী জানে? কালোবাজার, ট্রিপ্‌ল্‌ একাউন্ট রাখা, ব্যাঙ্কের টাকায় তেজীমন্দী খেলা, ইনকমট্যাক্স দেওয়া দূরের কথা তাদের কাছে রিলীফ রূপে দাদন চাওয়া—এ-সব না করতে পারলে আপনার সত্ত ভরা 'কালি' সাহারা হয়ে যাবে না, আপনার 'কলম' মুষলে পরিণত হয়ে যদুবংশ ধ্বংস করবে না!' ঈশ্বর রক্ষতু!

তবু গাঁইগুঁই করছেন? অর্থাৎ, এটা বোঝার মত এলেমও আপনার পেটে নেই। তাহলে মারি সেখানে বোমা!

এক বিশেষ সম্প্রদায়ের তালেবর ব্যবসায়ী ভাবী জামাতার সঙ্গে ব্যবসাতে বাবাজীর তজরুবাহ্‌-অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মাত্র একটি প্রশ্ন শুধোন। উত্তর শুনে সোল্লাসে বললেন, 'ওয়াহ্‌, ওয়াহ্‌ বেটা জীতে রহো! ঔর ক্যা পুঁছু?—(আর কি শুধবো!) সাত দফে গণেস্‌ উল্টায়া! কামাল্‌ কিয়া, কামাল্‌ কিয়া! বঢ়ীয়া দামাদ (জামাতা), উম্‌দা দামাদ!'

এই 'কামাল্‌ কিয়া' শুনেই কাজী কবি মুস্তফা কামালের উদ্দেশে গেয়েছিলেন, কামাল! তুনে "কামাল কিয়া", ভাই!

আমার নাম মুস্তফা নয়—বঙ্গসন্তান তবু আকছারই আমাকে ঐ নামে চিঠি লেখেন, আমিও ঐ নামের ধোঁকার টাট্টির পিছনে আশ্রয় নি, পাওনাদারের হুনো খেয়ে—

আমায় চ্যান্স দিন, স্যর, আমি আপনার কাগজের তরে কামালের আক্‌মল্‌ করে ছাড়ব! ও! আপনি বুঝি আরবী ভাষা আমার চেয়েও বেশী মিসাণ্ডার-স্টেণ্ড করেন। 'কামালের' স্যুপারলেটিভ 'আক্‌মল্‌'—যেমন 'কবীর'-এর 'আক্‌বর্‌', 'হামিদ'-এর 'আহ্‌মদ্‌'! 'বাঁদরের' বোধ হয় 'আব্‌দর্‌'—নইলে হারাম ব্র্যাণ্ডি-পানি দেবে কেন?

* * *

শ্রীবিমলকে না নিলেও আপনি যে মিত্তির একটি নিতেনই—সে আমি জানি।

'মুখুয্যে "কুটিল" অতি বন্দ্যো বটে সাদা', অপিচ 'ঘোষ বংশ মহাবংশ, বোস বটে সাদা, মিত্তির "কুটিল" অতি দত্ত মহারাজা'।

এ কম্মটি ভালই করেছেন। সর্বশেষে দেখছি একটি নমস্য বন্তিও জুটিয়েছেন। কবিগুরুর দক্ষিণ-হস্তের সাক্ষাৎ প্রতীক আপনাদের কাগজের মেরুদণ্ড গড়ে দিচ্ছেন।...হ্যাঁ হ্যাঁ পবলিসিটি করতে জানতেন না, বন্তি সন্তান 'শ্রীম'।

*　　　*　　　*

তবু বলছি, আমাকে নিলে ভালো করতেন!

এষাস্য পরমা গতি ?

"সত্যেরে দেখিব আমি জ্যোতির্ময় রূপে ;
আমার চরম মোক্ষ, আমি গন্ধ ধূপে
ভস্ম হব পরি লয়ে সে দীপ্ত তিলক
অগ্নিতে আছেন যিনি, জলে বিশ্বলোক—
অন্তস্তলে, ওষধিতে, বনস্পতি মাঝে—
মম সত্তাবীণা যেন তাঁরি স্পর্শে বাজে ॥"

সে যুগ অতীত হল। তারপর ঋষি
কহিলেন, "এ জীবন অন্ধ অমানিশি।
সত্য বাক্য, সত্য চিন্তা, তথা সত্য কর্ম—
ত্রিরত্ন তোমার হোক—সঙ্ঘ, বুদ্ধ ধর্ম
দীপ্যমান সর্বলোকে অন্ধ তমোনাশা
ঈশ্বরের দাস্য ত্যজ, ত্যজ শূন্যে আশা।"
বুদ্ধ-জীন ক্ষত্রিয়ের অমিতাভ ভাষা।
তাপিত শূদ্রের বুকে এনেছিল আশা ॥

অতিক্রমি আরবের দুস্তর মরুরে
ভারতের শ্যাম-সুধা-পঞ্চনদ ক্রোড়ে
আশ্রয় লভিল যবে নব সত্যদূত
বক্ষেতে বাহুতে তার এক ধর্ম পূত
একেশ্বর। প্রণমিয়া এ ভূমিরে

—যে দেশ ত্যজিয়া এল নাহি চাহি ফিরে—
কহিল, "সত্যেরে আমি যে সুন্দর রূপে
লভিয়াছি, তব শুভ্র পাষাণের স্তূপে
করিব প্রকাশ আমি। এস সর্বজন,
জাতিবর্ণ নাহি হেথা। মুক্ত এ প্রাঙ্গণ
আচণ্ডাল তরে।" শুনি সে উদাত্ত বাণী
শান্ত হল অভিযান, যুদ্ধে হানাহানি ॥

তারপর? তারপর লজ্জা, ঘৃণা, পাপ,
অপমান; প্রকাশিল অন্তহীন শাপ ॥
যুগ্মক্ষাত্র তেজে তার পাপ-প্রক্ষালন
চেষ্টা হল ব্যর্থ যবে। করিল বরণ
ভেদ-মন্ত্র ছিদ্রান্বেষী, পরম্পরাঘাত,
হইল বিজয়টিকা—সে অভিসম্পাত ॥

দীর্ঘ রাত্রি অবসানে অরুণ আলোতে
মেলি সুপ্ত আঁখি দেখি চলে মুক্তস্রোতে
নাগরিক বৃদ্ধ ক্ষুদ্র; জনপদে জাগে
দীন-দুঃখী, পাপী-তাপী। তারি পুরোভাগে
মোহনের সাথে চলে যে ছিল নির্ভয়
মহাপুরুষের নামে দিতে পরিচয়,
আজাদি মোতিরমালা চিত্ত কেড়ে লয়
সরোজিনী পঙ্কে ফোটে—জয় জয় জয়!
চক্রনেমি আবর্তন পূর্ণ হল ভেবে
কৃতজ্ঞ হৃদয় নিয়ে প্রণমিনু দেবে।

হায়রে বিদীর্ণ ভাল, হারে অর্বাচীন
চক্রনেমি আবর্তিল; কিন্তু হল লীন
সম্মুখের সুখস্বর্গ। কি অভিসম্পাতে
ভাগ্যচক্র প্রবেশিল সেই অন্ধরাতে ॥

ভূতনাথ গিরিশৃঙ্গে।উভয়ে প্রয়াণ
নববীজমন্ত্র লাগি। নাহি অসম্মান!
নাহি অসম্মান তাহে। হেথা নাগরিক
দ্বি-ধা হয়ে তর্ক করে দীর্ণে দিগ্বিদিক।
কৌলীন্য বিচারে তাই কী জাত্যাভিমান!
দম্ভ কিবা?—কে পড়িছে বেশী স্টেটস্ম্যান!

গাঁধী-ঘাট

আজ যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতে চান, তাহলে আমাদের কোনো দুর্ভাবনা নেই। আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কি সে-বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই, এবং সে-সঙ্গীত সর্বাঙ্গসুন্দর করে কে কে গাইতে পারবেন সে-বিষয়েও আমাদের মনে অত্যধিক দ্বিধা নেই। তার কারণ আমাদের সঙ্গীত এখনো জীবন্ত—তার ঐতিহ্য কখনো ছিন্নসূত্র হয়নি।

কিন্তু স্থাপত্যের বেলা আমাদের মস্তকে বজ্রাঘাত হয়। এককালে ভারতবর্ষে যে অত্যন্ত নয়নাভিরাম ভবন অট্টালিকা ছিল সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ—সংস্কৃত কাব্য-নাটক—শিল্প-শাস্ত্রে তার ভূরিভূরি বর্ণনা পাওয়া যায়—কিন্তু ঠিক কি করে সেগুলো আবার নির্মাণ করা যায়, সে সম্বন্ধে আমাদের কারো মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। মোগল-পাঠান বাদশারা ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বুখারাস-মরকন্দ-ইরানের শিল্পকলা মিশিয়ে এদেশে বিস্তর ইমারত গড়েছিলেন, কিন্তু তার প্রধান নিদর্শন পাওয়া যায় মসজিদ, কবর ও দুর্গ নির্মাণে। আজকের দিনে এসব ইমারতের আমাদের প্রয়োজন নেই, কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ-নির্মাণ করতে গিয়ে আমরা তাজমহল বা জুমা-মসজিদের দ্বারস্থ হতে পারিনে।

ইংরাজ যখন নয়াদিল্লী গড়তে বসল তখন যে এ সমস্যা তার সামনে একেবারেই উপস্থিত হয়নি তা নয়। ঠিক সেই সময়েই রসজ্ঞ হ্যাভেল সায়েব ভারতীয় শিল্প-কলা সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক পুস্তক প্রকাশিত করেন। তার শেষ পরিচ্ছেদে তিনি ভারতীয় ইংরেজ বড়কর্তাদের সাবধান করে দেন, তাঁরা যেন নয়াদিল্লীতে শিব দিয়ে বাঁদর না গড়েন। হ্যাভেল্ স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজ স্থপতি ইঞ্জিনীয়ারদের বলে দেন, "ভারতবর্ষের স্থাপত্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তোমাদের কর্ম নয়। যে-সহরে দিওয়ান-ই-খাস, জুমা মসজিদ, কুতব মিনার রয়েছে, সেখানে ভারতীয় স্থপতিকে বাদ দিয়ে কোনো কিছু সৃষ্টিকার্য করার দম্ভ ক'রো না।"

কিন্তু হ্যাভেল্ যখন দেখতে পেলেন যে ইংরেজের স্বাধিকার-প্রমত্ততা তাকে সম্পূর্ণ বধির করে ফেলেছে, তখন তিনি ইংলণ্ডের গণ্যমান্য ইংরেজদের তরফ থেকে একখানা স্মারকলিপি তখনকার দিনে সেক্রেটারী অব স্টেটকে পাঠান। যতদূর মনে পড়ছে, সে-স্মারকলিপিতে বার্নার্ড শ' এবং এচ. জি. ওয়েলসের নামও ছিল।

চোরা ধর্মের কাহিনী শোনে না, কিন্তু ধর্মের কাহিনী না শুনলেই যে মানুষ চোর হবে তার কোনো মানে নেই। সে মূর্খ হতে পারে, শিশু হতে পারে অথবা ইংরেজ বড়কর্তাও হতে পারে। এস্থলে দেখা গেল, ইংরেজ বড়কর্তারা দিল্লীতে বসে শ' সায়েবকে সরাজ্ঞান করলেন,—কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ল লণ্ডনী শ'র তুলনায় তাঁরা নিজেদের এক এক জনকে একশ' মনে করেছেন। তারপর দিল্লীতে তাঁরা যে চাজ প্রসব করলেন পণ্ডিতী ভাষায় তাকে বলে গর্ভস্রাব, ইংরেজীতে muck, trash বললে তার খানিকটে অর্থ ধরা যায়—শিব গড়তে বাঁদর গড়ার জন্য কোনো জুৎসই কথা ইংরিজীতে নেই, পর্বতের মূষিকপ্রসবও অন্য জিনিস।

তারি অন্য নিদর্শন কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল। এ জিনিসটা ক্রিস্‌মাস্ কেক্ না শ্বেতহস্তী, এখনো ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারিনি। এটা নাকি বানানো হয়েছিল তাজমহলের সঙ্গে টক্কর দেবার জন্য। হবেও বা। শূর্পনখাও তো সীতার সৌন্দর্য দেখে হার মেনে নেয়নি। সেকথা থাক্, তবে এইটুকু না বলে থাকা যায় না,—তাজ দেখে মনে হয়, চেঁচিয়ে বলি, "ধর্, ধর্, এক্ষুণি ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাবে।" ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল দেখে চেঁচিয়ে বলি, "বাঁধ্ বাঁধ, এক্ষুণি ডুবে যাবে।"

* * *

গান্ধী-ঘাট নির্মাণ করতে গিয়ে তাই স্থপতিকে কোন্ সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল স্পষ্ট বুঝতে পারি। অজন্তাযুগে ফিরে যাবার উপায় নেই, মোগল স্থাপত্যে ঘাট নির্মাণের উদাহরণ নেই। আর ইউরোপীয় স্থাপত্যের বহু জিনিস আমাদের কাজে লাগে বটে, কিন্তু তা দিয়ে রসসৃষ্টি হয় না, আর হলেও আমাদের ভারতীয় মন চট করে তা দেখে সাড়া দেবে কি না সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। (ইউরোপীয় সব কিছু বর্জনীয় সে কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—তাহলে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের নভেল বাদ দিতে হয়)।

তাহলে এক হতে পারে—সব কিছু বাদ দিয়ে নিছক কল্পনার হাতে লাগাম ছেড়ে দেওয়া। তাতে মন সাড়া দেয় না। আমরা কি তবে হটেনটট ? আমাদের ভাণ্ডারের কি কোনো ঐশ্বর্য নেই যে আমরা শুধু দুখানা হাত নিয়ে ব্যবসা ফাঁদব ?

আর হতে পারে—প্রয়োজন মত হিন্দু, পাঠান, মোগল, ইংরেজ সকলের কাছ থেকে রসবস্তু ধার নেওয়া। যেখানে নিতান্তই অনটন, সেখানে স্থপতি চালাবেন তাঁর কল্পনা। তাঁর নৈপুণ্য তাঁকে শিখিয়ে দেবে কি করে ভিন্ন ভিন্ন রসবস্তুর সংমিশ্রণে এমন জিনিস নির্মিত হয়, যা রসস্বরূপ এবং শুধু তাই নয়—অখণ্ড রসস্বরূপ।

আমার মনে হয়, গান্ধী-ঘাট অখণ্ড এবং সার্থক রসসৃষ্টি হয়েছে। তার সম্পূর্ণতাটাই আমার চোখে পড়েছে প্রথম এবং আমি তাকে সম্পূর্ণভাবেই রসবস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছি। দেখে মুগ্ধ হয়ে যখন মনস্থির করলুম যে এ-সম্বন্ধে আর পাঁচজনকে বলতে হবে, তখনই বিশ্লেষণ কর্ম আরম্ভ করতে হল এবং তাতেও স্থপতির পরিমাণ-জ্ঞান দেখে আশ্চর্য হয়েছি। পাঁচটা মসলা একত্র করা কঠিন কর্ম নয়—হোটেলের পাচকেরা নিত্য নিত্য করে; কিন্তু সার্থক রান্না মা-মাসীরই হাতে ফুটে ওঠে। জগাখিচুড়ি ও মধুপর্ক ভিন্ন জিনিস।

স্মৃতি-সৌধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তাই তাকে উচ্চ হতে হয়। স্থপতি সেখানে ঐতিহ্যগত মন্দিরের শরণাপন্ন হয়েছেন। ঘাটে মেয়েদের জন্য কাপড় ছাড়ার ভালো ব্যবস্থা করতে হয় আর পর্দার কড়াক্কড়ি মোগল-পাঠানরাই করেছে বেশী। তাই 'পাষাণ'-যবনিকা দিয়ে যে গর্ভগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে তার অনুপ্রেরণা এসেছে দিল্লী আগ্রা থেকে। আর সর্বশেষে ঘাটে আশ্রয় পাবে বহু লোক; তাদের জন্য স্থপতি সৌধবক্ষ হতে যে পক্ষ সম্প্রসারিত করেছেন তার শৈলী ইয়োরোপীয় (এবং ইয়োরোপীয়ের আবিষ্কৃত কংক্রিটেই এ বস্তু সম্ভবপর)। আজকালকার দিনে কে না জানে প্রতীক্ষমাণ নরনারী সবচেয়ে বেশী দেখা যায় প্লাটফর্মে এবং প্লাটফর্ম জিনিসটা যখন বিলিতি, তখন তার বেদনা-বোধটা কোথা থেকে আসবে তার জন্য বড্ড বেশী কল্পনাও খাটাতে হয় না।

কিন্তু প্লাটফর্ম দেখে মনে যদি কোনো রসের সৃষ্টি হয়, তবে সে তো বীভৎস রস। আমার মনে হয়, স্থপতি এখানে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এই পক্ষ সম্প্রসারণে এমন একটা সরল স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গী বা sweep আছে। বামদিকের গর্ভগৃহ ও সৌধ-শিখরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই গতিভঙ্গী এতই সুষ্ঠু হয়েছে যে, সমস্ত স্মৃতি-সৌধটি স্থাণুবৎ না হয়ে গতিবেগ পেয়েছে। মন্দিরটির খণ্ড গম্ভীর—পাষাণ যবনিকা কারুকার্যময়—পক্ষ সম্প্রসারণ পূর্বক আপন বৃক্ষলতা দিয়ে সম্পূর্ণ সৌধের ভারকেন্দ্র রক্ষা করেছে।

তাই মনে হয়, আড়ম্বরহীনতাই এ সৌধের প্রধান ধর্ম। আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, গান্ধীঘাটে যে আড়ম্বরহীনতার গোড়াপত্তন করা হয়েছে তার সঙ্গে মিল রেখে আমাদের ভবিষ্যতের সব স্থাপত্য প্রচেষ্টা আড়ম্বরহীনতায়ই আপন

প্রধান সর্তকতা খুঁজে পাবে। শুধু বলতে চাই, মহাত্মাজীর জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোনো স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতেই হয় তবে তাকে আড়ম্বরহীন হতেই হবে।

কিন্তু আমাদের এ সব বিশ্লেষণ হয়ত প্রয়োজন নেই। আমরা সহরে থাকি, গঙ্গাবক্ষের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ক্ষীণ। মা গঙ্গার বুক বেয়ে যে-জনপদবাসী উজান-ভাটা করে, তারা কী বলে সেই কথা জানবার জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলাম।

শৈলীর প্রভাব এ স্মৃতি-সৌধ কতটা বহন করছে তার বিশ্লেষণ তারা করবে না। তাদের শেষ কথা, ভাল-লাগা মন্দ-লাগা এবং কলা-বিচারে সেই শেষ কথা। তবে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, সম্পূর্ণ বিদেশী বস্তু আমাদের জনসাধারণকে বেশী দিন রস দিতে পারে না। এ-সৌধ আমাদের ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে যখন শিরোত্তোলন করেছে তখন আর যা হয় হোক, এ বস্তু নিন্দাভাজন হবে না।

অবিমিশ্র আনন্দের বিষয়, এ-ঘাটের পরিকল্পনা করেছেন এক বাঙ্গালী যুবক। তাঁর নাম হবিবুর রহমান। ইনি শিবপুরের কৃতী ছাত্র ও পরে আমেরিকায় গিয়ে অনেক বিদ্যাভ্যাস, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এই পুণ্যকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে শ্রীমান দেশবাসীর আশীর্বাদ লাভ করবেন।

এ-ঘাটে গঙ্গাবক্ষে স্নান করে দেশবাসীর দেহ পবিত্র হোক, মহাত্মার জীবন স্মরণে তাঁদের আত্মা মহান হোক।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

আনন্দবাজার পত্রিকা

হজরৎ সৈয়দ নিজাম উদ্দীন চিশতি

সুলতান উল্-মশায়িখ্, (গুরু-সম্রাট), মহবুব্-ই-ইলাহি (খুদার দোস্ত), হজরৎ সৈয়দ নিজাম উদ্দীন চিশতি, শেখ উল্-আওলিয়ার (গুরুপতি) ৬৪৬ পরলোক-গমনোৎসব (উর্স্) নিজাম উদ্-দীন দর্গায় মহা সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি' রাজেন্দ্র প্রসাদ মহাশয় অনুষ্ঠানে সভাপতি হবেন বলে কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি স্বহস্তে উর্দুভাবায় একখানি চিঠি লিখে তাঁর অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ জানান এবং শেখ নিজাম উদ্-দীনের জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতি সচরাচর হিন্দীতে চিঠিপত্র লিখে থাকেন বলে উর্দু-প্রেমী সভাস্থ হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খৃষ্টানগণ উর্দুর প্রতি তাঁর এই সহৃদয়তা দেখে ঘন ঘন উল্লাস প্রকাশ করেন।

আফগান রাজদূত বলেন, শেখ নিজাম উদ্দীন আফগান এবং ভারতের সম্মিলিত আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতীক। খুরাসান-হিরাতে একদা সুফীতত্ত্বের যে চিশতি-সম্প্রদায় সৃষ্ট হয় নিজাম উদ্-দীন সেই 'সম্প্রদায়ে'র অসাম্প্রদায়িক বাণী এদেশে প্রচারিত করেন। আফগান রাষ্ট্রদূত প্রদত্ত নিজাম উদ্-দীনের পটভূমি এবং ইতিহাস বর্ণন পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অতিশয় মনোরম হয়েছিল।

মিশরের রাজদূত বলেন, নিজাম উদ্-দীনের বাণী সর্বসম্প্রদায় ভেদের অতীত ছিল বলেই তাঁর চতুর্দিকে হিন্দু-মুসলমান-শিখ সমবেত হয়েছিলেন।

আজকের দিনের ভারতীয় রাষ্ট্রও সেই ধর্ম-নিরপেক্ষ ভিত্তিতে গড়া বলে সে রাষ্ট্র ভারতের ভিতরে বাইরে বিশেষ করে মিশরে এতখানি আদৃত হয়েছে। নানা সম্প্রদায়ের লোক সভাতে উপস্থিত ছিলেন বলে তাঁরা মিশর-রাজদূতের এই উক্তিতে ঘন ঘন করতালি দেন।

ইরাকের রাজদূত বলেন, আজ পৃথিবী আরেক বিশ্বযুদ্ধের সামনে এসে পড়েছে। আজকের দিনে সবচেয়ে বেশী দরকার শান্তির বাণী প্রচার করা। খাজা নিজাম উদ্-দীন ইসলামের শান্তির বাণী প্রচার করেছিলেন বলেই তিনি সব সমাজের এতখানি শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন।

ইরাকী এবং মিশরী রাষ্ট্রদূত দুজনেরই মাতৃভাষা আরবী। তাঁরা ইংরেজি ভাষণের ফাঁকে ফাঁকে বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরাণ থেকে কয়েকটি 'আয়াত' উদ্ধৃত করেন। দিল্লীর হিন্দু-মুসলমান-শিখ অনেকেই আরবী জানেন, অন্তত: পক্ষে কুরাণ-তিলাওত (কুরাণ-পাঠ) শুনতে অভ্যস্ত। এঁদের কুরাণ উদ্ধৃতি ও মধুর আরবী উচ্চারণ শুনে সকলেই বড় আনন্দলাভ করেন।

পাকিস্তানের রাজদূত যুক্তপ্রদেশবাসী—তাই তাঁর উর্দু উচ্চাঙ্গের। তিনি উর্দুতে বক্তৃতা দিলেন বলে জনসাধারণের সুবিধে হল। আর উর্দু সাহিত্যিক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের তো কথাই নেই। পাকিস্তানের রাজদূত বলেন, আমরা নিজাম উদ্-দীনের বাণী জীবনে মেনে নিলে সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারবো।

সর্বশেষে মৌলানা সাহেব বক্তৃতা দেন। মৌলানা সাহেবের উর্দু ভাষার উপর যা দখল তাঁর সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। বক্তা হিসেবেও তাঁর জুড়ি এ দুনিয়ায় আমি দু'একজনের বেশী দেখিনি। উচ্চারণ, বলার ধরন, শব্দের বাছাই, গলা ওঠানো-নামানো, যুক্তিতর্ক উপমার সিঁড়ি তৈরী করে করে ধাপে ধাপে প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে গুরুচণ্ডাল সবাইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এসব তাবৎ বাবদে তিনি ভারতবর্ষের যে কোনো বক্তার সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারেন।

মৌলানা সাহেব বললেন, নিজাম উদ্-দীনের বাণী যে কতখানি সফল হয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চোখের সামনেই। এই যে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খৃষ্টান এখানে আজ ভক্তিভরে সমবেত হয়েছে তার থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁর বাণী সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিল—তিনি ইসলামের সেই শিক্ষাই নিয়েছিলেন, যে শিক্ষা কোনো বিশেষ ব্যক্তি, সমাজ বা ধর্মের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নয়, সে শিক্ষা সর্বধর্মের প্রতি সমান ঔদার্য দেখায়, তার নীতি এবং দণ্ড হিন্দু-মুসলমান-শিখ সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য।

*   *   *

অনুষ্ঠানটি হয়েছিল 'নিজামী সাহিত্যসভার' আমন্ত্রণে। এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ (পণ্ডিত) যুবক সভার সম্পাদক। তিনি বিশুদ্ধ উর্দুতে যে একখানা আমন্ত্রণ-রচনা পাঠ করলেন, তা শুনে মনে হল অতখানি বাঙলা জানলে রায় পিথৌরা বাঙলাদেশে নাম করে ফেলতে পারতেন।

*   *   *

নিজাম উদ্দীন বাঙলা দেশে বিখ্যাত হয়েছেন 'দৃষ্টিপাতের' মারফতে। গিয়াস উদ্-দীন তুগলুক শা'র সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য আর 'দিল্লী দূর অস্ত' গল্প এখন সকলেই জানেন।

৬৩৪ হিজরার (ইং ১২৩৬) সফর মাসে নিজাম উদ্দীন বুদায়ুনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মুহম্মদ, পিতার নাম আহমদ। তার পাঁচ বছর বয়সে বাপ মারা যান, মা তাঁকে মানুষ করেন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি দিল্লীতে এসে গিয়াসপুর গ্রামে আস্তানা গাড়েন (হুমায়ুনের কবরের পূব-উত্তর কোণে এখনো সে ঘরটি আছে) এবং পাক-পট্টনের সিদ্ধ-পুরুষ বাবা ফরীদ শকর-গঞ্জের কাছে দীক্ষা নিয়ে আবার দিল্লীতে ফিরে আসেন।

চিশতি সম্প্রদায়ের তিন মহাপুরুষ ভারতবর্ষে সুপরিচিত। 'আজমিড় শরীফের' খাজা মুইন উদ্-দীন চিশতি ভারতে চিশতি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ভারতীয় মুসলমানের কাছে মক্কা-মদীনার পরই আজমীর তৃতীয় তীর্থ, বহু হিন্দুর কাছে কাশী-বৃন্দাবনের পরই 'আজমিড় শরীফ'।

মুইন উদ্-দীনের পরেই তাঁর সখা কুৎব্ উদ্-দীন বখ্তিয়ার কাকি। ইনি সম্রাট ইলতুৎমিশের (অলতমাশ্) গুরু ছিলেন এবং দিল্লীর অধিকাংশ পণ্ডিতের বিশ্বাস 'কুতুব মিনার' দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা কুৎব্ উদ্-দীন আইবকের নামে বানানো হয়নি —বানানো হয়েছিল পীর কুতব্ উদ্-দীন বখতিয়ার কাকির নামে। এর দরগাহ্ কুতুব মিনারের কাছেই। সেখানে শেষ মুগল বাদশার অনেকেই দেহরক্ষা

করেছেন। প্রতি বৎসর সেখানে দরগার চতুর্দিকে ফুলের মেলা বসে।

তাঁর পরই বাবা ফরীদ উদ্-দীন শকর-গঞ্জ।

*　　*　　*

সুলতানা রিজিয়ার ভগ্নীপতি গিয়াস উদ্-দীন বল্‌বন্ থেকে আরম্ভ করে মুহম্মদ তুগলুক পর্যন্ত বহু বাদশাই নিজাম উদ্-দীনের শিষ্য ছিলেন। রাজাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী হৃদ্যতা তাঁর ছিল আলাউদ্-দীন খিলজী, খিজ্‌র্ খান (এই খিজ্‌র্ খান এবং দেবলা দেবীর প্রেমের কাহিনী সম-সাময়িক কবি আমির খুসরৌ ফার্সী ভাষায় লেখেন একথা বাঙালীর কাছে অজানা নয়—আকবর বাদশাহ প্রায় তিন শতাব্দী পরে বাঙলা দেশে জলবিহারের সময় এই কাব্য শুনে মুগ্ধ হন) এবং মুহম্মদ তুগলুকের সঙ্গে আলাউদ্-দীন খিলজীকে পীর নিজাম উদ্দীন মঙ্গোল আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে দেন—মহম্মদ তুগলুকের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার প্রধান কারণ ধর্মশাস্ত্রে উভয়ের গভীর পাণ্ডিত্য। মুহম্মদ তুগলুককে সাধারণতঃ 'পাগলা রাজা' বলা হয়, কিন্তু তাঁর আর যে দোষই থাকুক তিনি সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত ছিলেন। মোল্লারা তাঁকে জেহাদের জন্য ওস্কাতে চাইলে তিনি শাস্ত্রবিচারে তাদের ঘায়েল করে ঠাণ্ডা করে দিতেন।

কিন্তু পীরের সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর মিত্র এবং শিষ্য কবি আমির খুসরৌর সঙ্গে। খুসরৌর পরিচয় এখানে ভালো করে দেবার প্রয়োজন নেই; ভারত আফগানিস্থানের সুরসিক জনমাত্রই তাঁকে প্রাতঃস্মরণীয় কবিরূপে স্বীকার করে থাকেন।

পীর নিজাম উদ্-দীনের সঙ্গে বরঞ্চ জলাল উদ্-দীন খিলজি এবং গিয়াস উদ্দীন তুগলুকের প্রচুর মনোমালিন্য ছিল কিন্তু খুসরৌকে সম্মান এবং আদর করেছেন বল্‌বন্ থেকে আরম্ভ করে মুহম্মদ তুগলুক পর্যন্ত সব রাজাই। এমন কি যে গিয়াস উদ্-দীন তুগলুক নিজাম উদ্-দীনের কুয়োর কাজ বন্ধ করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন তিনি পর্যন্ত খুসরৌকে সভাস্থলে বিস্তর ইনাম-খিলাত দেন।

মুহম্মদ তুগলুক পণ্ডিত ছিলেন তাই তাঁর লাইব্রেরিখানা ছিল বিশাল—মুহম্মদ সেই লাইব্রেরি দেখা-শোনার ভার দেন খুসরৌকে। ঐতিহাসিক জিয়া উদ্-দীন বরনী আর খুসরৌ সঙ্গে না থাকলে মুহম্মদ তুগলুক হাঁপিয়ে উঠতেন। বাঙ্গলাদেশ যাবার সময় মুহম্মদ মিত্র খুসরৌকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং সেখানে লেখনাবতীতে থাকাকালীন খবর পৌঁছল নিজাম উদ্-দীন দেহরক্ষা করেছেন।

*　　*　　*　　*

বজ্রাঘাত বললে কম বলা হয়। খুসরৌকে কোনো প্রকারেই সান্ত্বনা দেওয়া

গেল না। সর্বস্ব বেচে দিয়ে উন্মাদের মত দিল্লীর দিকে রওনা হলেন। সেখানে তাঁর পৌছনর খবর পেয়ে তাঁর অসংখ্য মিত্রেরা ছুটে গেলেন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। নিজাম উদ্-দীনের পরেই পীর হিসাবে দিল্লীর আসন তখন নিয়েছেন খাজা নসীর উদ্-দীন 'চিরাগ দিল্লী' অর্থাৎ 'দিল্লীর প্রদীপ'—কুতব্ সাহেব আর নিজাম উদ্-দীনের পরেই তাঁর দর্গা দিল্লীতে প্রসিদ্ধ) এবং ইনি ছিলেন খুসরৌর পরম মিত্র। তিনি পর্যন্ত খুসরৌকে তাঁর শোক ভুলিয়ে সংসারে আবার ফিরে নিয়ে যেতে পারলেন না।

আচ্ছন্নের মত খুসরৌ দিবারাত্রি নিজাম উদ্-দীনের কবরের পাশে বসে সেদিকে তাকিয়ে থাকতেন। দীর্ঘ ছয় মাস কাটানোর পর তাঁর প্রতি খুদার দয়া হল। ২৯শা জুল কিদা ৭২৫ হিজরিতে (ইংরাজি ১৩২৫) মৃত্যু তাঁকে তাঁর গুরু এবং সখার কাছে নিয়ে গেল।

খুসরৌ বাণীর একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন বলে হিন্দুর বসন্ত পঞ্চমী উৎসবে প্রতি বৎসর যোগ দিতেন।

এখনও প্রতি বৎসর দিল্লীর হিন্দু-মুসলমান বসন্ত পঞ্চমী দিনে নিজাম উদ্-দীনের দর্গায় সমবেত হয়ে খুসরৌকে স্মরণ করে।

* * * *

দিল্লীর বাদশা মুহম্মদ শা, দ্বিতীয় আকবরের (ইনিই রামমোহনকে বিলেত পাঠান) পুত্র মিরজা জাহাঙ্গীর, ঐতিহাসিক বরনী, আকবরের প্রধান মন্ত্রী আতগা খান (হুমায়ুন কৃতজ্ঞ হয়ে এঁর স্ত্রীকে আকবরের 'দুধ-মা' নিযুক্ত করেছিলেন), আকবরের 'দুধ-ভাই' আজীজ কোকল্‌তাশ্, নাদির শা'র এক পুত্রবধূ যিনি দিল্লীতে মারা যান, এরকম বহু লোক তাঁদের দেহরক্ষা করেছেন পীর নিজাম উদ্-দীনের গোরের আশেপাশে। স্থাপত্যের দিক দিয়ে এঁদের অনেকেরই কবর অতুলনীয়—সে কথা আরেক দিন হবে।

* * * *

নিজাম উদ্-দীনের দরগায় গোরের জায়গা যোগাড় করা সহজ নয়। সম্রাট-নন্দিনী জাহানারার গোর এখানেই। দৈর্ঘ্যে ১৩ ফুট ৯ ইঞ্চি, প্রস্থে ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি। এইটুকু জায়গার জন্য তিনি তিন কোটি টাকা দাম হিসেবে রেখে দিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করে প্রমাণ করলেন, ভ্রাতার হক দুই-তৃতীয়াংশ টাকার উপর। তাই তিনি দাম দিলেন এক কোটি!

কবরের কাছে ফার্সীতে লেখা :—

"বগৈরে সবজে ন" পুশদ্ কসী মজার মরা,

কে কব্‌র-পুশে গরীবান্‌ হমীন্‌ গিয়া বস্‌ অস্ত্‌।"
"বহুমূল্য আভরণে করিয়ো না সুসজ্জিত
কবর আমার
তৃণ শ্রেষ্ঠ আভরণ দীনা আত্মা জাহানারা
সম্রাট-কন্যার।

হ য ব র ল

১

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে অর্থ সাহায্য চাওয়া হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুত জানকীনাথ শাস্ত্রী লিখিতেছেন—'·· ···পূর্বে পরিষদে উপযুক্ত মেধাবী ছাত্রদিগকে আহার ও বাসস্থান দিয়া অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হইত। কিন্তু বর্তমানে জরুরী অবস্থায় আর্থিক অসুবিধার জন্য সে ব্যবস্থা রহিত করিবার উপক্রম হইয়াছে।' যদি তাহাই করিতে হয় ও মেধাবী ছাত্রেরা সংস্কৃত অধ্যয়ন ত্যাগ করে, তবে পরিষদ চলিবে কাহাদের লইয়া? ধনী মেধাবী ছাত্র তো বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। দেশের বিত্তশালীদের বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি যে, আজও বাজারে যে সমস্ত সংস্কৃত পুস্তক-রাজি পাওয়া যায়, তাহা কাহার অধ্যবসায়ের ফলে? দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংস্কৃতের জন্য কতটুকু করিয়াছেন ও এই সব চতুষ্পাঠী, টোল পরিষদ কতটুকু করিয়াছেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তো দুইখানা কাব্য ও তিনখানা নাটক লইয়া নাড়াচাড়া করেন, ভারতীয় দর্শনের জন্য তো রহিয়াছেন ইংরেজীতে রাধাকৃষ্ণণ ও দাশগুপ্ত। সরকার সাহায্যবর্জিত দেশীয় এই প্রতিষ্ঠানগুলি ও ইয়োরোপের, বিশেষতঃ জর্মন পণ্ডিতমণ্ডলীই তো সংস্কৃতের শতকরা ৯৫ খানি পুস্তক বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়েও যাঁহারা 'দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হিসাবে গণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন টুলো আর কয়জন নির্জলা মেড ইন বিশ্ববিদ্যালয়?' উইনটারনিৎস লেভীকে যেসব হিন্দু ও জৈন পণ্ডিতের দ্বারস্থ হইতে দেখিয়াছি, তাঁহারা তো খাঁটি টুলো। অনেকে ইংরেজী পর্যন্ত জানিতেন না। এ যুগের জ্ঞানীদের শিরোমণি প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজেন্দ্রনাথও তো টুলো।

আশ্চর্য যে, পাঠান-মুগল যুগের ভিতর দিয়া চতুষ্পাঠী, টোল সুস্থ শরীরে বাহির হইয়া আসিল। পণ্ডিতেরা অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিলেন, পাণ্ডুলিপি

বাঁচাইয়া রাখিলেন, নূতন টীকা-টীপ্পনী লিখিলেন আর আজ ধর্মগন্ধ-বিহীন সদাশয় ইংরেজদের আমলে, দেশে যখন জাত্যাভিমান বাড়িয়াছে, জাতীয়তাবোধের জয়পতাকা উড্ডীয়মান, দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হইবার জন্য হার্দিক প্রচেষ্টা সর্বত্র জাজ্জ্বল্যমান, তখন অর্থাভাবে আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে। যদি লোপ পায়, তবে এও বলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংস্কৃতের বৈদগ্ধ্য বাঁচাইয়া রাখিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

* * *

এই সম্পর্কে আরেকটি কথা মনে পড়িল। কুলোকের বদসল্লায় পড়িয়া সেদিন বায়স্কোপে গিয়াছিলাম একখানা পৌরাণিক ছবি দেখিতে। যাহা দেখিলাম, সে সম্বন্ধে মন্তব্য না করাই প্রশস্ত। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষ্য করিলাম। হিন্দীতে যে সংস্কৃত শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ হয় তাহা বাঙালী শ্রোতা দিব্য বুঝিতেছেন ও অর্ধশিক্ষিতা বাঙালী অভিনেত্রীরাও দিব্য শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে মন্ত্র পড়িতেছেন। তাহা হইলে কি বাঙলা দেশের ইস্কুল-কলেজে এখনও শুধু সংস্কৃত উচ্চারণ শিখাইবার সময় হয় নাই? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কাশী হইতে পণ্ডিত আনাইয়া বাঙালীকে বেদ-মন্ত্র শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে শিখাইয়াছিলেন। সে ঐতিহ্য আজ ক্ষীণ। মফঃস্বলের ব্রহ্মমন্দিরে সংস্কৃত উচ্চারণে বাঙলা পদ্ধতি আবার আসর জমাইয়াছে। বোম্বাইয়ের স্টুডিয়োর আবহাওয়া যদি বাঙালী অভিনেত্রীকে সংস্কৃত উচ্চারণ শিখাইতে পারে, তবে বাঙলা দেশের ইস্কুল-কলেজ তাহা পারে না, সে কি বিশ্বাসযোগ্য?

গুরুজনদের মুখে শুনিয়াছি, গিরিশবাবুর কোরাণের তর্জমা এককালে নাকি বহু হিন্দু পড়িতেন এবং তখন নাকি সে তর্জমার কদর হিন্দুদের মধ্যেই বেশি ছিল; কারণ মুসলমানেরা তখনও মনস্থির করতে পারেন নাই যে, কোরাণের বাঙলা অনুবাদ করা শাস্ত্রসম্মত কি না।

পরবর্তী যুগে মীর মশারফ হুসেন সাহেবের বিষাদ-সিন্ধু বহু হিন্দু পড়িয়া চোখের জল ফেলিয়াছেন (পুস্তকখানা প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থ নহে; অনেকটা পুরাণ জাতীয়, বিস্তর অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ)। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ লালন ফকীরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। পরবর্তী যুগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গঙ্গোপাধ্যায় আরবী-ফারসী শব্দযোগে তাঁহাদের লেখায় কিঞ্চিৎ মুসলমানী আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা লোকপ্রিয়তা হারাইলেন। তারপর আসিলেন নজরুল ইসলাম। সাধারণ বাঙালী হিন্দু তখন প্রথম জানিতে পারিলেন

যে, মুসলমানও কবিতা লিখিতে পারেন; এমন কি, উৎকৃষ্ট কবিতাও লিখিতে পারেন। কাজী সাহেবের কবিতার ব্যঞ্জনা বুঝিবার জন্য প্রচুর হিন্দু তখন মুসলমান বন্ধুদের 'শহীদ' কথার অর্থ, 'ইউসুফ' কে, "কানান" কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাজী সাহেব তাঁহার ধূমকেতু কাগজে মুসলমান সমাজের পঙ্কিল দিকটা যত না আক্রমণ করিলেন, তাহার অপেক্ষা বহু কম করিলেন ইসলামের সুন্দর ও মঙ্গলের দিকের বর্ণনা। ইতিমধ্যে মৌলানা আকরম খান প্রমুখ মুসলমান লেখকেরা ইসলাম ও তৎসম্বন্ধীয় নানা পুস্তক লিখিলেন। খুব কম হিন্দুই সেগুলি পড়িয়াছেন। এখনও মাসিক মোহাম্মদীতে ভালো ভালো প্রবন্ধ বাহির হয়, কিন্তু সাধারণ হিন্দু মোহাম্মদী কিনেন না; বিশেষতঃ পদ্মার এপারে। সুখের বিষয়, মৌলবী মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি'তে সংগৃহীত মুসলমানী আউল-বাউল-মুরশিদিয়া গীত হিন্দু-মুসলমান গুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লইয়া সঞ্চয়নখানি প্রকাশিত হয়।

বাঙালী-হিন্দু মুসলমানদের দ্বারা লিখিত পুস্তক যে পড়েন না বা কম পড়েন, তাহার জন্য তাঁহাকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ মুসলমানদের ভিতর শক্তিমান লেখক বড় কম। একবার ভাবিয়া দেখিলেই হয় যে, আজ যদি কোন মুসলমান শরৎবাবুর মত সরল ভাষায় মুসলমান চাষী ও মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি আঁকেন, তবে কোন্ হিন্দু না পড়িয়া থাকিতে পারিবেন। আরব্যোপন্যাসের বাংলা তর্জমা এখন হাজার হাজার বিক্রয় হয়—যদিও তর্জমাগুলি অতি জঘন্য ও মূল আরবী হইতে একখানাও এযাবৎ হয় নাই, আবু সঈদ আইয়ুবের লেখা কোন্ বিদগ্ধ বাঙালী অবহেলা করেন? কিন্তু তিনি সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন; মুসলমান জীবন অঙ্কিত করা বা মুসলমানী কৃষ্টি বা সভ্যতার আলোচনা তিনি করেন না। বাঙালী কবীরকে কে না চিনে?

মুসলমানদের উচিত কোরান, হদীস, ফিকাহ, মহাপুরুষ মুহম্মদের জীবনী (ইবনে হিশামের উপর প্রতিষ্ঠিত) মুসলিম স্থপতি শিল্পকলা ইতিহাস (বিশেষ করিয়া ইবনে খলদুন), দর্শন, কালাম ইত্যাদি ইত্যাদি—কত বলিব—সম্বন্ধে প্রামাণিক, উৎকৃষ্ট সরল সস্তা কেতাব লেখা। লজ্জার বিষয় যে, ফার্সীতে লিখা বাঙলার ভূগোল-ইতিহাস বাহার-ই-স্তানে গাঈবীর বাঙলা তর্জমা এখনোও কেহ করেন নাই।

শুনিতে পাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'ইসলামিক কালচার' বিভাগ আছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু অধ্যাপকেরা নানা রকম পুস্তক প্রবন্ধ বাঙলায় লিখিয়া 'বিশ্ব' 'বিদ্যালয়' নাম সার্থক করেন। মুসলমান অধ্যাপকেরা কি লেখেন?

লিখিলে কি উজবেকী স্থানের ভাষায় লেখেন ?

মুসলমানদের গাফিলি ও হিন্দুদের উপেক্ষা আমাদের সম্মিলিত সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছে। দুইজন একই ভাষা বলেন ; কিন্তু একই বই পড়েন না। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্ !

২

এক ইন্দো-আমেরিকান আড্ডায় ছিটকাইয়া গিয়া পড়িয়াছিলাম। আড্ডাধারীরা একোণে ওকোণে তিন-চার জনায় মিলিয়া ছোট ছোট দ'য়ের সৃষ্টি করিয়া হরেক রকম বিষয়ে আলাপচারী করিতেছিলেন। আমি যে কোণে গিয়া পড়িয়াছিলাম সেখানে একজন মার্কিন দুঃখ করিয়া সেই সনাতন কাহিনী বলিতেছিলেন, গাড়ীওয়ালারা বিদেশীদের কি রকম ধাপ্পা দেয়, দোকানীরা কি রকম পয়সা মারে, টিকিট কাটিতে হইলে ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষটায় বলিলেন 'অদ্ভুত দেশ, ফার্স্ট ক্লাস গাড়ীতে পর্যন্ত মুখ ধুইবার জন্য সাবান তোয়ালে থাকে না ; জিজ্ঞাসা করিলে রেল কর্মচারী বলে, যদি রাখা হয় আধ ঘণ্টার ভিতর সাবান-তোয়ালে কর্পূর হইয়া যাইবে।' আমি উষ্মার সহিত একটা ঝাঁজালো উত্তর দিব দিব করিতেছি এমন সময় একটি জর্মন মহিলা বলিলেন, 'জর্মনীতে থার্ড ক্লাসেও সাবান-তোয়ালে থাকে ও সেগুলি চুরি যায় না। কিন্তু দুরবস্থার সময় এই নিয়ম খাটে না। ১৯১৮ সনে জর্মনীর দৈন্য এমন চরমে পৌছিয়াছিল যে, সাবান-তোয়ালে মাথায় থাকুক গাড়ীর সর্ব প্রকার ধাতুর তৈয়ারী রড, হ্যাণ্ডেল, হুক, কব্জা পর্যন্ত উপিয়া গিয়াছিল। জর্মনী হুনরী-কারীগরদের সকলেই ড্রাইভার-স্প্যানার চালাইতে ওস্তাদ। শেষ পর্যন্ত কব্জার অভাবে গাড়ীগুলির দরজা পর্যন্ত ছিল না। অথচ সেই জর্মনীতেই ১৯২৯ সালে কেউ যদি ভুলে বাথরুমে হাতঘড়ি ফেলিয়া আসিত তবে নির্ঘাৎ ফেরত পাইত।' উত্তর শুনিয়া মার্কিনের চোখের উল্টা দিক বাহির হইয়া আসিল। বলিলেন, 'কই, আমাদের দেশে তো এমনটা কখনো হয় নাই।' আমি বলিলাম 'ব্রাদার, তোমরা আর দৈন্য দেখিলে কোথায় ?' মনে পড়িল হেম বাঁড়ুয্যের সেক্সপীয়ারের তর্জমা,

অঙ্গে যার অস্ত্রাঘাত হয়নি কখন,
হাসে সেই ক্ষতচিহ্ন করি দরশন।

* * *

বাড়ী ফিরবার সময় ঐ খেই ধরিয়া অনেক কিছু ভাবিলাম। যান্ত্রিক সভ্যতা

তো আমাদের হয় নাই। আমাদের যা কিছু বৈদগ্ধ্য-ঐতিহ্য-সভ্যতা এককালে ছিল তাহা বিরাজ করিত গ্রামের সরল অনাড়ম্বর জীবনকে জড়াইয়া। কৃষ্টির দিক দিয়া গ্রামগুলি তো উজাড় হইয়াছে কারণ গ্রামের কোনো মেধাবী ছেলে যদি কোনো গতিকে বি. এ. পাস করিতে পারে, তবে সে তো আর গ্রামে ফিরিয়া যায় না। গ্রাম তাহাকে কি চাকরি দিবে? ১২৲ টাকার স্কুল মাস্টারী, না ১৫৲ টাকার পোস্টমাস্টারী? এত কাঠ খড় পোড়াইয়া, বুকের রক্ত জল করিয়া, স্বাস্থ্য বরবাদ করিয়া বি. এ. পাস করিল কি কুল্লে ১৫৲ টাকার জন্য। সে আর গ্রামে ফিরে না। সার সহরে চলিয়া যায়, তুষ ধামে পড়িয়া থাকে। অথচ একশত বৎসর পূর্বেও গ্রামের হিন্দু ছেলে নবদ্বীপ ভট্টপল্লী, কাশীতে অধ্যয়ন করিয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়া গ্রামেই ফিরিত; সেইখানেই বাস করিত। মুসলমান ছেলে দেওবন্দ, রামপুর পাস করিয়া, ওস্তাদ-দস্ত মস্ত পাগড়ী পরিয়া সেই গ্রামেই ফিরিয়া আসিত, সেই গ্রামেই বাস করিত। তাঁহারাই গ্রামের চাষী মজুরকে ধর্মপথে চলিবার অনুপ্রেরণা দিতেন।

গ্রামে শিক্ষাদীক্ষা আজ নাই, তবু তো চাষা মজুর পশু হইয়া যায় নাই। আমি বহু কর্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কেহই একথা বলেন নাই যে, দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের চাষারা কুকুর-বিড়াল খাইয়াছে। কুকুরের সঙ্গে খাদ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়াছে কিন্তু এ সমাধান তাহার মাথায় আসে নাই যে, কুকুরটাকে মারিয়া তো জঠরানল নিবানো যায়! আরও শুনিয়াছি যে, গোরা সিপাহী টিনের খাদ্য ছুঁড়িয়া দিলে হিন্দু-মুসলমান স্পর্শ করে নাই; পাছে গোরু বা শুয়োর খাইতে হয়।

অথচ সভ্যতার শিখরে উপবিষ্ট প্যারিস সহরের বাসিন্দারা নাকি দুর্দিনে কুকুর-বিড়াল ইস্তক চড়ুই পাখী পর্যন্ত সাফ হজম করিয়া ফেলিলেন।

ধর্মের গতি সূক্ষ্ম; কে সভ্য কে অসভ্য কে জানে?

৩

সেই ইন্দো-মার্কিন মজলিসের আরেক কোণে যখন ঘুরিতে ঘুরিতে পৌঁছিলাম, তখন শুনি এক মার্কিন বলিতেছেন, "যাকে জিজ্ঞেস করো সেই বলে 'টেগোর পড়— গীট্যাঞ্জলি, গাড্‌না, চিট্রা'; পড়েছি, সুখ পেয়েছি। কিন্তু আমি চিত্রকর, তোমাদের দেশে কেউ ছবি-টবি আঁকে না?" আমি বলিলাম, "কি অদ্ভুত প্রশ্ন, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত হালদার ও নন্দলালের চেলা রমেন্দ্র চক্রবর্তী, বিনোদ

মুখোপাধ্যায়, বিনায়ক শিবরাম মশোজী, রামকিঙ্কর বহিজ—এঁদের নাম শোনো নি ?" মার্কিন বল্লে, "ঐ তো বিপদ, সকলেই বলে 'নাম শোনো নি ?' নাম তো বিস্তর শুনেছি। কিন্তু এঁদের ছবির এ্যালবম কই—এক চক্রবর্তী ছাড়া! ১৫ থেকে ২০ টাকার ভিতর তুমি আমাদের যে কোনো গুণীর,—দা-ভিঞ্চি, রেমব্রান্ত, সেজান্—যাঁরি চাও উৎকৃষ্ট এ্যালবাম পাবে। ইস্তেক তোমাদের দেশের বাজার এগুলোতে ছয়লাপ করে রেখেছিল, যখন লড়াইয়ের গোড়ার দিকে এদেশে আসি। এই যে এঁদের নাম করলে, দাও না কারু 'কমপ্লীট ওয়ার্কস' ? বেশি দরকসর করব না—আমরা কারবারী, আদ্ধেকই দাও না ?"

নতমস্তকে ঘাড় চুলকাইয়া টালবাহানা দিলাম, "লড়াইয়ের বাজার ; জাপানী-জর্মন প্রিন্টিং বন্ধ ; লড়াইয়ের পরে—।" আমেরিকানটি ভদ্রলোক। লড়াইয়ের পূর্বে এ্যালবম ছিল কি না সে বিষয়ে অতিরিক্ত অন্যায় কৌতূহল দেখাইয়া আমাকে বিপদগ্রস্ত করিলেন না।

শুনিতে পাই, সেই একমাত্র চিত্রকর যাঁহার এ্যালবম পাওয়া যায়, সরকারের ব্যবহারে ত্যক্ত হইয়া অধ্যাপকের কর্ম ছাড়ি-ছাড়ি করিতেছেন। 'কারবারী' মার্কিন চিত্রকর চিনে, 'কলচরড' বাঙলা সরকার চিনে না।

* * *

যুদ্ধের ফলে নানা অপকার, নানা উপকার হইয়াছে। তাহার খতিয়ান করিবার সময় এখনও আসে নাই। তবু একটি জিনিসের কথা ভাবিলেই মন উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আসাম হইতে চীনে মোটরে যাইতে পারিব।

হিউয়েন সাং মঙ্গোলিয়া, তুর্কীস্থান, কাবুল হইয়া ভারতবর্ষ আসেন। অসহ্য কষ্ট তাঁহাকে সহিতে হইয়াছিল, ত্রিশরণ তাঁহার সহায় না হইলে সে অসম্ভব দুস্তর মরুভূমি, সঙ্কটময় হিন্দুকুশ উত্তীর্ণ হইয়া তিনি তথাগতের পুণ্যভূমিতে পৌঁছিতে পারিতেন না। ভারতবর্ষে তিনি কাশ্মীর, তক্ষশিলা, বিহার হইয়া বারেন্দ্রভূমি পর্যন্ত আসেন। সেখানে কামরূপের হিন্দুরাজার নিমন্ত্রণ পান। প্রথমে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধচিত্তে যাওয়া-না-যাওয়া সম্বন্ধে মনে মনে বিচার করিয়া শেষ পর্যন্ত লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

কামরূপের রাজা তাঁহাকে উচ্চ পাহাড়ে তুলিয়া পূর্বদিকে হস্তপ্রসারণ করিয়া বলিলেন, "ঐ তো আপনার দেশ। আমার কতবার মনে হয়, আপনার দেশ একবার দেখিয়া আসি—কিন্তু এদিকে কোনো পথ এখনও নির্মিত হয় নাই।"

দেশের দিকে তাকাইয়া ভিক্ষু হিউয়েন সাংয়ের হৃদয় বিকল হইয়া গিয়াছিল। এত কাছে, অথচ এত দূরে! দুঃখ করিয়া ভাবিয়াছিলেন পথটি যদি থাকিত, তবে

কত শীঘ্র কত অল্প কষ্টে তিনি আত্মজনের কাছে উপস্থিত হইতে পারিতেন।

বর্ষার নির্মম বৃষ্টির অবিশ্রান্ত আঘাতে এই রাস্তার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দেয়। তৈয়ারী হইয়াছে বটে, কিন্তু সরকার সেটিকে চালু রাখিবেন কি না বলিতে পারি না। যদি থাকে, তবে নানা সুবিধার মধ্যে ভারত-চীনে মধ্যস্থতাবিহীন সরল (পথ কুটিল হওয়া সত্ত্বেও) যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রহিবে। আমরা মনের আনন্দে চীন ঘুরিয়া আসিব। হিউয়েন সাংয়ের আত্মা সন্তোষ লাভ করিবে।

* * *

স্থলপথ দিয়া বন্ধ ভারত হইতে আরেকটি জায়গায় অল্পায়াসে যাওয়া যায়—সে কাবুল। শরৎকাল আসিয়াছে, তাই মনে পড়িল। এখন সেখানে ফল পচিতেছে, খাইবার লোক নাই।

ধনীরা শিলঙ যান, মুসৌরী-সিমলা যান, কাশ্মীর পর্যন্ত অনেকে ধাওয়া করেন, কিন্তু কাহাকেও কাবুল যাইতে দেখি না। অথচ যাওয়া যে খুব কষ্টকর তাহা নহে। পেশাওয়ার হইতে কাবুল মাত্র দুইশত মাইল মোটর পথ। প্রথম কুড়ি মাইল, খাইবার পাশের ভিতর দিয়া—সে কি অপূর্ব, রুদ্র দৃশ্য! দুই দিকে হাজার ফুট উচ্চ প্রস্তর গিরি দুশমনের মত দাঁড়াইয়া—নীচে সরু আঁকাবাঁকা রাস্তার উপর দিয়া কত চিত্র-বিচিত্র পোশাক, পাগড়ী পরিয়া কাফেলা-ক্যারেভান কাবুল চলিয়াছে, মাজার-ই-শরীফ চলিয়াছে, আমুদরিয়া পার হইয়া বোখারা যাইবে আসিবে। এদিকে গজনী-কান্দাহার হইয়া হয়ত হিরাত পর্যন্ত যাইবে আসিবে। ঘোড়া-গাধা-উটের পিঠে কত রঙয়ের কার্পেট, কত ঝকঝকে সামোভার, কত কারাকুলি পশম। সন্ধ্যায় নিমলা পৌঁছিবেন—সেখানে শাহজাহান বাদশার তৈয়ারী চিনার (সাইপ্রেস জাতীয়) বাগানের মাঝখানে নয়ানজুলির পাশে চারপাইর উপর না-গরম-না-ঠাণ্ডায় রাত কাটাইবেন—জলের কুলকুল শুনিয়া। ব্রাহ্মমুহূর্তে হাজার হাজার নরগিস (নারসিসস) ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধে সঞ্জীবিত হইয়া চেতনালোকে ফিরিয়া আসিবেন।

সেইদিনই বিকালে কাবুল। পথের বর্ণনাটা আর দিলাম না। যে একবার দেখিয়াছে ভুলিবে না। শরতের কাবুল কোন হিল স্টেশনের ন্যূন তো নহেই—অনেকাংশে উত্তম। প্রচুর ফল, উৎকৃষ্ট দুম্বার মাংস, হজমী পানীয় জল, রুদ্র-মধুর দৃশ্য ও কাবুলীর সরল সহৃদয় বন্ধুত্ব। ঐতিহাসিক চিন্তার খোরাক পাইবেন বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী মোগল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, বাবুর বাদশাহের দীন ম্লান কবর কাবুলের পর্বতগাত্রে দেখিয়া।

* * *

অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ট্রামে প্রায়ই দেখি অসম্ভব ভিড়, অথচ চারিটি মহিলা চারিটি লেডিজ-বেঞ্চে আরামে বসিয়া আছেন। বসুন, আপত্তি নাই। কিন্তু যদি চারিটি মহিলা দুইখানা বেঞ্চিতে বসিতেন, তবে অন্ততঃ অন্য মহিলা না আসা পর্যন্ত চারিজন বৃদ্ধ বা ক্ষুদ্র ঐ খালি দুই বেঞ্চিতে বসিতে পারেন বা পারে। কোনো কোনো মেয়ে বলেন, ট্রামে-বাসে ছেলেরা অভদ্র ; ছেলেরা বলিবে মেয়েরা নির্মম।

লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আজকাল ট্রামে-বাসে ছেলে-বুড়ো কমিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা কলিকাতার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যান কি প্রকারে, এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

৪

মহাত্মা গান্ধী কয়েকদিন হইল কস্তুরবা স্মৃতিরক্ষা কমিটিতে বলেন, 'গ্রামের কুটির-গুলিতে আলোক স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা আনিবার জন্যই কস্তুরবা স্মৃতি ভাণ্ডারের উৎপত্তি। গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে মানসিক, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। বনিয়াদী শিক্ষা বলিতে ইহাই বুঝায়।' মহাত্মাজীর প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

এই উপলক্ষে আমরা একটি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি সবিনয় আকর্ষণ করি। যদি গ্রামে উপযুক্ত শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রকার কুটীর শিল্পও প্রবর্তন করা যায় তবে গ্রামের উৎপাদনী শক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে ক্রয় করিবার ক্ষমতা বাড়িবে। তবে প্রশ্ন এই যে, শহরে উন্নত কলকব্জা দিয়া যেসব জিনিস প্রস্তুত হইবে তাহার সঙ্গে কুটীর শিল্প প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কিনা। জাপান এই সমস্যার সমাধান করিয়াছিল গ্রামের কুটীর শিল্পের সঙ্গে শহরের কারখানার ঘনিষ্ঠ যোগ-স্থাপন করিয়া। 'অর্থাৎ যন্ত্রজাত মালের অনেক ছোট ছোট অংশ এমনআছে যেগুলি গ্রামে বসিয়া অবসর সময়ে হাত দিয়া তৈয়ারী করা যায়—বিশেষ বিচক্ষণতা বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। শহরের কারখানাই কুটীরকে কাঁচা মাল ও টুকিটাকি যন্ত্রপাতি দেয় ও কারখানাই কুটীরের তৈয়ারী মাল সংগ্রহ করিবার ভার নেয়। কাজেই কুটীর শিল্পী এই ধান্দা হইতেও রক্ষা পায় যে গ্রামের বাজারে তাহার তৈয়ারী মাল কিনিবে কে? রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত মণিলাল নানাবটী এককালে জাপানে এই সমস্যা সমাধানটি বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া এদেশে ফিরিয়া এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বাঙলাদেশের কয়েকজন

যুবাকেও আমরা চিনি যাঁহারা জাপানে বহু কলা শিখিয়া আসিয়াছেন। হয়ত তাঁহারাও এই বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন।

কস্তুরবা ফণ্ডের অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি কোনো কুটীর শিল্প প্রবর্তন করা হয় তবে তাহার জন্য আলাদা খরচ করিতে হইবে না। এইটি বিশেষ সুবিধা।

৫

ছেলেবেলার একটি কবিতা মনে পড়িল, প্রাক্‌শরতের বর্ণনা—

অনিচ্ছায় ভিক্ষা দেয় কৃপণ যেমতি
পড়ে জল সুবিরল সূক্ষ্মধার অতি।

সদাশয় সরকার যে কায়দায় রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দিতেছেন, তাহাতেই কবিতাটি মনে পড়িল। সেদিন একজন অধুনা-নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'জেলে কি রকম দিন কাটিল?' বলিলেন, 'প্রথম তিন বৎসর ভালোই, কারণ মন স্থির করিয়া লইয়াছিলাম যে, সরকার যখন আর কখনো ছাড়িবেই না, তখন দুঃখে সুখে এইখানেই বাকী জীবনটা কাটাই। হঠাৎ দেখি সরকার ইঁহাকে ছাড়ে, উঁহাকে ছাড়ে। বন্ধু-বান্ধবদিগের সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া সরকার একবার জেলে পুরিল, তারপর জেলের ভিতরে যাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইল (তাঁহারাই তো প্রকৃত বন্ধু—চাণক্য বলিয়াছেন, 'রাজদ্বারে যে সঙ্গে তিষ্ঠে সে বান্ধব', এ তো তারো বাড়া একেবারে ভিতরে, কারগারে) তাঁহারাও একে একে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন দ্বিতীয়বার বন্ধুবিচ্ছেদ—ডবল জেল। খালাস পাইবার সময় আবার অনেক বন্ধুকে ফেলিয়া আসিয়াছি। এখন তেহারা জেলের সুখ পাইতেছি।'

সরকারের অবৈতনিক মুখপাত্র হিসাবে বলিলাম, 'মেলা বন্ধুত্ব করা ভালো নয়। তোমাদের শঙ্করাচার্যই বলিয়াছেন।'

বন্ধু বলিলেন, 'বাড়ী গিয়া দেখি, মা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। শয্যা-গ্রহণ করিয়াছেন। শুনিলাম, প্রথম তিন বৎসর ঠিক খাড়া ছিলেন, কিন্তু শেষের এক মাস আশা-নিরাশায় দুলিয়া, অপেক্ষা করার ক্লান্তিতে, কে কে খালাস পাইয়াছে, কে কে পায় নাই, তাহাদের সঙ্গে মিলাইয়া আমার মুক্তির সম্ভাবনা কতটুকু হিসাব করিতে করিতে একদিন শয্যাগ্রহণ করিলেন।' সংস্কৃত প্রবাদটি বুঝিলাম যে, অধমের নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও সুখ নাই।

শুনিতে পাই বড় কর্তাদের কেহ কেহ নাকি বলিয়াছেন, 'পূজার পূর্বে অথবা পরে সকলেই খালাস পাইবেন।' পূজার বিশেষ করিয়া পূজার পূর্বে ও পরের নিষ্কৃতিতে যে কি নিদারুণ পার্থক্য তাহা বুঝিবার মত বাঙালী কি বড় দপ্তরে কেহই নাই ?

* * *

মৌলানা আকরম খাঁ সাহেব সরকারকে হজ যাত্রীদের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

মোগল বাদশাহ আকবর গুজরাট জয় করিলে পর মোগলরা প্রথম সমুদ্র দর্শন করে, প্রথম সমুদ্র বন্দর তাহাদের হাতে আসে। সেই বৎসরই হুমায়ুনের বিধবা মহিষী ও হারেম মহিলারা সুরট বন্দর হইতে নৌকাযোগে মক্কা যান। স্থলপথে যাওয়া বিপদসঙ্কুল ছিল বলিয়া ইতোপূর্বে মোগল মহিলারা কখনও হজ যাইতে পারেন নাই। কিছু দিন পরেই আকবর একজন মীর উল-হাজ অর্থাৎ হজ অফিসার (ইংরাজ সরকার যেন না ভাবেন, যে তাঁহারাই সর্বপ্রথম এই সৎ কর্মটি করিয়াছেন) নিযুক্ত করেন। অহমদাবাদবাসী সম্ভ্রান্ত পীর বংশীয় মীর আবু তুরাব বহু হজ যাত্রী ও ভারত সরকারের তরফ হইতে দশ লক্ষ টাকা সঙ্গে লইয়া সুরটের বন্দর-ই-হজ (তাপ্তী নদীতে একটা ঘাট এখনও এই নামে গুজরাতে সুপরিচিত) হইতে পাল তুলিয়া মক্কা পৌছেন। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে ঐ অর্থ মক্কার শরীফ (গবর্নর), আলিম উলেমা (পণ্ডিত-শাস্ত্রী) ও দীনদুঃখীদিগকে অতি আড়ম্বরে ও বদান্যতার সহিত বণ্টন করা হয়। মক্কায় ভারতের জয়ধ্বনি উঠে ; ভারতের হাজীরা সর্বত্র রাজার আদর পান। ফিরিবার সময় আবু তুরাব পয়গম্বরের পদচিহ্নিত একখানা পবিত্র প্রস্তর আনয়ন করেন। 'আকবর নামা'য় বর্ণিত আছে বাদশাহ আকবর সেই প্রস্তরকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য আপন স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন। প্রস্তরখানি অদ্যাপি আহমদাবাদে আছে।

যতদূর মনে পড়িতেছে, হৃতগর্ব মোগল সম্রাট রফী উদ্-দরজাতের সময় পর্যন্ত বৎসর বৎসর মীর উল-হাজ সরকারের পক্ষ হইতে অর্থ লইয়া মক্কা যাইতেছেন। 'মিরাত-ই-অহমদী' নামক ফার্সীতে লিখিত গুজরাতের ইতিহাসে এই সম্বন্ধে অতি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। পুস্তকখানির লেখক আলী মহম্মদ খান গুজরাত সুবার দেওয়ান বা রাজস্বসচিব ছিলেন। তখনকার দিনে রাজনীতি ও ধর্মনীতি অঙ্গাঙ্গি-ভাবে বিজড়িত ছিল বলিয়া এই অর্থব্যয়কে অপব্যয় মনে করা হইত না। আজও পৃথিবীর যে কোন এম্বেসি বিদেশে ইহা অপেক্ষা বেশি অর্থের অপব্যয় করেন।

ভারত যদি আজ স্বাধীন হইত তবে আকরম খাঁ সাহেবের মত মৌলানার

খয়েচ্ছা সরকার সানন্দে পূর্ণ করিতেন। মৌলানা সাহেবকে মুখ খুলিয়া বলিবার প্রয়োজনই হইত না।

৬

লিখিতে মন যায় না। যে সব বন্ধুরা জেল হইতে খালাস পাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া ও তাঁহাদের কারাকাহিনী শুনিয়া নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মে, মনে হয় এই অর্থহীন প্রলাপের কি প্রয়োজন? জানি, সহৃদয় পাঠকবৃন্দ অধমের লেখা সহ্য করেন, কেহ কেহ পত্র লিখিয়া তাহাকে উৎসাহিত করেন, কিন্তু যে সব কাহিনী শুনি, নিষ্কৃতদের যে ভগ্নস্বাস্থ্য দেখি তখন সে কাহিনী, সে অবস্থা সত্যের লেখনী সংযোগে পাঠকের হৃদয়মনে সঞ্চারিত করিতে পারি না বলিয়া বহু বৎসরে যে সামান্য সাধনা-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা পণ্ডশ্রম বলিয়া ধিক্কার দিই।

নিষ্কৃতদের অভিজ্ঞতা এতই সহজ, এতই সরল যে, তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া বাক্যালঙ্কার বিড়ম্বিত, 'মার্জিত' লিখনশৈলী অপমানিত।

সহৃদয় পাঠক এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য মার্জনা করিবেন।

* * *

আমার এক বন্ধু যাহাকে বলে উন্নাসিক। অতি সদর্থে। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা এতই প্রবল, দেশের মঙ্গলেচ্ছা এতই অনাবিল যে, বিদেশীয় কয়েকটি সাহিত্যসম্পদে গৌরবান্বিত ভাষা জানা সত্ত্বেও সে-সব সাহিত্যের উত্তম উত্তম কাব্য দর্শন পড়িবার তাঁহার সময় হইত না—নাটক নভেল মাথায় থাকুন। তুলনামূলক রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি—তাহাদের ইতিহাস—ইত্যাদি পড়িতে পড়িতে তাঁহার সময় ফুরাইয়া যাইত।

কারাপীড়নে অধুনা তিনি আর কিছুতেই চিত্তসংযোগ করিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া (সেতারখানাও ফেরৎ পাঠাইয়াছেন) আমার কাছে True Story, Detective Story জাতীয় তরল বস্তু চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। দুঃখে-সুখে মিশ্রিত হৃদয় লইয়া পাঠাই। খবর পাইলাম সদাশয় I. B. সেগুলি এ যাবৎ তাঁহাকে দেন নাই। সরকারের এই কি ভয় যে, তিনি ডিটেকটিভ গল্প হইতে আণবিক বোমা বানাইবার কায়দা রপ্ত করিয়া সর্বজনীন দাতব্য কারাগার প্রতিষ্ঠান লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবেন—না ট্রু স্টরি হইতে আদিরসাত্মক গল্প পড়িয়া তাঁহার চরিত্রদোষ হইবে। সরকারের হেফাজতে যখন আছেন, তখন তাঁহার 'চরিত্র রক্ষা'

করা তো সরকার-গার্জেনেরই কর্ম !

*   *   *

আরেক বন্দী ছিলেন বড়ই অরসিক। তিনি একখানা biologyর প্রামাণিক পাঠ্যপুস্তক চাহিয়া পাঠান। নামঞ্জুর। কয়েকজন রাজবন্দী একযোগে কারণটি অতি বিনয় সহযোগে জানিতে চাহিলেন। উত্তরটি অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া দিতেছি।

"মশাই, আপনারা যে কখন কি চেয়ে বসেন, তার তো ঠিক-ঠিকানা নেই। আজ এ biology, কাল ও biology, পরশু সে biology !"

রাজবন্দীদের কেহ দার্শনিক, কেহ ঐতিহাসিক, কেহ নৃতত্ত্ববিদ। সকলেই হতবুদ্ধি ; ব্যাপারটা না বুঝিতে পারিয়া একে অন্যের মুখের দিকে তাকান। Biology যে আবার পঁচিশ কেতার হয় তাহা তো তাঁহারা কখনো শুনেন নাই !

রহস্য সমাধান হইল ; I. B. নৈরাশ্যের দরদীয়া স্বরে বলিলেন, "কোন দিন যে শেষটায় গান্ধীর biology চেয়ে বসবেন না তারি বা ভরসা কোথায় ? তখন আমি কোথায় যাই বলুন তো ?"

I. B. বিদ্যাসাগর biology ও biographyতে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন।

গুরু সাক্ষী, ধর্ম সাক্ষী, দোষ দিতেছি না। অত পাণ্ডিত্য না ধরিলে বড়-কর্তা I. B.র সেনসর হইবেন কেন ? ইহার চেয়ে অল্প বিদ্যায়ও আইনস্টাইনকে রিলেফটিভিটি শিখানো যায়, অপিসারটিকে আমরা সবিনয় সাবধান করিয়া দিতেছি। তিনি যদি হুঁশিয়ার হইয়া না চলেন, তবে একদিন দেখিবেন যে, তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের সম্মান রক্ষার্থে অক্সফোর্ডের বড়কর্তারা তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের তখতে বসাইয়া দিয়াছেন।

আরেক বন্দী অতি সুপুরুষ। কাঁচা সোনার বর্ণ, ঢেউ খেলানো বড় বড় কালো চুল, খড়্গের মত নাক, আর দরাজী কপাল। যতদিন বাহিরে ছিলেন মাতা ও স্ত্রীর উৎপাতে মাঝে মাঝে দাড়ি কামাইতেন—অর্থাৎ মুখমণ্ডল ঘন-বর্ষার কদম্ব-পুষ্পের সৌন্দর্য ধারণ করিলে পর। জেলে গিয়া পরমানন্দে তিনি দাড়ি গজাইতে আরম্ভ করিলেন। সময় বিস্তর বাঁচিল, রাগ করিলে উৎপাটন করিবার সুলভ সহজ বস্তু জুটিল—আর চিন্তা-বিক্ষোভের কারণ তো হামেসাই উপস্থিত হইবে।

জেলে যে অতি আরামে আছেন এই বুঝাইবার জন্য তিনি সর্বদাই পত্নীকে রসে টৈটম্বুর পত্র লিখিতেন। তাহারি একখানাতে নিজের তরুণ দাড়ির বর্ণনা দিয়া বলিলেন, 'চেহারাটা এখন অনেকটা ক্রাইস্টের মত হইয়াছে।'

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ইস্তেহারের কথা আমরা আর পাঁচজন প্রায় ভুলিয়া গিয়া

ছিলাম। সর্ব ধর্মে সকলের সমান অধিকার অথবা এই রকম কিছু একটা। ঠিক মনে নাই।

I.B.র স্মরণশক্তি পৃথিবীর ইতিহাসে বিস্ময়জনক ও হৃদিত্রাস-সঞ্চারক। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। পাছে ক্রাইস্টপন্থী কাহারো মনঃপীড়ার সঞ্চার হয়, এই ভয়ে সেনসার এস্তার দুশ্চিন্তার ভার নামাইলেন ছত্রটি গিলোটিন করিয়া।

সহৃদয় পাঠক গীতা অথবা ঐ জাতীয় কোনো পুণ্যগ্রন্থে আছে না, ধর্মসংস্থাপনার্থে শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন?

হে biology Biography অভিন্নকরণকারী নটবর সেনসর, তোমাকে বার বার নমস্কার—

'নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত অব সর্ব'

'তোমাকে সম্মুখ হইতে নমস্কার, তোমার পশ্চাৎ দিকে নমস্কার' তুমি যে 'অনন্তবীর্য' অনন্তবিক্রম ধরো তাহাতে সন্দেহ করিবার মত যুগ্ম-মস্তক কার স্কন্ধে?

খ্রীষ্টধর্ম 'ওয়াজ ইন্ ডেঞ্জার'—তুমি তারে করিলে উদ্ধার।

* * *

বৃথা বাক্যব্যয়। বর্তমান যুগ সাংখ্যের—অর্থাৎ Statisticsএর। তাই শুদ্ধ স্টাটিস্টিক্স্ নিবেদন করি।

১৯২০এ অসহোযোগ আন্দোলনে ভদ্রলোক যোগ দেন। ১৯২৭এ নানা-প্রকারে প্রপীড়িত হইয়া মস্কো চলিয়া যান। ১৯২৮এ অসুস্থ শরীর লইয়া বার্লিন। ১৯৩৩এর কয়েক দিবস জর্মন জেল। ১৯৩৪এ দেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯৩৫ এখানে বৌগু ডাউন। ১৯৩৬এর গ্রীষ্মে গ্রেপ্তার ও সাত মাসের জেল। ৩৭-৩৮ বাহিরে। সেপ্টেম্বর ৩৯-৪১ জেলে—প্রায় এক বছর। ৪১-৪২ এক বৎসর বাহিরে। ৪২এর এপ্রিল পুনরায় লক্ষ্ণৌয়ে গ্রেপ্তার ও বন্দী—তারপর ফতেহগড়—তারপর বাঙলা দেশের জেল—সর্বকারাগারতীর্থ পরিক্রমা করিয়া এখন তিনি তথাগত—আজও তিনি জেলে। একটানা তিন বৎসর আট মাস। কত রোগশয্যা মৃত্যুদর্শন কত হাসপাতাল, আত্মীয় স্বজনের কত আকুলি বিকুলি কত কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কত প্রতিশ্রুতি কত আশা-নৈরাশ্যের সুখস্পর্শে পদাঘাত।

ইতোমধ্যে পত্নীর ছয় মাস কারাবাস, ভগ্নীদর্শনাগতা শ্যালিকার তিন মাস ও নিরীহ পাচকের নয় মাস!

ভদ্রলোকের নাম শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভগ্নস্বাস্থ্যবশতঃ ওজন কমায় তিনি এখন ছোটলোক এবং ছোট-লোকের সঙ্গই তিনি বাঞ্ছা করেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা ১.১২.৪৫

সহৃদয় পত্রলেখকগণের প্রতি আমার সকরুণ নিবেদন এই যে, আমি অতি অনিচ্ছায় অনেক সময় তাঁহাদের পত্রের উত্তর দিতে অক্ষম হই। তাঁহারা যে-সব বিষয় লইয়া আলোচনা চাহেন সেগুলিও সব সময় করতে সক্ষম হই না। তাহার প্রধান কারণ 'আনন্দবাজার' বাঙলা পত্রিকা; অধিকাংশ পাঠক ইংরাজি জানেন না। কাজেই তাঁহারা বহু বিষয়ের রস গ্রহণ করিতে পারেন না। আমি প্রধানতঃ তাঁহাদিগের সেবা করিতে চাহি বলিয়াই 'আনন্দবাজারে' লিখি। গুণীরা 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে' লেখেন। আবার কোনো কোনো পাঠক শাসাইয়া বলিয়াছেন, 'সত্য-পীর সাবান ইত্যাদি সামান্য বিষয় লইয়া আলোচনা করে কেন, সাবানের আলোচনাও তাহার নিকট হইতে শুনিতে হইবে নাকি?'

আমার বক্তব্য, আমি অত্যন্ত সাধারণ রাস্তার লোক, ম্যান ইন দি স্ট্রীট। দুর্বলতাবশতঃ মাঝে মাঝে পণ্ডিতি করিবার বাসনার উদ্রেক হয়। এবং করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া লাঞ্ছিত হই। সহৃদয় পাঠক, আপনার কি সত্য সত্যই এই অভিলাষ যে, অধম প্রতি শুক্র শনি সিন্নি (শিরনি) ও পূজার পরিবর্তে বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী কর্তৃক তিরস্কৃত হউক?

অতঃপর বক্তব্য 'সাবান' বস্তুটি বুদ্বুদ সমষ্টি বলিয়া কি সে সম্বন্ধে আলোচনা বুদ্বুদেরই ন্যায় অসার? গুরুজন, জার্মান পণ্ডিত ও যোগীকে এক সাবানে সম্মিলিত করিতে সমর্থ হইলাম সে কি কম কেরদানি? হায় পাণ্ডিত্য করিতে গিয়া বিড়ম্বিত হই, সাবানের মত নশ্বর বস্তু লইয়া আলোচনা করিতে গিয়াও পণ্ডিতের যষ্টিতাড়না হইতে নিষ্কৃতি নাই। উপায় কি?

ভাবিয়াছিলাম অদ্য ইলিশ মাছ কি প্রকারে 'দম পোখ্‌ত' রান্না করিতে হয় তাহা সবিশদ বর্ণনা করিব। সে অতি অদ্ভুত রান্না। আস্ত মাছখানা হাঁড়িতে রাখিবেন, আস্ত মাছখানা রান্না হইয়া বাহির হইবে। অনভিজ্ঞের কণ্ঠত্রাস-সঞ্চারক ক্ষুদ্র কাঁটাগুলি গলিয়া গিয়াছে, বৃহৎ কাঁটাগুলির তীক্ষ্ণতা লোপ পাইয়াছে।'

পূর্ববঙ্গে কোনো কোনো অঞ্চলে এই প্রকার রান্নার কায়দা এত গোপন রাখা হয় যে, মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় শপথ করিয়া যাইতে হয় যে, সে শ্বশুর-বাড়ির কাহাকেও পঞ্চম মকারের বাঙালী বল্লভ এই 'ম' কারটার গভীর গুহ্য তত্ত্বটি শিখাইবেন না।

সেই গোপন তত্ত্বটি আজ যবনিকান্তরাল হইতে প্রকাশ্য দিবালোকে বাহির করিব মনস্থির করিয়াছিলাম। সর্বরহস্য সর্বকালের জন্য সমাধান করিয়া বহু বধূর

নির্যাতন, পরিবারে পরিবারে দ্বন্দ্ব কলহের অবসান করিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু গম্ভীর পাঠকের তাড়নায় মনস্কামনা পূর্ণ হইল না।

ফলে ইলিশের কাঁটা আরো একশত বৎসর বহু অনভিজ্ঞের গলায় বিঁধিবে—কিন্তু আমার তাহাতে পাপ নাই।

বাঙালদের কথাই হউক।

এক বাঙাল বেগুন চাহিতে গিয়া 'বাইগন' বলিয়াছিল; তাহাতে 'ঘটির' রসোদ্রেক হয় ও বার বার ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, "কি বলিলে হে? কি কথা বলিলে?" বাঙাল লজ্জিত হইয়া কিছুক্ষণ নিজের উচ্চারণ লুকাইবার চেষ্টা করিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, "বেশ কইছি, বাইগন কইছি, দোষডা কি হইল?" ঘটি আত্মপ্রসাদজাত মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, " 'বাইগন'! ছোঃ! কী অদ্ভুত উচ্চারণ। আর শোনো ত আমরা কি রকম মিষ্টি উচ্চারণ করি, 'বেগুন'!" বাঙাল চটিয়া বলিল, "মিষ্টি নামই যদি রাখবা তবে 'প্রাণনাথ' নাম দেও না ক্যান? চাইর পইসার 'প্রাণনাথ' দেও। একসের 'প্রাণনাথ' দেও। হইল?"

উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আদেশ উপস্থিত। পত্রলেখক বলিয়াছেন যে সংস্কৃত উচ্চারণ লইয়া যখন আমি এত মাথা ফাটাফাটি করিতে প্রস্তুত তখন বাঙলাকে অবহেলা করিবার কি কারণ থকিতে পারে? বাঙলা উচ্চারণ কি সংস্কৃত উচ্চারণ অপেক্ষাও অধিক জরুরী নহে?

নিশ্চয়ই! কিন্তু মুশকিল এই যে, বাঙলা উচ্চারণ এখন অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতেছে। প্রধানতঃ রেডিয়োর কল্যাণে। পূর্ববঙ্গে এক ব্যাপক চেষ্টা দেখা যাইতেছে, মোটামুটি যাহাকে পশ্চিম বঙ্গের উচ্চারণ বলা হয় তাহার অনুকরণ করিবার।

অথচ 'বেগুন' অপেক্ষা 'বাইগন'ই আমার কানে মধুর শোনায়। কিন্তু মাধুর্যই তো শেষ কথা নয়। পশ্চিম বাঙলার 'চ' ও 'জ' অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের যে মোলায়েম 'চ' 'জ'য়ের গার্হস্থ্য সংস্করণ আছে তাহা অনেক পশ্চিমবঙ্গবাসীরও ভালো লাগে, কিন্তু উচ্চারণ দুইটি যে ঈষৎ অনার্যোচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ভুল বলিলে ভুল বলা হয় না।

কিন্তু তর্ক ও আলোচনা করিবার পূর্বে প্রথম প্রশ্ন আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি? বাঙলা প্রাণবন্ত, বর্ধনশীল ভাষা। তাহার নানা উচ্চারণ, নানা বর্ণ, নানা গন্ধ থাকিবে। থাকা উচিত। অথচ চট্টগ্রাম বাঁকুড়াকে বুঝিবে না। মেদিনীপুর শ্রীহট্টকে বুঝিবে না—সে কথাও ভালো নহে।

অধম যখন যেখানে যায় সেখানকার উচ্চারণ শিখিবার চেষ্টা করিয়া হাস্যাস্পদ

হয়। ইহা ছাড়া যে অন্য কোনো সমাধান আছে ভাবিয়া দেখে নাই। পাঠক কি বলেন ?

পূর্ববঙ্গের কথা উঠিলেই মনে হয় যে, তাহার লোক-সাহিত্যের প্রতি কি অবিচারই না করা হইয়াছে। এ যাবৎ, সেই অফুরন্ত সাহিত্য হইতে কতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে ? গীত, বারমাস্যা ছাড়াও 'আমির হামজা' 'গুলে বাকওয়ালী' প্রভৃতি বিদেশী কেচ্ছার পূর্ববঙ্গীয় রূপান্তর যে কী আনন্দদায়ক তাহা সুরসিক মাত্রই জানেন। 'লয়লা-মজনু' শুষ্ক মধ্য আরবের নায়ক-নায়িকা, যেখানকার কবি গাহিয়াছেন,—'হে প্রিয়া, প্রার্থনা করি পরজন্মে যেন তুমি এমন দেশে জন্মাও যে দেশের লোক জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিবার মত বিলাস উপভোগ করিতে পারে।'

সেই শুষ্ক আরবের নায়িকা লায়লী পূর্ববঙ্গের কেচ্ছায় অন্য রূপ গ্রহণ করিয়াছেন নৌকায় চড়িয়া—উটে নহে প্রিয়সন্দর্শনে যাইতেছেন। ছৈয়ের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া কমল তুলিতেছেন, সিঙ্গাড়া তুলিতেছেন। পদ্ম খোঁপায় গুঁজিতেছেন।

পূর্ববঙ্গের কবির সাহস অসীম যে রসসৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অপূর্ব।

আনন্দবাজার পত্রিকা ১২.১. ১৯৪৬

ঘরে-বাইরে

প্রতি সোমবার তোমাদের আনন্দমেলার জানালার বাইরে বসে তোমাদের কথা-বার্তা শুনি আর ভাবি 'হায়, আমাকে কেউ ভেতরে ডেকে নেয় না কেন ?' জোর করে সবাই আমাকে বসিয়ে রেখেছে গুরুজনদের সঙ্গে, বয়স আমার বেশি বলে। কেউ জানে না, আমার বয়স 'কমতির' দিকে ; বয়স কমতির দিকে কি তার মানে জানো না ? কেন সুকুমার রায়ের হ য ব র ল পড় নি ? ওরকম বই দুখানা হয় নি। তাতে টেকো বুড়ো জিজ্ঞেস করছে, 'বয়স কত ?' ছেলেটি বললে, 'আট'। টেকো জিজ্ঞেস করলে, 'বাড়তি না কমতি ?' ছেলেটি বললে, 'সে আবার কি ?' টেকো বললে, 'তাও জানো না ? এই মনে করো আমার বয়স চল্লিশ, একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ হচ্ছে, তখন 'বাড়তি'। বিয়াল্লিশে পৌছুতেই ঘুরিয়ে দিলুম, তখন ফের একচল্লিশ, চল্লিশ, উনচল্লিশ হয়ে 'কমতিতে' চলল। তা না হলে বুড়ো হয়ে মরি আর কি ? এখন আমার বয়স চোদ্দ। 'কমতি' চলছে !' শুনে ছেলেটি হেসেই খুন—টেকো বুড়োর বয়স নাকি চোদ্দ!

হেসো না, সত্যি বলছি আমার বয়স কমতির দিকে। সেদিন দেখি 'চিঠির

খলি'তে তোমাদেরই এক বন্ধু নদীয়ার সভ্য (১৪৪১৬) সত্যপীরের লেখা নিয়ে 'মৌমাছি'র সঙ্গে আলোচনা করেছে। জানালার পাশে বসেছিলুম, তখুনি ডিঙিয়ে এসে 'আনন্দ-মেলা'র খেলাঘরে ঢুকে পড়লুম। ভাবলুম অসভ্য থেকে সভ্য হয়ে গিয়েছি; এইবার দুনিয়ার নানাদেশ ঘুরে যে নানাগল্প যোগাড় করে রেখেছি তারি এক একখানা ছাড়ব আর তোমরা বুঝে নেবে আমার বয়স 'কমতির' দিকে কিনা।

পয়লা নম্বর এই বেলা শুনে নাও।

স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় শান্তিনিকেতনে ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। জগদানন্দ রায়ের নাম শোনোনি, বই পড়নি? তবে ভুল করেছ। তিনি একদিন ক্লাসের একটি ছেলের কান মলে দিচ্ছিলেন। শান্তিনিকেতনের ভেতরে অবিশ্যি মারধোর করা বারণ, কিন্তু একদম কেউ যদি সে আইন না ভাঙে তবে লোকে জানবে কি করে যে আইনটা আদপেই আছে। তা ছাড়া তিনি তাকে কানে ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন—সে তো তখন আর আশ্রমের ভেতর নয়—উপরে। আশ্রমের ভেতরেই তো মারধোর বারণ। তা সে আইনের কথা থাক—জগদানন্দ-বাবু ছেলেদের এত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন যে কেউ কখনো ওসব জিনিসে খেয়াল করত না।

কিন্তু ঠিক ঐ সময় বড়বাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন, আর দূর থেকে দেখতে পেয়েছেন। 'বড়বাবু' কে জানো? তিনি রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে বড়দাদা। গুরুদেব, গান্ধীজী ওঁকে বড়দাদা বলে ডাকতেন। গেল শতক আর এই শতক নিয়ে হিসেব করলে আমাদের দেশে দুজন সত্যিকার দার্শনিক জন্মেছেন—একজন বড়দাদা, আরেকজন স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

ব্যাপারটা দেখে বড়বাবু বাড়ি গিয়ে জগদানন্দবাবুকে একটি দোহা লিখে পাঠালেন,

> "শোনো হে জগদানন্দ দাদা,
> গাধারে পিটিলে হয় না অশ্ব, অশ্বেরে পিটিলে হয় যে গাধা!"

আমরা তো হেসেই খুন। 'গাধাকে পিটলে ঘোড়া হয় না', সে-কথা তো সবাই জানতুম, কিন্তু ঘোড়াকে পিটলে যে সে গাধা হয়ে যায় এটা বড়বাবুর আবিষ্কার! আর জগদানন্দ দাদার সঙ্গে গাধা শব্দের মিল শুনে আমাদের খুশি দেখে কে?

জগদানন্দবাবু মনের দুঃখে সেদিন থেকে কানমলা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪. ৯. ১৯৪৫

ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্য

ঐতিহ্য

হটেনটট এবং ভারতবাসীতে পার্থক্য কোথায় ?

শিক্ষাবিদ পণ্ডিতেরা সমস্বরে বলেন, "কোনো পার্থক্যই নেই। উত্তম বাতাবরণে রেখে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে প্রাপ্তবয়স্ক হটেনটট ও ভারতীয়ে কোনো পার্থক্য থাকে না।"

কিন্তু ঐতিহাসিক বলেন, "পার্থক্য বিলক্ষণ আছে। হটেনটট যখন তার শিক্ষাদীক্ষা সমাজ এবং রাষ্ট্রনির্মাণে নিয়োগ করে, তখন পদে পদে তার কাছে ধরা পড়ে, যে-ঐতিহ্য যে-সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে উন্নত সমাজ আগুয়ান হয়, তার সে ঐশ্বর্য নেই। এবং নেই বলে তাকে যে প্রতি সমস্যায় অন্য সংস্কৃতি থেকে ধারই শুধু করতে হয় তা নয়, তার সম্পূর্ণ ক্ষমতার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ দিতেও সে তখন অসমর্থ হয়।"

দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা সরল হয়ে যায়। বেদ উপনিষদের ঐতিহ্য না থাকলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্বকবি হওয়া সম্ভবপর হত না, যোগচর্চার ঐতিহ্য না থাকলে শ্রীঅরবিন্দ সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধ্যানৈশ্বর্য না পেলে বিবেকানন্দ বিশ্বজনকে মোহিত করতে পারতেন না। বৈষ্ণব-ধর্মের বিশ্বপ্রেম এদেশে না থাকলে মহাত্মাজী যুযুৎসু-ইংরেজকে অহিংস পদ্ধতিতে পরাজিত করতে পারতেন না।

যুগ যুগ সঞ্চিত আমাদের এই যে ঐতিহ্য, একে অবহেলা করেই ইংরেজ তার আপন শিক্ষাপদ্ধতির বিকৃত অনুকরণ এদেশে বিস্তার করেছিল। যে সম্পদে আমাদের গৌরব, ইংরেজ সে-সম্পদ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেনি, ধরলে আজ আমরা এতদূর আত্মবিস্মৃত হতুম না।

শুধু তাই নয়, সংস্কৃত-চর্চা যদি শুধু ইংরেজের স্কুল-কলেজেই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে আমাদের ঐতিহ্যের পনেরো আনা এতদিনে লোপ পেয়ে যেত। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্যন্ত কয়খানা সংস্কৃত বই প্রকাশ করেছে, তার সঙ্গে এক নির্ণয়সাগর প্রেসের তুলনা করলেই ইংরেজ স্থাপিত বিদ্যায়তনের দৈন্য ধরা পড়ে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ইংরেজের অবহেলা, ইংরেজ রাজত্বের অর্থনৈতিক নিপীড়ন সত্ত্বেও আমাদের ভট্টপল্লী, কাশী, পুণা, মাদুরা এখনো লোপ পায়নি।

হটেনটটের সঙ্গে এইখানেই আমাদের পার্থক্য। আমরা ভারতবর্ষে যে নবীন রাষ্ট্র নির্মাণ করতে যাচ্ছি, তার জন্য আমাদের ভাণ্ডারে আছে ঐতিহ্যগত অফুরন্ত

সম্পদ। কিন্তু এই সম্পদ কাজে লাগাবার কোনো লক্ষণ তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। রাষ্ট্রভাষা কি হবে, শিক্ষার মাধ্যম কি হবে সে নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি এবং সে সংস্কৃতির প্রধান বাহন টোল-চতুষ্পাঠী কি প্রকারে আমাদের প্রধান প্রধান শিক্ষায়তনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমাদের শিক্ষাকে ঐতিহ্যালোকমণ্ডিত সর্বাঙ্গসুন্দর করবে, তার তো কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।

জানি, শুধু টোল-চতুষ্পাঠীর শাস্ত্রচর্চা নিয়ে বিংশ শতাব্দীর বিদ্যাচর্চা সম্পূর্ণ হয় না; কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা জানি, দেশের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা বৃহত্তর ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক প্রস্তুত করতে পারবে না।

তথাকথিত প্রগতিপন্থীরা হয়তো বলবেন, "অতীতের 'জঞ্জাল' বাদ দিয়ে 'মুক্ত মনে' অগ্রসর হও।"

উত্তরে নিবেদন করি, "১৯১৯ সালে রুশও এই কথাই বলেছিল। অতীতের 'জঞ্জাল'কে বিসর্জন দিতে গিয়ে তখন সে যে শুধু ধর্মকে নিষ্পেষিত করেছিল তা নয়, টলস্টয় পুশকিন টুর্গেনিভের মত লেখকের ঐতিহ্যও বাদ দিয়ে সে 'নূতন সংসার' পেতেছিল। কিন্তু যেদিন জার্মানী তার সে-সংসারে আগুন ধরালো তখন দেখা গেল, সে-সংসার বাঁচাবার জন্য আগ্রহের বড়ই অভাব। তখন আবার খোলা হল গির্জাঘর, আবার ডাকা হল অনাদৃত ঐতিহ্য-পন্থীদের, আবার চিৎকার করা হল 'পবিত্র রাশিয়া'র (Holy Russia) নামে, আবার আহ্বান প্রচারিত হল টলস্টয়, পুশকিনের দেশকে বাঁচাবার জন্য।

রুশ সেদিন হুঙ্কার দিয়ে বলেছিল, "জয়তু ইভান দি টেরিব্‌ল্‌।" "জয়তু ঐতিহ্যঘন মার্কস" বলেনি।

ভারতবর্ষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করবে কে? ভারতীয় ইতিহাসের সে ধারার সন্ধান কোথায়—যে-ধারা বহু জাতি, বহু বর্ণ, বহু আর্য, বহু অনার্যকে এক করে নিয়ে বিশাল থেকে, বিশালতর হয়ে বিশ্বমানবকল্যাণের সাগর সঙ্গমের দিকে বিজয় গর্জনে অগ্রসর হয়েছিল?

ঐতিহ্যগত সে-সংস্কৃতি ধারার সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি সংযুক্ত না হয়, তবে হটেনটটে ভারতীয়ে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

দৈনিক বসুমতী

কেহ বলেন বিয়াল্লিশের আন্দোলন ফলপ্রসূ হয় নাই ; কেহ বলেন আন্দোলন কংগ্রেসের ছিল না, ফলপ্রসূ হইল কি না তাহাতে কংগ্রেসের লজ্জিত বা মর্মাহত হইবার কিছুই নাই ; কেহ বলেন, না, আন্দোলন কংগ্রেসেরই এবং বহু দেশপ্রেমিক তাহার সর্ব দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত আছেন।

এসব তো তৈলাধার পাত্র ও পাত্রাধার তৈল লইয়া হাতীবাগানের নৈয়ায়িকদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক। জিজ্ঞাসা করি আগস্ট মাসে সমস্ত দেশব্যাপী জাগরণে যাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহারা কি উকিল ডাকিয়া আইন মিলাইয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন ? মনে পড়ে বোম্বাই সহরের স্কুল-কলেজের ছেলেরা সেদিন উৎসাহের আবেগে কি কাণ্ডটাই না করিয়াছিল। যাহা কিছু করিয়াছিল, তাহার কোনোটাই হয়ত স্বরাজের পথ সুগম করিয়া দেয় নাই. পক্ষান্তরে কোনোটা হয়ত স্বরাজ সাধনার পথে অন্তরায় ছিল, কিন্তু সেই রাসায়নিক বিশ্লেষণই তো শেষ কথা নয়। গরুড়ের ক্ষুধা লইয়া মানুষ যখন জাগে, তখন কি তার খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা বোধ থাকে ? কিন্তু ক্ষুধাকে নমস্কার করি, সেই জাগরণকে দেশের চরম মোক্ষ বলিয়া জানি, স্বরাজ আজ পাইলাম অথবা দশ বৎসর পরেই পাইলাম। ভুলিলে চলিবে না যে কংগ্রেস পূর্ণ অখণ্ড ভারতবর্ষের মুখপাত্র। কংগ্রেসের আন্দোলন দেশের আন্দোলন, ও স্বরাজ লাভের জন্য দেশের জনসাধারণের ব্যাপক আন্দোলন মাত্রই কংগ্রেসের আন্দোলন—সে স্বতঃস্ফূর্ত ই হউক আর ধৈর্যচ্যুতিবশতই হউক।

কারণ, এই জাগরণই কি সত্য নয় ? এই জাগরণের পুরোভাগে থাকিয়া যাঁহারা প্রাণ দিলেন তাঁহারা কি স্বরাজ পান নাই ? তাঁহাদের আত্মা অবিনশ্বর লোকে যায় নাই ? রাজার রাজা যিনি তাঁহার ক্রোড়ে কি তাঁহারা আসন পান ; স্বরাজ যেদিন আসিবে সেদিন দুই মুষ্টি অন্ন হয়ত বেশি পাইব; হয়ত রমণীরা আরো বেশি অলঙ্কার পরিবেন ; হয়ত পণ্ডিতেরা আরো. বেশি পুস্তক লিখিবেন, হয়ত বিসূচিকায় কম প্রজা মরিবে, কিন্তু মুখ্য যাহা পাইব তাহা তো স্বাধীনতা ; এবং নিশ্চয় জানি সে স্বাধীনতার প্রথম যুগে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত দেশকে গড়িতে গিয়া আমাদিগকে অনেক দুঃখ অনেক দৈন্য সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু তবুও যাহা আসিবে তাহা স্বরাজ।

সেই স্বরাজ কি তাঁহারা পান নাই—যাঁহারা প্রাণ দিলেন যাঁহারা কারাগারে উৎপীড়িত হইলেন ? জাগ্রত হইয়া মরিবার পূর্বে যে কয়দিন, যে কয় দণ্ড তাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে তাঁহাদের মনে, তাঁহাদের সর্ব অস্তিত্বে, সর্বচৈতন্যে

তো তখন স্বরাজ। তখন তাঁহারা পুলিশের এ আইন মানেন নাই, কানুন ভাঙিয়াছেন, রাজাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, রাজপুরুষের হুঙ্কারের সম্মুখে অট্টহাস্য করিয়াছেন। তাঁহারা তো তখন দেহেমনে মুক্ত পুরুষ। তাঁহারা তো চলিয়াছেন, চলার পথে—

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

চলিতে চলিতে যে শ্রান্ত তাহার আর শ্রীর অন্ত নাই, হে রোহিত এই কথাই চিরদিন শুনিয়াছি। যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখা হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলিতে চাহে না, সে শ্রেষ্ঠ জন হইলেও সে ক্রমে নীচ (পাপী) হইতে থাকে, অতএব অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।

পুষ্পিণৌ চরতো জঙ্ঘে ভুষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ
শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

যে চলে, দেহের দিক হইতেও তাহার অপূর্ব শোভা পুষ্পের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তাহার আত্মা দিনে দিনে বিকশিত হইতে থাকে; এই তো মস্ত ফল। তারপর তাহার চলার শ্রমে চলিবার মুক্ত পথে তাহার পাপগুলি আপনিই অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়ে। অতএব, অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

চলাই হইল অমৃত লাভ, চলাই তার স্বাদু ফল, চাহিয়া দেখ ঐ সূর্যের আলোকসম্পদ যিনি সৃষ্টির আদি হইতে চলিতে চলিতে একদিনের জন্যও ঘুমাইয়া পড়েন নাই। অতএব অগ্রসর হও, অগ্রসর হও। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ; ভারতের সংস্কৃতি, পৃ. ১৩।৪)

চলা ও পৌঁছা সে মৃত্যুঞ্জয় বীরদের এক হইয়া গিয়াছিল। কে বলিবে তাঁহারা শুধু কর্মই করিয়াছিলেন, ফল পান নাই। স্বাধীন জাতি যে-আনন্দ ভোগ করিবার সুযোগ কখনও পায় না—অধীনতা হইতে স্বাধীনতা অর্জনের যে আনন্দ, বিরহের পর রাধার কৃষ্ণ মিলনের যে আনন্দ—সেই আনন্দ সেই অমৃত মৃত্যুক্ষণে তাঁহারা পান করিয়া অমর হইলেন।

আর যাঁহারা অধর্ম অন্যায়ের স্বহস্তনির্মিত কারাগারের পাষাণ-প্রাচীরের

অন্তরালে সঙ্গীহীন বন্ধুহীন কর্মহীন জীবনযাপন করিলেন, তাঁহারা তো আরও নমস্য। স্বরাজ তাঁহারা কারারুদ্ধাবস্থায় অন্তরে অন্তরে হারাইলেন না তাঁহাদের আত্মত্যাগ রুদ্ধগতি অন্তর্মুখী হইয়া পর্বতকন্দরে আবদ্ধ বর্ষার স্রোতের মত ফুলিয়া ফুলিয়া স্ফীত হইয়া তাঁহাদিগকে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। এই মাত্র বলিতে পারি, কর্তব্যকর্ম উপেক্ষা না করার যে-বিবেকানন্দ, তাহা তাঁহারা সকলেই পাইয়াছেন—আজ যাঁহারা নষ্ট স্বাস্থ্য, ভগ্নোৎসাহ, হৃতআদর্শ হইয়াও নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, তাঁহারাও তো কিয়ৎকালের জন্যও পরমহংস হইয়াছিলেন। আজ যদি তাঁহাদের কেহ কেহ নির্জীব, প্রাণহীন হইয়া থাকেন, তবে তাহার জন্য দায়ী কে? দায়ী আমরা। আমরা যাহারা তখন উঠিয়া দাঁড়াই নাই, সে রাজাধিরাজদের হাত ধরিয়া সম্মুখে চলি নাই, আমরা যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে, ক্ষুদ্র ভয়ের ভ্রূকুটিতে গৃহকোণে আশ্রয় লইয়াছিলাম। শ্যামল নির্মল কোমল উত্তরীয় বিছাইয়া নিদ্রালস নয়নে দেখিলাম প্রসারিত হস্ত আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল, শুনিলাম চরৈবেতি, চরৈবেতি, কিন্তু উঠিলাম না। তবু জানি, সে হস্ত আমাদের আশীর্বাদ করিয়াছিল—তাঁহারা তো স্বরাজ পাইয়াছেন; এই পাপীদের জন্যই তো তাঁহাদের আত্মদান, বলিদান।

কারাগারে কি প্রতিদিন প্রতিক্ষণ তাঁহারা অপেক্ষা করেন নাই, আশা করেন নাই যে, আমরা, তাঁহাদের ভ্রাতা-বন্ধুরা তাঁহাদের দেবত্বের এক কণাও অন্তত পাইয়াছি? বিদেশী রাজের দয়ায় যেন একদিন তাঁহাদের নিষ্কৃতি পাইতে না হয়। তাঁহারা কি আশা করেন নাই যে, একদিন আমরা তাঁহাদিগকে মাথার মণি করিয়া বাহিরে লইয়া আসিব? এখনও যাঁহারা মুক্তি পান নাই, তাঁহাদের জন্যই বা আমরা কি করিতেছি?

তারপর আসিল দুর্ভিক্ষ। তাঁহাদের অভাব আমরা যে তখন কি নিদারুণ ভাবে বুঝিয়াছিলাম, তাহা বাঙলা দেশ কখনো ভুলিবে না। অন্নাভাবে মরিল বহু লোক, কিন্তু তাহারও বেশী লোক মরিল প্রয়োজনীয়, উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে। এক বিদেশী তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোটি কোটি জনগণের মধ্যে সামান্য যে-কয়টি দেশসেবক জেলে আছেন, তাঁহারা ছাড়া দেশে কি অন্য কর্মী নাই?" শিরে করাঘাত করিয়া বলিয়াছিলাম, "নাই, এই হতভাগা দেশে ভগবান যে-কয়টি মানুষ নির্মাণ করেন, তাঁহাদিগকে তিনি সর্বগুণই অকৃপণভাবে ঢালিয়া দেন। তাঁহাদের কেহ কবি, কেহ চিত্রকর, কেহ দার্শনিক, কিন্তু সকলেই সেসব গুণ উপেক্ষা করিয়া দেশসেবাকে প্রধান স্থান দেন। কবিকে কবি বলিলে কবি লজ্জিত হন, দার্শনিককে দার্শনিক বলিলে তিনি

আর বন্ধুর মুখদর্শন পর্যন্ত করিতে চাহেন না ; তিনি হয় হইতে চান স্বাধীনতা জেহাদের সিপাহী নতুবা শহীদ। কাব্যে-দর্শনে যেসব কৃতিত্ব পূর্বে দেখাইয়াছিলেন, সেগুলিকে অবান্তর, অপরিপক্ক বালসুলভ চপলতা বলিয়া ধিক্কার দেন, বিদেশীকে বলিয়াছিলাম, ইঁহারাই আমাদের সাত রাজার ধন মানিক, সর্পের মণি। মণি অপেক্ষা সর্প অনেক বৃহৎ, কিন্তু মণিহারা ফণী, আর আমাদের দেশপ্রেমী কর্মী ব্যতীত দেশ একই অভিসম্পাত।'

জানি, কেহ কেহ সস্তায় দেশের জনসাধারণের মন কাড়িবার জন্য কাজের ভান করিয়াছিলেন, অথবা যেখানে ভান করিতে সক্ষম হন নাই, সেখানে ঈষৎ কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু এও জানি, তাঁহাদের বিরুদ্ধ-আন্দোলনের ফলেই বহু দেশপ্রেমিককে বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল—সেকথা ভুলি নাই, ভুলিবার ইচ্ছাও রাখি না। তবে সে বিচারের দিন এখনও আসে নাই।

তারপর ছিন্নভিন্ন কর্মীদের মধ্যে অবসাদের যুগ আসিল। পলায়িত, পুলিস তাড়িত ইঁহারা এই গৃহে ঐ গৃহে আশ্রয় খুঁজিলেন। আমরা অধঃপাতের শেষ সীমায় পৌছাই নাই বলিয়া ইঁহারা আশ্রয় পাইলেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের উদ্যমহীন ভগ্ন জীবন দেখিয়া অন্তরে অন্তরে কি যাতনাই না ভোগ করিয়াছি। এক বন্ধুকে বলিয়াছিলাম, তুমি তো এককালে ভালো কবিতা লিখিতে, লেখো না দুই একটি ; আমার বাড়িতে কি অমনি অন্নধ্বংস করিবে ? মনে আছে আমার রুগ্ন বন্ধু ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোর বাড়ি দেখি জেলের চেয়েও খারাপ। জেলেও তো সরকার বিনা পয়সায় খাইতে দেয়, তুই যে কবিতা চাস। না হয় তোর বাগানে জল ঢালিয়া দিব।' আশ্চর্য হইলাম, মাসের পর মাস গ্রাম হইতে গ্রাম অনশনে, পথশ্রান্তিতে, মানসিক উদ্বেগে কাটাইয়াও তাহার সেই বিমল রসিকতা করিবার ক্ষমতাটি যায় নাই। আশা আছে ; তাহা হইলে আশা আছে—ইঁহাদের মেরুদণ্ড কোনো রাজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিতে পারিবে না। ইঁহাদের অবসাদ ক্ষণিক, ইঁহাদের স্থিতি মায়া, মিথ্যা। ইঁহারা আবার অগ্রসর হইবেন।

এখনও আমাদের আত্মজনরা কারাগারে আছেন। নিষ্কৃতি তাঁহারা পাইবেন কিন্তু তাহা মুক্তি নহে। তাঁহাদিগের মুক্তি দানের সম্মান আমাদের হাতে ছিল ; আমরা খোয়াইয়াছি।

বোম্বায়ের সম্মেলনে ইঁহাদের অশরীরী সত্তা উপস্থিত থাকিবে। আমরা যেন এমন কিছু না বলি বা করি যাহাতে তাঁহাদের মনে আঘাত লাগে অথবা তাঁহাদের কর্তব্যবোধের বিপক্ষে যায়। নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত কর্মীরা ইঁহাদের সঙ্গে এতদিন কারাগারে

কাটাইয়াছেন। তাঁহাদের কপালে কারাগারের লাঞ্ছনা-লাঞ্ছন অঙ্কিত, তাঁহারাই ইঁহাদের চিনেন; তাঁহারাই যেন সেখানে প্রধান হোতা প্রধান বক্তা হন।

আর যাহারা অগ্রদানী হইয়াছিল, তাহারা যেন সে-সভায় প্রবেশাধিকার না পায়।

আর যাঁহারা পুণ্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন, যেখানে রাজায় প্রজায় ভেদ নাই, যেখানে আলিপুর, দমদম নাই, যেখানে পূজার থালাতে ভাইয়ের রক্ত ছিটাইবার লোক নাই, সেখান হইতে তাঁহাদের আত্মা এই সম্মেলনের কর্মকর্তাগণকে শুভবুদ্ধি দান করুক।

'দেশ' পত্রিকা, ২২. ৯. ১৯৪৫

একদা যাহার বিজয় সেনানী

দিল্লী যে অত্যন্ত "দূর অস্ত্", সে খবর প্রবাদ বাক্যের ভিতর দিয়ে আমরা বহুকাল পরেই জানতুম। সে খবর নূতন করে হৃদয়ঙ্গম করলুম যখন সেদিন শুনতে পেলুম দিল্লীতে ভারতীয় পররাষ্ট্র বিভাগ এবং বিদেশে ভারতীয় রাজদূতাবাসের কর্মচারী-দের জন্য ব্যাপক শিক্ষা-ব্যবস্থা হয়েছে এবং হচ্ছে। দিল্লী "দূর অস্ত্" বলেই খবরটা এত দেরিতে পৌছল।

দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ সব বিষয়েই কলকাতাকে ছাড়িয়ে যাক, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় ভারতবর্ষের কোনো শহর কলকাতাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বা শিগগীরই যাবে, এ সংবাদ শুনলে আমার চিত্ত অধীর হয়ে ওঠে। এই ব্যাকুলতাকে অবাঙালীরা নাম দিয়েছেন 'প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা', 'দেমাক', 'স্ববারি'। হবেও বা। 'কোন গুণ নাই—' লেখকের কর্ণে যে এ-সব কটুকাটব্য মধু বর্ষণ করে, সে-কথা 'বসুমতী'র পাঠক নিশ্চয়ই এতদিনে ধরে ফেলতে পেরেছেন। "জিন্দাবাদ ইস কিস্‌ম্‌কী সঙ্কীর্ণতা।"

অর্ধশিক্ষিত কাবুলীরা বলে, "কাবুল বে-জর্ শওদ, লেকিন্ বে-বর্ফ ন বাশদ" অর্থাৎ 'কাবুল স্বর্ণহীন হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বরফহীন যেন না হয়।' কারণ কাবুলীরা জানে, বরফ-গলা জল না পেলে গম ফসল ফলবে না, আর শুধু সোনা চিবিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। কলিকাতা শিক্ষাদীক্ষায় অন্ততঃ কাবুলের চেয়ে শ্রেয়ঃ, তাই বলি 'কলকাত্তা বে-জর্ শওদ, লেকিন বে-ইল্‌ম্ ন্ বাশদ।' "কলকাতা স্বর্ণহীন হোক আপত্তি নেই (যেটুকু স্বর্ণ আছে তাও তো বাঙালীর হাতে নয়) কিন্তু বিদ্যাহীন যেন না হয়।"

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজমন্ত্র "Advancement of learning"।

শুনেছি, ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের অন্ধানুকরণ করতে চান না বলে Learning কথাটার 'এল' হরফটি বাদ দিয়ে 'মৌলিকতা' এবং 'নিজস্বতা' বজায় রেখেছেন। তাঁদের "Earningও জিন্দাবাদ!"

দিল্লীতে যে নূতন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে তার প্রধান অঙ্গ নানা বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া। বিবেচনা করি, এই শিক্ষার ফলে একদিন দিল্লীতে বহু ভাষা শিক্ষার আব্‌হাওয়া নির্মিত হবে এবং ফলে চাকরি পাবার পরীক্ষায় বাঙালী ছেলেরা হেরে যাবে।

অথচ এই কলকাতাতেই বহুবার বহু চেষ্টা হয়েছে ফরাসী জর্মন ইত্যাদি ভাষাকে ব্যাপক ভাবে চালু করবার। বিশ্ববিদ্যালয়, Y.M.C.A., সিনজেভিয়ার আমারই জানা মতে বহুবার ফরাসী জর্মনের নৈশ বিদ্যালয় খুলেছেন, ততোধিক-বার বন্ধ করেছেন। বাঙালী ছেলের মন পাননি বলে।

আর সবাই তাই নিয়ে বাঙালী ছেলেকে বিস্তর কড়া কথা বলেছেন কিন্তু আমরা বলিনি। কারণ বাঙালী ছেলে যদিও আর পাঁচটি ছেলের তুলনায় জ্ঞানান্বেষণ করে বেশী, তবু তারও তো একটা সীমা আছে। তার উপর আরেকটি তত্ত্বও ভুললে চলবে না। বাঙালী ছেলে স্বর্ণলোভী নয়, কিন্তু অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন তারও আছে। ফরাসী, জর্মন তাকে এতদিন চাকরির পথে কোনো সুবিধা করে দিতে পারতেন না।

এখন হাওয়া বদলেছে অথবা দু'তিন বৎসরের ভিতরই হাওয়া বদলাবে। শুনেছি, পণ্ডিতজী নাকি আপসোস করে বলেছেন, 'বিদেশী বিভাগের জন্য, যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়নি।' বিবেচনা করি, ভাষা বাবদে ভারতীয়েরা যে অন্যান্য দেশের তুলনায় কতটা পশ্চাৎপদ, সে-খবর পণ্ডিতজীর কাছে অজানা নয়।

এস্থলে একটি বিষয় সবিস্তর নিবেদন করি। পররাষ্ট্র বিভাগ ও বিদেশের রাজদূতাবাসের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করবার সময় প্রধানতঃ দেখা হয় প্রার্থী কয়টি ভাষা জানে। উপস্থিত একই প্রার্থী ফরাসী, জর্মন, উভয় ভাষাই জানে এরকম লোক পাওয়া যায়নি। তাই এখন কোন্ নীতির মাপকাঠি মেনে চাকরি দেওয়া হচ্ছে জানি নে। তার মানে নানারকম সন্দেহ আছে,—সেগুলো প্রকাশ করলে সরকারের বিরাগভাজন হবার সমূহ সম্ভাবনা।

তা সে যাই হোক, কিন্তু এ-কথা নিশ্চয় জানি, বিশ-ত্রিশ বৎসর পরে সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির উদ্ভাবনা হবে। আজ যেসব ভারতীয় রাজদূত প্যারিস, জিনিভা, চিলি, মস্কোতে আছেন, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা বিদেশী ভাষা শিখছে। এসব

রাজদূতেরা আবার ঘন ঘন বদলী হন। আজ যিনি পিকিং-এ কাল তিনি ওসলোত, তিন বৎসর পর তিনি রোমে, পাঁচ বৎসর পর তিনি হয়ত হেলসিঙ্কিতে। তাই তাঁর ছেলে-মেয়েরা দশ-বারো বৎসরের ভিতর গোটা চার ছয় ভাষাতে সড়গড় হয়ে যায়। বিশ-ত্রিশ বৎসর পর এরা চাকরির বাজারে নামবে।

যে ছেলে সমস্ত ছাত্রজীবন কলকাতা বা বর্ধমানে কাটালো, সে ভাষা বাবদে যতই মেধাবী হোক না কেন, তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব উপযুক্ত রাজদূতের ছয় ভাষা জাননেওয়ালা ছোকরার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ফরেন আপিসে বা বিদেশী রাজদূতাবাসে চাকরি পাওয়া। তাই বিশ-ত্রিশ বৎসর পরে সেই সব পরিবারের ছেলেরাই এসব চাকরি পাবে, ভবিষ্যতের জন্য তাবৎ বিদেশী চাকরি এবং ফরেন আপিস সেই সব প্রদেশের একচেটিয়া হয়ে যাবে। বাঙালীরা যদি এখন এসব চাকরিতে কিছুটা না ঢুকতে পারে, তবে বিশ-ত্রিশ বৎসর পরে তার পক্ষে নাসিকাগ্র ঢোকানোও সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে।

পরিস্থিতিটার যে বর্ণনা দিলুম সেটা কাল্পনিক নয়। অন্যান্য সব দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের বেলায় যা আমাদের বেলাও তাই।

তাই বলি, সাধু এখন থেকেই সাবধান। বাঙালী যদি এই বেলা কলকাতাতে বিদেশী ভাষা শেখাবার ব্যাপক ব্যবস্থা না করে, তবে আপন ঘুম ভাঙলে দেখতে পাবে, দিল্লীর কৃপায় এক খানদানী চক্করের সৃষ্টি হয়েছে এবং সে চক্রব্যূহ ভেদ করা তখন আর বাঙালীর পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

পাঠক হয়তো বলবেন, "এই আড়াইখানি চাকরির জন্য অতো চেল্লাচেল্লি করছো কেন?"

আড়াইখানা চাকরির কথাই শেষ কথা নয়। ফরেন আপিস ও বিদেশে স্থাপিত অগুণতি রাজদূতাবাস যে কি বিশাল শক্তি ধারণ করে, তার খবর বেশির ভাগ লোকই জানে না। কারণ এদের ক্রিয়াকলাপ আইনতঃ 'গোপনীয়'— স্ট্রিক্টলি 'কন্‌ফিডেনশিয়াল'। যখন এদের নীতি এবং কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত ধিক্কার-জনক হয়ে যায়, তখন হঠাৎ কোনো কোনো সময় কেলেঙ্কারী কেচ্ছা ছড়িয়ে পড়ে। 'কেটোর' 'গিল্টিমেন' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, একমাত্র লণ্ডন ফরেন আপিস গত যুদ্ধের জন্য কতটা দায়ী।

বাঙালী যদি গবেট না হত তবে ফরেন আপিসে তাদের স্থান করার জন্য আমাদের এত কান্নাকাটি করার প্রয়োজন হত না।

তা ছাড়া, ভারতীয় সভ্যতা বৈদগ্ধ্যের প্রতিভূ হওয়ার জন্য বাঙালীর হক অনেকের চেয়েও বেশি। ভারতবর্ষ মহাত্মা গান্ধীর দেশ, রবীন্দ্রনাথের দেশ।

এঁদের বাণী বিদেশে প্রচার করার হক্ এঁদের মাতৃভাষার সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত তাঁদের কিছুটা আছে বৈকি! তাই প্রশ্ন, দিল্লীর ফরেন আপিসে আমরা এ যাবৎ ক'টি স্থান পেয়েছি? এবং ভবিষ্যতে যাতে পাই, তার জন্য কলকাতার কি ব্যবস্থা করেছি? বিশ্ববিদ্যালয় কি করছেন?

মাসিক বসুমতী

জাতীয় মহাশঙ্খের স্বরূপ

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী অথবা হিন্দুস্থানী (অথবা অন্য যে-কোনো নামেই ডাকো না কেন) হবে একথা পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু (এ স্থলে বাঙালী পাঠককে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি যে, আমাদের প্রধান মন্ত্রীর নাম আমরা এখনো ঠিক বানান করতে শিখিনি। এ বড় পরিতাপের বিষয়। পণ্ডিতজীর নাম 'জওহর' নহে—যদিও তাঁরনাম এই শব্দেরই রূপান্তর। পণ্ডিতজীর নাম 'জওয়াহির'—দেবনাগরী অক্ষরে 'জবাহির' বা 'জবাহর' লেখা হয়—এবং এই শব্দটি প্রাচীন পহ্লবী শব্দ 'জওহরের' বহু বচন। কথাটা আসলে "গওহর" কিন্তু আরবী ভাষাতে 'গ' অক্ষর নেই বলে আরবরা তৎপরিবর্তে 'জ' অক্ষর ব্যবহার করে। 'জওহর' শব্দের অর্থ মূল্যবান প্রস্তর কিন্তু আসল অর্থ essence অথবা নির্যাস। পণ্ডিতজীর নাম 'জওয়াহির' বলেই ইংরেজীতে Jawahar লেখা হয়—Jawhar লেখা হয় না। এ স্থলে অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যদি হিন্দীতে 'জবাহির' লেখা হয়, তবে ইংরিজীতে পণ্ডিতজী Jawahir না লিখে Jawahar লেখেন কেন? তার কারণ, সর্বশেষ স্বরবর্ণটি এতই হ্রস্ব যে, তার উচ্চারণ ঠিক 'i' না 'a' শোনা যায় না বলে 'a' ব্যবহার করা হয়েছে—অবশ্য আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী 'i' হরকটি ব্যবহার করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত) বহু উপলক্ষ্যে প্রকাশ করেছেন এবং এ সম্পর্কে যে সব মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, সেগুলো আমাদের সকলেরই ভেবে দেখা উচিত।

কিন্তু আমাদের—অর্থাৎ সাধারণ বাঙালীর—প্রধান বিপদ এই যে, হিন্দী, হিন্দুস্থানী এবং উর্দু—এই তিন ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ কি, সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। মোটামুটি জানি যে, হিন্দী দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হয়, আর উর্দু আরবী বা ফারসী অক্ষরে। কিন্তু এই হিন্দুস্থানী বস্তুটি কি, এবং সেটি লেখা হয় কোন্ অক্ষরে?

সে-কথা বুঝতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন খাঁটি হিন্দী এবং খাঁটি উর্দুর স্বরূপ চেনা। হিন্দী ভাষা বাঙালারই মত প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশের ফল

—উর্দু তাই। অর্থাৎ অতি সাধারণ হিন্দী এবং উর্দুতে কোনো পার্থক্য নেই। 'তুম কব আয়োগে?' 'মৈঁ কল কানপুর জাঙ্গা' ইত্যাদি সরল সাধারণ কথায় হিন্দী উর্দুতে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু চিন্তা এবং অনুভূতির জগতে প্রবেশ করে যখন বলি, "ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজন" তখন হিন্দী বাঙলার মত প্রধানতঃ সংস্কৃতের স্মরণ নিয়ে বলে, "ভারতবর্ষ কী রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে লীয়ে অর্থনৈতিক উনতিকী প্রয়োজন হৈ" এবং উর্দু সেস্থলে আরবী ফারসীর শরণ নিয়ে বলে "হিন্দুস্থান কী সিয়াসতী আজাদীকে লীয়ে ফিস্‌কী তরকীকী জরুরৎ হৈ।"

ভাষার দিক দিয়ে এই হল প্রধান পার্থক্য।

বাঙলার সঙ্গে এই আলোচনাটা মিলিয়ে নিয়ে তাকালে দেখি বিদ্যাসাগরী বাঙলা হিন্দীরই মত, আর 'আলালের ঘরের দুলাল' অনেকটা উর্দুর কাছে চলে যায়। কিন্তু বাঙলার সুবিধা হচ্ছে এই যে, আমরা আজ বিদ্যাসাগরী এবং আলালী উভয় ভাষাই বর্জন করেছি অথবা বলতে পারি আমরা দুটোই গ্রহণ করে নিয়েছি। 'পরশুরাম' প্রয়োজন মত কখনো সংস্কৃত ঘেঁষা কখনো ফারসী ঘেঁষা বাঙলা লিখে যে অপূর্ব রস সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন, সে রস বাঙলা ভাষার ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। আমরা বাঙলা লিখতে এখন আর এ বিচার করিনে, কোন্ শব্দ আসলে ফরাসী আর কোন্ শব্দ সংস্কৃত।

দিল্লী এবং যুক্তপ্রদেশে এক কালে উর্দুর প্রাধান্য ছিল বলে হিন্দীতে বিস্তর আরবী ফারসী শব্দ ঢুকতে পেরেছে—বাঙলার তুলনায় অনেক অনেক বেশী। কিন্তু বাঙালায় বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ভাষা বাবদে যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে গিয়েছেন, হিন্দীতে সেরকম কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। তাই হিন্দী ভাষা-ভাষীদের মধ্যে কিছুদিন হল এক 'ছুৎবাই' বা puritan আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে।

এ-আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঝা। শান্তিনিকেতন সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে তিনি গত ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মুখে রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে হিন্দীতে এক ভাষণ দেন। ওঝাজী আধ ঘণ্টাটাক বক্তৃতা দেন —আমি অবিহিতচিত্তে সে বক্তৃতা শুনি। লক্ষ্য করলুম যে, সেই বক্তৃতাতে তিনি একটি মাত্র অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করলেন না। যে-সব আরবী ফারসী শব্দ, হিন্দীর সঙ্গে মিশে গিয়ে বহুকাল হল এক হয়ে গিয়েছে (বাঙলাতে যে রকম "অকুস্থানের' 'অকু', ময়না-তদন্তের 'ময়না', 'সবুজ' 'সবজি', 'গরীব' ইত্যাদি শব্দের জাত-বিচার আজ আর কেউ করে না) শ্রীযুক্ত অমরনাথ সেগুলো পর্যন্ত বর্জন করে বক্তৃতা দিলেন। এমন কি 'ইসকে বাদ' না বলে 'ইসকে পশ্চাৎ সে' বললেন!

উপসংহারে শ্রীযুক্ত অমরনাথ বললেন, 'হমলোগোঁকী রাষ্ট্রভাষা 'সংস্কৃতময়ী' হিন্দী হোগী'। অর্থাৎ হিন্দী উর্দুর দ্বন্দ্বের আর কোনো প্রশ্নই উঠে না। হিন্দুস্থানীও না, এমন কি আমাদের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী থেকেও অসংস্কৃত সর্বপ্রকার শব্দ বাদ দিয়ে তাকে সংস্কৃতের পর্যায়ে তুলতে হবে।

বাঙলার সঙ্গে মিলিয়ে এই তত্ত্বটি প্রকাশ করতে হলে বলতে হবে, 'পরশুরামী সুকুমার রায়ী বাঙলা তো নয়ই, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথী বাঙলাও না, আমরা এখন সব কিছু বলব এবং লিখব বিদ্যাসাগরী বাঙলায়।'

মহাত্মাজী এ জাতীয় অতিশুদ্ধ, কট্টর হিন্দীর নিন্দা করেছেন, অতিশুদ্ধ উর্দুকেও ঠিক তেমনি নিন্দা করেছেন। মহাত্মাজী চেয়েছিলেন, এই দুইয়ের সংমিশ্রণে গড়ে-ওঠা, নবীন নবীন চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশে সক্ষম, তার জন্য নূতন শব্দ গ্রহণে অকুণ্ঠিত, প্রাণবন্ত সজীব ভাষা। সে-ভাষা শেষ পর্যন্ত কি রূপ নেবে সে সম্বন্ধে মহাত্মাজী কিছু বলেননি, কিন্তু উপস্থিত সে ভাষার শব্দসম্পদ দেখাবার জন্য তিনি স্বয়ং একটি অভিধান নির্মাণ করেছিলেন ও সপ্তাহে সপ্তাহে আপন সাপ্তাহিকে সেটি প্রকাশ করেছিলেন।

এই ভাষার নাম হিন্দুস্থানী। এ ভাষা তেজবাহাদুর সপ্রুর অতিশুদ্ধ উর্দু নয়, পণ্ডিত মালবীয়ের (মালব্য নয়) অতিশুদ্ধ হিন্দী নয়,—হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসি-মুসলমান-খৃষ্টানীর মহাশঙ্খ রাষ্ট্রভাষা।

পণ্ডিত জওয়াহিরলাল এই জাতীয় ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চান। পণ্ডিতজী ভাষাবিদ্ অথবা শব্দতাত্ত্বিক নন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছেন যে, আমাদের রাষ্ট্রভাষা যখন শেষ পর্যন্ত তার জন্মভূমি যুক্তপ্রদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র মগধ সর্বত্রই সে ভাষা ব্যবহৃত হবে তখন সে ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে নানা প্রকারের শব্দ গ্রহণ করতে বাধ্য। ইংরিজী ভাষা ভারতবর্ষে এসে Dawk, Juggernant, Choroot প্রভৃতি কত শব্দ গ্রহণ করেছে তার হিসেব নেই—যে-দেশে গিয়েছে সেখানেই নূতন নূতন শব্দ গ্রহণ করে আপন ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করেছে।

তাই আজ ইংরিজীর সঙ্গে শব্দ-সম্পদে পাল্লা দিতে পারে এমন ভাষা পৃথিবীতে নেই। ফরাসী ভাষা বিদেশী শব্দ গ্রহণে অত্যন্ত বিমুখ, তাই ফরাসী ভাষা ইংরিজীর তুলনায় গরীব। পণ্ডিতজী উদারচিত্ত, গভীর দৃষ্টি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছেন ভারতবর্ষের আদর্শ কি, সে আদর্শে পৌঁছতে হলে কি প্রকারের ভাষার প্রয়োজন।

বিশাল ভারত, বৃহত্তর ভারতবর্ষের স্বপ্ন যাঁরা দেখতে চান, একমাত্র তাঁরাই মহাত্মাজীর বাণী, পণ্ডিতজীর আবেগ বুঝতে পারবেন।

অটোপ্রমোশন

বহুকাল ধরে আমি স্বদেশবাসীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সাহিত্যাচার্য বঙ্কিমচন্দ্রের নামের পূর্বে "ঋষি" অভিধা যোগ করতে পারতুম না বলে কেমন যেন ঈষৎ সংকোচ অনুভব করতুম। তারপর হঠাৎ (ঢাকাতে এদানির রংদারী ভাষায় "হঠাৎ করে") এক শুভপ্রাতে আমার জনৈক মুরুব্বি পথে যেতে যেতে শুনতে পেলেন আমি তারস্বরে পরীক্ষার জিওমিট্রি মুখস্থ করছি। এক লহমার তরে থমকে দাঁড়িয়ে শুনলেন, পরক্ষণেই কণ্ঠস্থ করছি এলজেব্রার ফরমূলা, তারপর আরবী টেক্সটের ইংরেজী অনুবাদ, তারপর সূর্য গ্রহণের শুভঙ্করী—ক্ষণে এটা, ক্ষণে ওটা, ক্ষণে সেটা। সমুচা বছরটি কাটিয়েছি হেথা হোথা সর্বত্র গ্যাংজাম করার মোকা পেলেই তার ন্যায্য, হকসঙ্গত হিস্যেটি উপভোগ করে—এ তত্ত্বটি আমার মজবুর মুরুব্বিটি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। এখন যে আসন্ন পরীক্ষার সামনে দিশেহারা হয়ে ক্ষণে এ-সবজেক্ট ক্ষণে ও-সবজেক্ট খামচাচ্ছি সেটা হৃদয়ঙ্গম করতেও তাঁর রত্তিভর তকলীফ বরদাস্ত করতে হল না। জানলা দিয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-ভর্তি কদম্ববদনখানা গলিয়ে বাঁকা হাসি হেসে বললেন, "ওরে ভাল্লুক, তোর সর্বাঙ্গে যে চুল। তেড়ি কাটবি কোথায়?"

হঃ!—দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে সেই খাট্টা বর্‌হক্ তত্ত্বটা গিলে নিয়ে ভাবলুম, "হায়, দু' একটা সবজেক্ট হেথা হোথা নেগলেক্ট করে থাকলে মামেলা এৎনা ঝামেলাময় হোত না। হয় টুকলি মেরে, নয় গুড বয় মেজদাকে খুঁচিয়ে তার মদৎ-কাঁকুই দিয়ে না হয় ডবল তেড়ি কেটে পরীক্ষার হল্ সমুদ্দুর পেরিয়ে যেতুম ড্যাং ড্যাং করে। কিন্তু ঐ যে পাড়ার ভেটকি-লোচন, বদনা-বদন, গাড়ু-গঠন মুরুব্বিটা যে উপমাটা দিয়ে তত্ত্বকথা বললে তার দাওয়াই কই? হ্যাঁ—সব্বাঙ্গে যখন ঘা তখন মলম লাগাই কোথায়?

কাটা ঘায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে, দিলদরাজ মেকদারে আইডিন ছিটিয়ে যাবার বেলা মুরুব্বি বললেন, "জানিস্, বঙ্কিমচন্দর কি বলেছেন?—

ছাত্রজীবন ছিল
সুখের জীবন
যদি না থাকিত, রে,
এ-গ্-জা-মি-নে-শ-ন!"

তদ্দণ্ডেই চড়াক্সে আমার মাথায় খেলে গেল, কেন আর সব্বাই বঙ্কিমের নামের পূর্বে "ঋষি" খেতাব এস্তেমাল করেছেন। তিনি নাকি বি. এ. না কি যেন

কোন্ পরীক্ষায় ফার্স্ট না সেকেণ্ড হয়েছিলেন। আমি ম্যাট্রিকের সামনেই মুক্ত-কচ্ছ, বে-এক্তেয়ার। হাড়ে হাড়ে বুঝলুম, কী গব্বযন্তনার ভিতর দিয়ে বি. এ'র বাচ্চা তিনি বিইয়ে ছিলেন—নইলে এমনতরো একখানি টালমাটাল গর্দিশের বয়ান জুৎসই চারটি পদে প্রকাশ করা তো চাট্টিখানি কথা নয়, মাইরি।

সেই অবধি আম্মো বঙ্কিমকে ঋষি নামে ডাকি—বিশেষ করে অগুনতি যে-সব পরীক্ষায় দফে দফে ফেল মেরেছি তার পূর্বে এবং পরে।

বস্তুত ঐ কম্মে গত অর্ধ শতাব্দী ধরে আমাকে পয়লা নম্বরী স্পেশালিস্ট বলে গণ্য করা হয়েছে।

তাই বলে বিদ্যা-তন্দুর পাঠক মোটেই ভেবো না, টুকলি মারা বা টুকলি মেরেও ফেল করাটা খুবই একটা ফ্যালনার ব্যাপার। কথাটা বুঝিয়ে বলতে হয়।

বহু যুগ হয়ে গেছে, যাত্রাগান বা থিয়েটার দেখতে যাইনি। তাই বলতে পারবো না এখনো নাট্যজগতে 'এন্‌কোর এন্‌কোর' অর্থাৎ 'ফিন্‌সে'-র রেওয়াজ আছে, না উঠে গেছে। কথাটা ফরাসী 'আঁকোর'-এর বিদেশী শব্দের উচ্চারণ বিগড়ানো বাবদে অলিম্পিক-শিকারী ইংরেজী উচ্চারণ—না, বলা উচিত ছিল দুরুশ্চারণ। কোনো একটা সীন নাট্যামোদীগণকে বেহদ খুশ করে দিলে তাঁরা ঘন ঘন করতালি দিতে দিতে চীৎকার করতেন "এনকোর, এনকোর", "আবার অভিনয় করো, ফিন্‌সে বাৎলাও।" এমন কি ভীষণ গদাযুদ্ধের শেষে দুর্যোধন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর "এনকোর এনকোর" পড়লে তাকেও ফের আকাশ ছোঁয়া লম্ফ মেরে ফিন্‌সে ষষ্ঠত্ব পেতে হত—একবার মরেছে তো কি হয়েছে!

আমি যথারীতি একবার ফেল মেরেছি। পাড়ার হাড়েটক সেই জ্যাঠার সঙ্গে আচানক দেখা। বিটকেল হাসি হেসে বললেন, "কিরে! ফেল মেরেছিস তো?"

আমি ভিট-কিলিমির একখানা সরেস হাস্যে তাঁকে ঘায়েল করে বললুম, 'বলেন কি, স্যার! এ্যামন খাসা খাসা এ্যানসার ছেড়েছিলুম যে এগজামিনার বললে, এনকোর। তাইতে ফের আসছে বছর ম্যাট্রিক দিচ্ছি।'

কিন্তু কী দরকার এসব বখেড়ার? আমি তাই অটোপ্রমোশনের দারুণ চ্যাম্পিয়ান। প্রথমেই দেখুন 'অটো' দিয়ে যে-সব জিনিস তৈরি হয় তার সব কটাই অত্যুত্তম। গ্রীক 'অটো' (আসলে 'আউটো') আর সংস্কৃত 'স্বতঃ' একদম একই শব্দ। কবিগুরুর সর্বাগ্রজ তাই অটোমবিল কার (মোটর গাড়ির) অনুবাদ করেছিলেন স্বতঃচল = স্বতশ্চল শকট। এখন, পাঠক, তুমিই বলো নিজের থেকে চলে স্বতশ্চল শকট ভালো, না ঠেলাগাড়ি ভালো! এই যে তুমি ন' মাস ধরে লড়াই লড়লে সে সময় লাখ খানেক 'অটোমেটিক' স্বতঃক্রিয় রাইফেল পেলে।

আল্লাকে পাঁচ শুকরিয়া জানাতে বেশী, না লাখ মাজল লোডার, গাদা বন্দুক ? এই যে তুমি স্বাধীনতা পেয়েছো, তোমার প্রধান লক্ষ্য কি ? নিশ্চয়ই "অটো+আর্কেইন" অর্থাৎ "অটার্কি", অর্থাৎ "স্বতঃ সম্পূর্ণ" অর্থনীতি—যাতে করে তামাম দুনিয়াটা চষে হাতীর দরে ছাগল কিনতে না হয়। কিংবা ধরো 'অটোবায়োগ্রাফি'। আমার সে ক্ষ্যামতা থাকলে আমি কি আমার অটোজীবনী লিখতুম না ?—নিজেকে আসমানে চড়িয়ে নিদেন তখৎ-ই-তাউসে বসিয়ে একটি ছবি যা আঁকতুম, মাইরি। চেহারায় উত্তম কুমার, গানে হেমন্ত মুখো, নৃত্যে উদয় শঙ্কর, সংগ্রামে ওসমানী ! অবশ্য আমার জীবনী কেউ লিখবে না। কিন্তু 'পাপিষ্টের অপমৃত্যু' নাম দিয়ে আর পাঁচজনকে হুঁশিয়ার করার জন্য আমার উদাহরণ দেখিয়ে কেউ যদিস্যাৎ লিখে ফেলে ? তবেই তো চিত্তির ! টুকলি মারতে গিয়ে ক'বার যে টার্ন আউট হয়েছি সেটাও ফাঁস করে দেবে যে।

তাই বলি, অটোপ্রমোশন বা স্বতঃ উন্নয়ন অত্যুত্তম প্রস্তাব।

তবে হ্যাঁ, আমার একটা শর্ত আছে।

অধ্যাপক রোল কল করে (না করলেও খয়র !) একটু জিরোবেন। আমরা যে যার খুশী মত ক্লাস থেকে বেরিয়ে হেথা হোথা ঘুরে বেড়াব, জেবে রেস্ত থাকলে অবশ্যই মরহুম মধুর মধ্বালয়ে ; যে কটা মূর্খ নিতান্তই পড়াশোনা করতে চায়, তারা তাঁর লেকচার শুনবে, পরীক্ষা দেবে, পাশ করবে। যারা ফেল মারবে তারা পাবে আমাদের মত অটোপ্রমোশন। কিন্তু চাকরির বেলা কি অটো, কি খেটো (খেটে যারা পাশ করেছে) সবাই পাবে সমান চান্স। যে মহাপুরুষ সর্ব প্রথম অটোপ্রমোশনের প্রস্তাব করেছেন তিনি সাতিশয় হক কথা বলেছেন—যে, চাকরি-দেবার বেলা যে চাকরি দেয় সে তো বাজিয়েই নেয়। সে তো পরীক্ষা নেবেই। তবে দু'দু বার পরীক্ষা কেন, বাওয়া ? একটা লোকের ফাঁসি হয় ক'বার ? একই অপরাধে তো দু'দু বার সাজা হয় না। আমার কথায় পেত্যয় না মানলে শুধোন গে পাকিস্তানের প্যারা ব্যারিস্টার ভুট্টোকে ! সে জানে বলে তার দেশের আটক বাঙালীদের প্রথম ডিসমিস করে, পরে জেলে পোরে।

আর কে সে গুণরাজ খান আপনাকে ভ্যাচর ভ্যাচর করে আপ্ত বাক্য শুনিয়েছে যে, সে-পরীক্ষায় খেটোরা ত্রিং ত্রিং করে পয়লা দোসরা হবে আর অটোরা গুড়ি গুড়ি হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরে তৌবা-তিল্লা করবে ? আমি কথা দিচ্ছি, বিস্তর খেটো ভেটোতে না-মঞ্জুর হবেন আর এন্তের অটোর ফোটো তুলবে প্রেস ফোটোগ্রাফার।

এ বাবদে প্রকৃত সত্যটা এই বেলা শুনে নিন :—

"পরীক্ষার জন্যে সর্বোত্তম প্রস্তুত ক্যান্‌ডিডেটের কাছেও পরীক্ষা হিমালয় পর্বতবৎ। ইহসংসারে গাড়লস্য গাড়লও এমন সব প্রশ্ন শুধোতে পারে যার উত্তর পণ্ডিতস্য পণ্ডিতও দিতে পারেন না।"

Examinations are formidable even to the best prepared for the greatest FOOL may ask more than the wisest man can answer—CORLTON.

পরীক্ষা মাত্রই লটারী—বাংলা কথা।

নট গিলটি

সদ্য-সম্প্রতি কিয়জ্জনের কৃপাধন্য মশকুর এ অধমের ছোট্ট একটি রচনা কলকাতার অন্যতম সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। আমি স্ফীতমুণ্ড ন্যাজমোটা লেখক নই; তাই বিবেচনা করি সেদিন সে পত্রিকার চরম দুর্দিন ছিল। কথায় বলে, 'অভাবে স্বয়ং শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়।' রচনা-বাড়ন্তের সে কুগ্রহে প্রাগুক্ত পত্রিকার সম্পাদক প্রবাদটি স্মরণে এনে অধমের নাকিস লেখাটি প্রকাশার্থে প্রেস বাগে চিড়িয়াপারা উড়িয়ে দিলেন, অর্থাৎ দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়লেন।

কলকাতার নাগরিক সুলভ বিদগ্ধজন আমার লেখা বড় একটা পড়েন না। পণ্ডিতজন আদৌ না, অর্থাৎ উৎকট সংকটেও মাছি ধরে ধরে খান না। যে দু' একজন ভিন্ন গোয়ালে বাস করেন তেনারা দু-চার ছত্র পড়ে তাচ্ছিল্যি ভরে সুনিন্দিত রায় দেন "আস্ত একটা ভাঁড়"।

আমি শ্রীরাধার ন্যায় সে নিন্দা

"চন্দন মানিয়া অঙ্গেতে লেপিনু
চরম আনন্দ ভরে।"

কেন? সে কথা আরেক দিন হবে।

অপিচ, মহানগরীতে পাওনাদারদের তাড়ায় হেথায় পালিয়ে এসে শুনি, সে-খাকছার ধূলির ধূলি ভাঁড়ামিটা এতদ্দেশীয় অপর্যাপ্ত গুণিন্‌ তথা কবিকুল পড়েছেন এবং মর্মাহত হয়েছেন—তবে আমার যে আত্মজন এ-সন্দেশটি পরিবেশন করলেন তিনি তিল ব্যাজ না সয়ে তড়িঘড়ি যোগ দিলেন 'সে মর্মবেদনা উম্মাসহ নয়, অতিশয় সবিনয়।'

শোনা মাত্রই আমার মন-বন-উপবনের ভিতর দিয়ে যেন কোনো অভিসারিণী হাওয়া হাওয়ায় ভেসে গেল। আমার রক্তে তার নূপুরের রিনিরিনি যেন ঝিল্লির

ঝিনিঝিনি হয়ে বেজে উঠলো।

মুর্শীদের দিব্যি গিলে বলছি, আমি পীড়া-সন্তোষী নই। এই খানদানী ঢাকা শহরে আমার লেখা পড়ে যদি একটি মাত্র গুণিন্ ক্ষণতরে রত্তিভর পীড়া অনুভব করেন তবে তাই নিয়ে আমি উল্লাস অনুভব করবো, এমনতরো বিঘ্ন-সন্তোষী পিচেশ আমি নই। আমি উল্লাস বোধ করেছি দশরথের ন্যায়। 'পুত্র হবে রে, পুত্র সন্তান হবে আমার'—এই একটি বাক্য পুনঃ পুনঃ চিৎকার করতে করতে মুক্তকচ্ছ হয়ে সোল্লাসে তিনি নৃত্য জুড়ে দিয়েছিলেন। পুত্র-বিরহের শোকে যে তাঁর মৃত্যু হবে সে শাপটি তিনি তখন বেবাক ভুলে গিয়েছিলেন। আম্মো তাই 'ন্ৃত্য' জুড়েছি আর চিৎকার করে পাড়ার পাঁচজন রক-এর পাঁচো ইয়ারকে শোনাচ্ছি, "পড়ে হে পড়ে; এখনো লোকে আমার লেখা পড়ে।" সমুচা ভুলে গিয়েছি, আমার লেখা তাঁদের মর্মবেদনার কারণ হয়েছে।

কিন্তু হায় সব নেশারই একটা অবসান আছে। তারপর আসে খুন্মারের খোঁয়ারী। তখন মাথাটা করে তাজ্জিম মাজ্জিম; উডহাউসের নায়ক উস্টার দেখতে পেত সারি সারি গোলাপি হাতী তার বেডরুমের মধ্যিখান দিয়ে সবুজ শুঁড় নাচাতে নাচাতে পিল পিল করে জীভস্-এর প্যানট্রি বাগে এগোচ্ছে। আমারও ফাঁপানো, মোটা ন্যাজটা যখন ধীরে ধীরে চুপসে যেতে লাগল তখন খোঁয়ারির শিকার খৈয়ামের মত দহিল হৃদয়বন তীব্র ক্ষোভানলে। মনে মনে আন্দেসা করলুম, এ তো বড় আশ্চর্যি! ভাঁড় আমি। আমার ভাঁড়ামি পানসে হতে পারে কিন্তু বেদনা দেবে কোন তাগতে? তাহলে যে মারা যাবে তার "আব ও দানা",

দুইটি বস্তু প্রতি মানুষেরে
টানিতেছে জোর জোর।
দানা-পানি টানে একদিকে আর
আর দিকে টানে গোর॥

•

দো চীজ আদ মরা
কশদ জোর জোর
এক-ই আব-দানা
দিগর খাক-ই গোর॥

পূর্বেই নিবেদন করেছি, পাওনাদারদের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে কলকাতা ছেড়েছি। এখানেও আমার লেখা যদি গুণিনদের বিরাগভাজন হয় তবে সম্পাদক আমার লেখা ছাপবেন কোন দুঃখে, "আব ও দানার" কড়ি ঢালবেন কোন গরজে?

এবং অতি অবশ্যই হেথাকার পাওনাদার গুষ্টিও আমার হালটা চটসে মালুম করে নিয়ে লাগাবে হুনো। তখন হয় ভুট্টো সাহেবের মত চুপসে পলায়ন, নয় 'খাক-ই-গোরই' 'আব ও দানার' সঙ্গে টাগ-অব-উয়োরে জিতবেন। আমিও, 'বিনাপত্যে' সুড় সুড় করে সীতা দেবীর মত 'ধরণী গো মা, স্থান দাও কোলে' ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেই নিজের 'ইন্নালিল্লাহি'—যাক গে, বাকিটা থাক। কিন্তু একটা পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে আমি পুল-সিরাতের দিকে রওয়ানা হব—যে সব গুণিনকে আমি অজানতে পীড়া দিয়েছি তাঁরা আদল-ইনসাফসহ 'ফি নারি' পড়তে পারবেন।

কিন্তু সর্ব-সাকুল্যে যে দু-পাঁচটি উটকো পাঠক এই আষাঢ়ের সজল ছায়ায় মেঘে ভরা বৃষ্টি ঝরা ঝিল্লিমন্ত্রে মুখরিত সন্ধ্যায় আমার প্রতি অহেতুক সদয় হয়ে এ লেখাটি পড়ছেন তাঁরা হয়তো এতক্ষণ বেসবুর হয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন, 'এত্তা ধানাই-পানাই কি ঝামেলা নিয়ে সেইটে খুলেই কও না, মাইরি। মেঘে মেঘে যে বেলা হয়ে গেল।'

'তাই কইচি, গুরু, তাই কইচি। তোমরাই বিচার করো।'

গবিতা, অর্থাৎ মডার্ন কবিতা, গদ্য কবিতা যার নাম। গদ্য কবিতার বেশ-ভূষাতে চোখে পড়ে, এতে মিল নাই, অনেক ক্ষেত্রে ক্লাসিক কবিতা সুলভ ছন্দও থাকে না, ততোধিক ক্ষেত্রে ছত্রগুলোও একই দৈর্ঘ্যের নয়। বাইরের বেশভূষা অর্থাৎ বাহ্যরূপ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলে প্রথমেই মনের চোখে ধরা পড়ে, ক্লাসিক বা প্রাক গবিতাতে যে রকম প্রতি ছত্র এবং সম্পূর্ণ কবিতাটির সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা অর্থ পাওয়া যায় গবিতাতে তা নেই। এক একটা ছত্রের অর্থ হয়তো পরিষ্কার কিন্তু গোটা কবিতার মুল অর্থ, 'লাইট মোতীফ' যে কি সেটা অধিকাংশ স্থলে বিলকুল ধরা যায় না, হয়তো আদৌ নেই। গবিতা পড়ে সনাতন পন্থীরা সোজাসুজি বলেন, 'এর তো মানে বুঝতে পারলুম না আদৌ। এর তো মাথামুণ্ডু কিছুই নেই।' যদ্যপি আমি খাক-ই-গোরের প্রত্যন্ত প্রদেশে দণ্ডায়মান তথাপি আমি এ সম্প্রদায়ের সদস্য নই।

গবিতা কথাটা উভয় বাঙলায়ই চাউর হয়ে গিয়েছে। অবশ্য গবিতা যাঁরা রচনা করেন, পড়ে আনন্দ পান, প্রশংসা করেন তাঁরা এ-শব্দটা ব্যবহার করেন না। তাঁরা মনে করেন, শব্দটা তাচ্ছিল্যজাত ব্যঙ্গসূচক। কিন্তু ইতিহাসে এমন উদাহরণও আছে যেখানে পরদেশী দত্ত অবজ্ঞাসূচক নাম বা পদবী পরে ঐ দেশের লোক গ্রহণ করেছে। কবিগুরু রচিত ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে মাত্র তিনটি নিতান্তই অবর্জনীয় বিদেশী শব্দ আছে,—'মুসলমান ও খ্রীষ্টানী' এবং আরেকটি শব্দ পরে আসছে।

প্রথমটি আরবী দ্বিতীয়টি গ্রীক। কিন্তু এহ বাহ্য। আসল রগড় জাতীয় সঙ্গীতের 'হিন্দু' শব্দটি নিয়ে। চলন্তিকার মত অতি সংক্ষিপ্ত অভিধানও বলছেন, 'হিন্দু' শব্দটি ফার্সী। এ শব্দটি সংস্কৃতে নেই, যদিও আসলে 'সিন্ধু' থেকে এসেছে। ফারসীতে 'হিন্দ্' বলতে কালো বোঝায় এবং বিলক্ষণ তুচ্ছার্থে। অর্থাৎ ইরানীদের মতে ভারতীয়রা আর্যেতর, কারণ ব্যাটারা 'কেলে' 'কেলে'। কিন্তু এই হিন্দ্ এবং তৎনির্গত একাধিক শব্দ তৎসাময়িক আন্তর্জাতিক জগতে এমনই ছড়িয়ে পড়ল যে শেষটায় ভারতীয়েরাই নিজেদের 'হিন্দু' নামে পরিচয় দিতে আরম্ভ করলো। ওদিকে অবশ্য ফার্সীতে মূল তুচ্ছার্থটা লোপ পেল। কিন্তু অতদূরে যাই কেন? মরহুম মুহম্মদ আলী ভাই ঝিঁড়া ভাইয়ের 'ঝিঁড়া' শব্দের গুজরাতিতে অর্থ 'ক্ষুদে' (যেমন ক্রিকেটার বিনু মাঁকড়ের মাঁকড় শব্দের অর্থ পিঁপড়ে) এবং কিঞ্চিৎ তুচ্ছার্থে। ঝিঁড়া নাম দেবার উদ্দেশ্য সরল। এত ক্ষুদে ঝিঁড়া, যে মৃত্যুদূত তাকে দেখতেই পাবে না। আমাদের ক্ষুদিরাম, নফর চট্টো, এককড়ি, তিনকড়ি এসব একই ঝোপের চিড়িয়া। আকছারই কিন্তু এককড়ে, ক্ষুদে বা কেষ্টা কেউই নামটা তুচ্ছার্থে না অন্যার্থে সে নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু ঝিঁড়াভাই যখন মুসলিম লীগের সর্বাধিকারী হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন আরবী-ফার্সীর বিস্তর কদরদানরা বড্ডই সংকোচ অনুভব করলেন। ঝিঁড়াকে তখন 'জিন্নাহ্'এ রূপান্তরিত করেন। অর্থাৎ পাড়ার মেধো ও-পাড়ার মধু না হয়ে স্বপাড়াতেই মধুসূদন হয়ে গেলেন। পাছে লোক 'জিন্নাহ' শব্দটির গাঁইয়া মূলরূপটি ধরে ফেলে তাই জিন্নাহ শব্দের 'হ-টি' হে 'হুত্তি' দিয়ে লেখা হল দো-চশমী সাদামাটা 'হে' দিয়ে নয়। কারণ প্রথম 'হে'-টি শুধু মাত্র একদম খাঁটি ন' সিকে আরবী শব্দেই ব্যবহার করা হয়। ঐ একই সময় লীগের আরেক মহাজন আবদুর রহমান সিন্ধী রাতারাতি হয়ে গেলেন আবদুর রহমান ছিদ্দিকী!……তা সে যাক গে— এইসি গতি সংসারমে। প্রভু খৃষ্টের প্রধান শাকরেদ (সেণ্ট) পীটার গ্রীক নামের অর্থ পাথর—প্রাণহীন (ইংরিজি 'পেট্রিফাইড' শব্দ তুলনীয়)। তাঁর প্রাণ হরণ করবে কোন শয়তানের যুবরাজ বিয়েলজবাব্ বা তার খাস প্যারা ডিয়াবলস (ডেভিল)। অথচ পীটারকে পাষাণ হৃদয় বা সনগদিল রূপে ভাবলে নিশ্চয়ই সেটা সম্মানসূচক নয়। ইনজিল গ্রন্থে আছে, প্রভু ঈসা মসীহ পীটারকে বলেছিলেন, 'তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী (গির্জা) গাঁথিব।' এরপর কোন খৃস্ট-ভক্ত পীটার নামকে হেনস্তা করবে? প্রস্তর, পীটারকে ফরাসীতে বলে পীয়ের এবং ঐ দেশে সে নামটি যে কতখানি জনপ্রিয় সবাই জানেন। রোমা রোঁলা তাঁর সবচেয়ে রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী 'পিয়ের

এ ল্যুস'এর নায়কের নাম বেছে নিয়েছেন পিয়ের—যে নাম আমাদের ফিরোজ বা কেষ্টার ন্যায় প্রতি গ্রামে বর্ষায় ব্যাঙাচির মত কিলবিল করে।……আর সেক্সপীয়র, খাতিম উল ইসম রূপে বলেই গিয়েছেন,

'নামে কি করে ?
গোলাপে যে নামে ডাকো,
গন্ধ বিতরে।'

(হেম বন্দ্যোর অনুবাদ)

আমার অপরাধ ফৌজদারী আইনে নয়, আলংকারিক বা নন্দন শাস্ত্রী-রূপে কবিগুরুর ভাষায় 'সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারায় অপরাধের কোঠায়' পড়া উচিত—অবশ্য সমসাময়িক কতিপয় মডার্ণ কবিই এ স্থলে ফরিয়াদি, কবিগুরু নন, আমি নামকরণে গুবলেট করে ফেলেছি। 'পদ্মলোচন' নাম যার প্রাপ্য তাকে দিয়ে বসেছি 'ভেটকি-লোচন', 'চন্দ্র-বদন'কে দিয়েছি 'বদনা-বদন', 'রতি-গঠনকে' বলেছি 'গাড়ু-গঠন'।

আমার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ আমি গবিতা রচকদের 'গবি' বলে উল্লেখ করেছি।

সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, আমি 'প্রবীণ' 'বহু জনমান্য মুরব্বি' লেখক। কোনো চ্যাংড়া লেখক এ হেন বাক্য বললে তাঁরা গায়ে মাখতেন না। মুরব্বিজনের সামান্যতম পদস্খলন স্বচ্ছ নীরে একটি মাত্র কৃষ্ণ কুন্তলের মত চোখে পড়ে, পক্ষান্তরে চ্যাংড়া চিংড়ির আবিল জলে বিরাট প্রস্তর খণ্ড হর-হামেশা ঘাপটি মেরে আত্মগোপন করে থাকে।

অতএব আমাকে এখন সাফসফা বলতে হবে আমি দোষী না নির্দোষ।

ধর্মাবতার পাঠকগণ !

ইতিপূর্বে একাধিক পাঠক পাকী ওজনে, নসিকে কর্কশ কণ্ঠে আমাকে "গণ্ডমূর্খ' খেতাব দিয়ে আমাকে পাঠক-পঞ্চায়েতের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সেটা অপ্রমাণ করার জন্য হুলিয়া শমন জারী করেছেন, এ-পার গঙ্গায় আমার স্বধর্মীজন আমার বিরুদ্ধে কাফের ফতোয়া ঝেড়েছেন (তেনাদের প্রাণঘাতী ফতোয়ার চেয়ে তেনাদের বিজাংগা বিটকেল বাংলা রচনা আমাকে ঘায়েল করেছে ঢের ঢের বেশী); ওনাদের অত্যুৎসাহী জনৈক ফকীহ প্রবর ঐ মর্মে প্যামফলেট ছাপিয়ে মেলাতে ফেরি করে বিলক্ষণ টু'পাইস কামিয়েছেন; ওপার গঙ্গায় আমাকে হিন্দু-ধর্মবিদ্বেষী, সনাতন ধর্মের অপমানকারী প্রতিপন্নার্থে দৈনিকে কঠোর মন্তব্য করেছেন জনৈক উত্তেজিত লেখক। এর কঠোরতর উত্তর অবশ্য দিয়েছেন কলকাতাবাসী পাবনার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের এক ব্যঙ্গ নিপুণ পণ্ডিত; পক্ষান্তরে

আমি মুসলমানের কলঙ্ক এর প্রতিবাদ পূব বাংলার কেউ করেননি, না করে ভালোই করেছেন ; আমি বঙ্গভাষা জননীকে প্যাজ রসুন (আরবী-ফার্সী যাবনিক শব্দ এস্তেমাল করে) খাইয়ে মা-জননীকে ধর্মচ্যুতা করবার পাপ-প্রচেষ্টায় অষ্টাহ সচেষ্ট কেষ্ট-বিষ্ণুবৎ-ইত্যাকার অভিযোগ ঝাড়া সিকি শতাব্দী ধরে আমার বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে। যে সব অভিযোগ ওপার বাঙলার কোনো সম্পাদকই ছাপাতে রাজী হননি সেগুলো ব্যক্তিগত পত্ররূপে সরাসরি ডাক-মারফত, মমালয়ে হানা দিয়ে চিটিক্কার দিয়েছে, আমি পাকিস্তান দরদী ইয়াহিয়া ভুট্টোর স্পাই। পক্ষান্তরে এপার বাংলায় আমি হিন্দু মহাসভার স্পাই এ-অভিযোগ কখনো শুনিনি। কিন্তু এদের তুলনায় আমার প্রতি অহেতুক মেহেরবান পাঠক বেশুমার, বিস্তরে বিস্তর। এঁদেরই নীরব দোওয়ার বরকতে এ-অধম চাঁদপানা চেহারা করে মুখ বুজে সুখ-নিদ্রায় দিব্য কালযাপন করেছে, ভান উইন-কলকে হার মানিয়ে সিকি শতাব্দী ধরে। সর্বপ্রকারের সাফাই মাথায় থাকুন, কোনো প্রকারে তর্কাতর্কিতেও নামেনি।

কিন্তু আমি উভয় বঙ্গের নিরীহতম পাঠকের ও মর্মদাহের নিমিত্ত হতে পারি —সম্মানিত মডার্ন কবিদের তো কথাই ওঠে না—আমার বিরুদ্ধে এহেন বেদরদ, বেইনসাফ অকরুণ ফরিয়াদ কস্মিনকালেও ক্ষীণতম কণ্ঠেও মর্মরিত হয়নি। নগণ্যতম পত্রিকার ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অক্ষরেও ছাপা হয়নি।

আমি মর্মবেদনায় অভিভূত, মোহ্যমান।

কারণ কাজী কবি কর্তৃক অনূদিত ওমর খৈয়াম রচিত রুবাইয়াতের ভূমিকা লেখবার জন্য কবির আত্মজন তথা প্রকাশক পরিবেশক আমাকে যখন অনুরোধ করে আমার অকিঞ্চন জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেন তখন নতমস্তকে সে-অবতরণিকার সর্বশেষে সে যে-রুবাঈটি সর্বান্তঃকরণে সসম্মানে তুলে ধরে সেটি সংসারের যাত্রাপথে তার প্রিয় সহচর :—

কারুর প্রাণে দুখ দিও না,
করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনে শান্তি নাশি
বাড়িও না তার মনস্তাপ।

অতএব, ধর্মাবতারগণ, পুনরায় সম্বিতস্থ হয়ে আমি আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে কিয়দ্দিনের মহলাৎ কামনা করে মোকদ্দমা মুলতুবি রাখার হুকুম ভিক্ষা করি।

মুচলিকাবদ্ধ হচ্ছি, 'গুণরাজ খান' নিক্সনের মত হালফিল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করত, নানাবিধ কৌটিল্যসুলভ সুচতুর মুষ্টিযোগ (ডিপ্লোমেটিক কু) প্রসাদাৎ মোকদ্দমাটা প্রলম্বিত করে করে জনগণের দিলচস্পী একদিন যখন ঔদাসীন্যে

পরিণত হবে তখন তারই ফায়দা উঠিয়ে চুপসে বেমালুম কেটে পড়ার মত এলেম আমার পিতৃপিতামহের উদরে 'কস্মিনশ্চিত' সত্যযুগস্য শুভলগ্নেও ছিল না, বর্তমান বা ভবিষ্যে আমার পেটে এটম বোমা মারলেও বেরুবে না।

বিচিত্রা পত্রিকা ঢাকা

অবনীন্দ্রনাথ

উনবিংশ শতকের বাঙালী অন্ততঃ এই সত্য জানিত যে সংস্কৃত-সাহিত্য শ্লাঘার বস্তু। সেই যুগে ভারতীয়ের আত্মমর্যাদাকে ইংরেজ নানা প্রকারে ক্ষুণ্ণ করা সত্ত্বেও পৃথিবী তখন স্বীকার করিয়া নিয়াছে যে সংস্কৃত সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য—যে গ্রীক সাহিত্য লইয়া ইউরোপ এত গর্ব করে, তাহার সঙ্গে সংস্কৃত অনায়াসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে এবং লাতিন অপেক্ষা সে বহুলাংশে বিত্তবান।

বাঙ্গালার অনুপ্রেরণা সংস্কৃত হইতে আসে; সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাঙালীর অল্পবিস্তর আশ্বাস ছিল। তদুপরি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত মধুসূদন যখন সর্বভাষা বর্জন করিয়া বঙ্গভাষার সার্থক রস সৃষ্টি করিলেন, তখন বাঙালীর আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হইল।

কিন্তু অন্যান্য কলাসৃষ্টিতে বাঙালী তথা ভারতীয়ের কণামাত্র উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল না। বাঙালী যে চিত্রে কিম্বা ভাস্কর্যে নিজস্ব কোনো প্রকারের রসনাভূতি প্রকাশ করিতে পারিবে কিম্বা বিশ্বের সম্মুখে নিজস্ব চারুকলা উপস্থিত করিয়া বিশ্বজনের প্রশস্তি অর্জন করিতে পারিবে এই বিশ্বাস যে বাঙালীর ছিল না তাহাই নহে, সামান্য যাহা বাঙালীর নিজস্ব কলাশিল্পরূপে তখনও বিদ্যমান ছিল বাঙালী তাহার সম্মুখে লজ্জায় অধোবদন হইত। কালীঘাটের পটকে সম্মান দেওয়া দূরে থাকুক বাঙালী তখন তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অচেতন।

তাই অবনীন্দ্রনাথের সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত হই। আজ অজন্তা আর্ট, মোগল চিত্রশিল্প বিশ্বরসিকের কাছে সুপরিচিত। আজ চিত্রকলার প্রামাণিক ইতিহাস পুস্তক পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই প্রকাশিত হউক না কেন তাহাতে অজন্তা মোগল চিত্রের উল্লেখ না থাকিলে সে পুস্তক অসম্পূর্ণ বলিয়া গণ্য হয়, গ্রন্থকারের সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ রসবোধ নিন্দিত হয়। কিন্তু যে যুগে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যাগত কলাশিল্পে অনুপ্রাণিত হইয়া রসসৃষ্টির নব নব অভিযানে বহির্গত হইলেন। সে যুগেও অজন্তা বঙ্গদেশে ন্যায্য সম্মান পায় নাই। আজ অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রই স্মরণ করিতে পারিবেন, অজন্তা চিত্র প্রকাশ করার জন্য 'প্রবাসী' পত্রিকাকে কতখানি হাস্যাস্পদ হইতে হইয়াছিল।

সেই বিড়ম্বিত অজন্তা সেই লাঞ্ছিত মোগল চিত্রের আদর্শ সম্মুখে লইয়া চিত্র অঙ্কন করিবার মত দুঃসাহস অসাধারণ পুরুষেই সম্ভব।

জানি, অবনীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কন না করিলেও অজন্তা মোগল একদিন তাহাদের ন্যায্য সম্মান পাইত, কিন্তু একথা আরও নিশ্চয়রূপে জানি, অবনীন্দ্রনাথ না থাকিলে অজন্তা মোগল নবজীবন লাভ করিয়া আমাদের শতশত শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করিতে পারিত না। নবভগীরথ অবনীন্দ্রনাথ কলাক্ষেত্রে যে জাহ্নবী অবতরণ করাইলেন তাহার "সোনার ধান" বঙ্গদেশের ভাণ্ডার সম্পূর্ণ করিয়া এখন সমস্ত ভারতবর্ষের অন্নদান আনন্দদান করিতেছে।

আজ যে ভারতবর্ষের সুদূরতম প্রান্তে ভারতীয় শিল্পী চিত্রাঙ্কন করিবার 'ভাষা' পাইয়াছে, তাহার পশ্চাতে অবনীন্দ্রনাথের কি অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অবিচল নিষ্ঠা ছিল সেকথা কয়জন শিল্পী কয়জন শিল্পীরসিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, কিম্বা সশ্রদ্ধ স্মরণ করে?

অবনীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন করেন এবং পরবর্তী যুগে নিজস্ব শৈলীতে রসবিকাশ করিয়া স্বদেশে বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন একথা সকলেই জানেন, কিন্তু নিজস্ব শৈলী নির্মাণের জন্য তিনি যে চীন জাপান প্রত্যেক প্রাচ্য দেশের শিল্পে বৎসরের পর বৎসর গভীর সাধনা করিয়াছিলেন তাহার সন্ধান তাহার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেন আজ কয়জন শিল্পী-ঐতিহাসিক?

জাপানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী টাইকান ভারতবর্ষে আসেন প্রথম যৌবনে— অবনীন্দ্রনাথও তখন যুবক। এক দিকে টাইকান যেরকম অবনীন্দ্রনাথের সাহচর্যে ভারতবর্ষে সর্ব চারুকলাবিকাশ প্রচেষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া আপন শৈলী সর্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে সমর্থ হন ঠিক সেই রকম অবনীন্দ্রনাথও জাপানী শৈলী হইতে এমন সব কলাকৌশল আয়ত্ত করেন যাহার প্রসাদে তাঁহার অঙ্কন-পদ্ধতি বহু রসের সংমিশ্রণে অপূর্ব সামঞ্জস্য ধারণ করে। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান কৃতিত্ব ছিল এই-খানে। যে কোনো কলা নিদর্শন, দেখা মাত্রই তিনি তাহার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিতেন এবং সেই নিদর্শন হইতে কোন্ বস্তুটি তাঁহার শৈলীতে সম্পূর্ণ এক হইয়া তাহাকে সমৃদ্ধিশালী করিবে সে রসবোধ ছিল তাঁহার অসাধারণ। তাই যখন অবনীন্দ্রনাথের চিত্র বিশ্লেষণ করি তখন আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না যে এই সঙ্কীর্ণ মানবজীবনে একজন মানুষ কি করিয়া এতখানি কলাকৌশল আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইল।

তাই বোধ হয় অবনীন্দ্রনাথের কৃতী শিষ্যগণ এত ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন করিয়া বঙ্গদেশের কলাজগৎকে এতখানি চিত্রবিচিত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

যে গুরু বহুবিধ সাধনা করিয়া সত্যরস পাইয়াছেন, একমাত্র তিনিই প্রত্যেক শিষ্যের আপন বৈশিষ্ট্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাকে সেই পন্থাতেই কত নব নব অভিজ্ঞতা কত নব নব বিকাশ আছে তাহার সন্ধান দিতে পারেন। সার্থক চিত্রকার এই জগতে অনেক আছেন, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের মত সার্থক গুরু এই সংসারের সর্বত্রই সর্বযুগেই বিরল। আজ ভারতবর্ষে এমন প্রদেশ নাই যেখানে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য বিরল ; কারণ অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য নন্দলালের কাছে যাঁহারা কলাশিল্প আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের গর্বের অন্ত নাই যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁহাদের গুরুর গুরু।

স্পর্শমণির স্পর্শ লাভ করিয়া মৃত্তিকা স্বর্ণ হয়, কিন্তু সেই স্বর্ণ তো স্পর্শমণির মত অন্য মৃত্তিকাকে স্বর্ণরূপ দিতে পারে না। অথচ যে প্রদীপ অন্য প্রদীপ হইতে একবার অগ্নিশিখা আহরণ করিয়া প্রদীপ্ত হইয়াছে সে পৃথিবীর সর্বপ্রদীপকে প্রজ্বলিত করিতে পারে। সাধনাতে সিদ্ধিলাভ সংসারের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্তিকার স্বর্ণরূপ প্রাপ্তির ন্যায়। তিনি কিন্তু তাঁহার সাধনার ধন অন্যকে দিতে পারেন না। অবনীন্দ্রনাথের সাধনা দীপ্ত সাধনা। তিনি আপন জীবনে যে রসের সন্ধান পাইয়া নিজেকে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, সেই অগ্নিশিখা দিয়া বহু শিষ্য আপন আপন অণুদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছেন। আজ তাই বঙ্গদেশে তথা তাবৎ ভারতবর্ষে চারুকলার যে অনির্বাণ দীপান্বিতা প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহার প্রথম প্রদীপ অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা-বিশ্লেষণ অল্পকার কর্ম নয়। তাঁহার রসবোধ, তাঁহার চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি আধুনিক ভারতীয় চারুকলাকে কতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছে সে আলোচনা করিবার দিন এখনও আসে নাই। কারণ তাঁহার অনুপ্রেরণা আরো বহু বৎসর ধরিয়া ভারতীয় চিত্রকলাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করিবে—তাঁহার আসন গ্রহণ করিতে পারে, এমন কোনো পুরুষকে এখনও দিকচক্রবালে দেখিতে পাইতেছি না।

কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে এক অদ্ভুত আস্বচ্ছ রূপ আছে—এ রূপ পৃথিবীর অন্য কোনো চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই অবর্ণনীয় রূপ তিনি সঙ্গীত হইতে গ্রহণ করিয়া চিত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। সকলেই জানেন অবনীন্দ্রনাথ বহু বৎসর ধরিয়া সঙ্গীত সাধনা করেন। সঙ্গীত ধ্বনি দৃষ্টিবহির্ভূত ; তিনি ধ্বনিকে রূপায়িত করিয়াছেন—তাই তাঁহার চিত্রের এই আস্বচ্ছ শৈলী।

অদ্যকার দিবসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করি :—

"যখন আমি ভাবি বাঙ্গলায় শ্রদ্ধালাভের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি কে তখন প্রথমই আমার যে নামটির কথা মনে আসে, তাহা হইতেছে অবনীন্দ্রনাথের। দেশকে তিনি আত্মগ্লানির পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। অপমানের পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিয়া দেশকে তিনি উহার ন্যায্য সম্মানজনক স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শিল্পচেতনার পুনরুন্মেষণার মধ্য দিয়া ভারতে এক নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছে এবং তাঁহার নিকট হইতে সমগ্র ভারত নূতন করিয়া তাহার পাঠ গ্রহণ করিয়াছে। এইভাবে তাঁহার সাফল্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গলা গৌরবময় আসন লাভ করিয়াছে।"

ভরত-নাট্যম

শ্রীমতী যোগম ও মঙ্গলমের ভরত রীতিতে নৃত্য দেখিয়া আমরা বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। বিশুদ্ধ নৃত্যরস ও আঙ্গিকের দিক দিয়া ইহার পূর্ণ বিশ্লেষণ গুণীরা করিবেন। আমরা অন্যান্য নানা আনন্দের সঙ্গে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছি রসের ভিতর দিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কৃষ্টিগত সাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া॥

উত্তর ভারতে বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশে আমরা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করি শৃঙ্গার রসের দ্বারা। আমাদের পদাবলীতে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তের প্রেম শ্রীরাধার বিরহের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। এ রস উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে কিন্তু বিষ্ণু-নারায়ণের রাম অবতার সেখানে তুলসীদাস প্রধানতঃ ভক্তিরসের দ্বারা জনগণের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যুবক-যুবতীর প্রেমবেদনা শ্রীরাধার কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশের পদকীর্তনে ও রাজপুতনার মীরাবাঈয়ের ভজনে।

কিন্তু পদাবলীতে কি শুধু শৃঙ্গার? শৃঙ্গার প্রধান রস বটে কিন্তু তাহার সঙ্গে কী সূক্ষ্ম ভক্তিই না মিশ্রিত আছে!

তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি।

তোমার 'পরাণে' আমার 'পরাণে' নয়, তোমার 'চরণে' আমার 'পরাণে'। কিন্তু চরণে ও পরাণে বাঁধা হয় ভক্তি ও স্নেহবন্ধন অথচ কবি বলিলেন—প্রেমের ফাঁসি। ভক্তির সঙ্গে প্রেম, না প্রেমের সঙ্গে ভক্তি, কি বলিব?

এই প্রেমে সূক্ষ্ম ভক্তি মিশ্রিত আছে বলিয়াই তাহার প্রকাশ করিতে পারেন বিদগ্ধ কীর্তনিয়ারা। রাধার বিরহ গাহিতে গাহিতে যখন তাঁহাদের চক্ষু নিবিড় বেদনায় প্লাবিত হয় তখন সে বেদনার কতটুকু গায়কের নিজের যৌবনের প্রিয়া-বিরহের স্মরণে আর কতটুকু বার্ধক্যের তীব্র অনুভূতি—শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ অস্তিত্বের পরম সত্তা শ্রীভগবানকে জীবনে উপলব্ধি করিতে না পাওয়ায়! জীবনের বহু দহনে দগ্ধ হইয়া যে বৈদগ্ধ্য পরিপূর্ণতা লাভ করে তাহার অভাব হইলে শৃঙ্গার হইতে ভক্তি লোপ পাইয়া যে রস থাকে তাহা অনেক সময় সম্পূর্ণ পার্থিব হইয়া বিকৃতরূপ ধারণ করে।

শ্রীমতীদ্বয়ের গৌর (কৃষ্ণ) চন্দ্রিকায় এই ভক্তি ও প্রেমের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিলাম। মনে হইল 'চরণ' ও 'পরাণে'র ফাঁসিতে যে ব্যঞ্জনা তাহা কাব্যের গুঞ্জরন কুঞ্জবন ত্যাগ করিয়া শ্রীমতীদের অঙ্গে সঞ্জীবিত হইল—চিন্ময়ী মৃন্ময়ী রূপ ধারণ করিল। কাব্যে ভক্তি ও শৃঙ্গারের মিলন অপেক্ষাকৃত কঠিন, নৃত্যাভিনয়ে অপেক্ষাকৃত সরল। চোখে মুখে বিরহের বেদনা অথচ করদ্বয় ভক্তিনমস্কারে যুক্ত। দুই রসের অবর্ণনীয় সম্মেলন। অভিনয়ে এই সম্মেলন অপেক্ষাকৃত সরল বলিয়াই মনে হয় শ্রীমতীরা অল্প বয়সেই তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

নটরাজের বাঙলা কাব্যে প্রবেশ অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথের শঙ্খ ঘোষণায়। নটরাজ 'দুঃসাহসী যৌবনকে উদ্ধার' করেন; কবি যখন নৃত্য আরম্ভ করেন তখন তাঁহার 'পদে পদে' যেন নটরাজের 'চঞ্চল চরণ ভঙ্গী' পড়ে এই প্রার্থনা করেন; কবি দেখেন নটরাজের নৃত্য 'বিদ্রোহী পরমাণুকে সুন্দর' করিয়া তোলে। শ্রীমতীদ্বয়ের নৃত্যে এই রস রূপ গ্রহণ করিয়া নবীন রসের সৃষ্টি করিল আর নবীন ব্যঞ্জনা পাইলাম নটরাজকে রসস্বরূপে আরাধনা করিবার। "হে চিদম্বরমের প্রভু, ত্রিলোক ও কামের ধ্বংসকর্তা নটরাজ, তুমি কি আমার দ্বারপ্রান্তে একবার ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইবে না, আমাকে আহ্বান করিবে না।"

নৃত্যের সঙ্গে দ্রাবিড় গীতের সঙ্গত শুনিয়া আমাদের মনে পড়িল 'ওগো মা রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ পথে।' সে তো চাহিবে না, তাহার রথের চাকা আমার দরজায় দাঁড়াইবে না, তবু চিদম্বরমের পরম প্রভুকে ক্ষণেক দাঁড়াইবার জন্য মানুষের কী আকুল ব্যাকুল ক্রন্দন নিবেদন। শ্রীমতীদ্বয়ের নৃত্যে কৃষ্ণ নটরাজের প্রতি ভক্তি শৃঙ্গার রসের অভিব্যক্তিই যে সর্বোৎকৃষ্ট ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অপেক্ষাকৃত তরুণরা হয়ত ইহাদের নৃত্যে তালবোল সম্বলিত জটিল আঙ্গিকে শুদ্ধ রস পাইয়াছেন; আমরা বাল্যকাল হইতে কীর্তন রসে আপ্লুত বলিয়া

এই রসই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছি। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করিলাম যে, উত্তর দক্ষিণের দেবদেবী যে একই তাহা নহে—সে তো সকলেই জানেন—অধিকন্তু আমাদের রসপূজার সঙ্গে তাঁহাদের রসপূজার স্থূল সূক্ষ্ম উভয় প্রকারের যোগ আছে। আমাদের পূজাকে পূর্ণাবয়ব করিবার জন্য দক্ষিণের ভরত নৃত্য উত্তরে প্রচারিত হউক।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১২. ৮. ১৯৪৯

নর্তকী

মাদ্রাজ শহরের দক্ষিণতম প্রান্তে সমুদ্রের গা ঘেঁষে বাড়িটি। চওড়া বারান্দা—আর সে এতই চওড়া যে স্পষ্ট বোঝা যায়, এ বাড়ির ঘরগুলো বারান্দা বানানোর উপলক্ষ্য মাত্র। বারান্দাটাই মুখ্য, ঘরগুলো না থাকলে চলে না বলেই নিতান্ত এক পাশে কোণ ঠেসে পড়ে আছে।

বারান্দাতেই জীবন-যাত্রা। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন ছাড়া অন্য কোনো সময়েই ঘরের ভিতরে যাবার প্রয়োজন হয় না—মাদ্রাজ উপকূলের তির্যকতম বর্ষায়ও না। খাটটা একটুখানি ঠেলে নিয়ে নিম নারকোল কালোজাম গোলমোহরের দাপা-দাপির এক পাশে দিব্য আরামে ঘুমনো যায়।

সমুদ্রের গর্জন অষ্টপ্রহর লেগে আছে বলে সবাই কথাবার্তা কয় গলা বেশ চড়িয়ে। কোন দিন যদি হঠাৎ একটুখানি গর্জন কমে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করি সবাই কি রকম খামখা চেঁচিয়ে কথাবার্তা বলছি। আমার বন্ধু গৃহস্বামী কনকপ্রসাদ রাও হোটেল রেস্তোরাঁয় কাউকে চেঁচিয়ে কথা বলতে শুনলেই আমাকে কানে কানে বলতেন, 'লোকটার জন্ম হয়েছে নিশ্চয়ই সমুদ্র-পারে। তার সপ্তকের মধ্যমে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে—কিছুতেই নামতে পারিছে না।'

কনকপ্রসাদের সেই ফিসফিসও রেস্তোরাঁর আর সবাই স্পষ্ট শুনতে পেত। তিনি ছেলেবেলাটা কাটিয়েছেন ওয়ালটেয়ারের সমুদ্র-পারে।

কনকপ্রসাদ ডাক্তার, আর আমি রোগী। মাদ্রাজ উপকূলে গিয়েছি ভাঙা স্বাস্থ্য জোড়া লাগাবার আশায়। কনকপ্রসাদের হুকুম মাফিক পাকা একটি ঘণ্টা সমুদ্র-পারে শুধু পায়ে পাইচারি করত হয়, চারটে কাঁচা আণ্ডা গিলতে হয়, গোনাগুনতি এক ডজন কমলানেবু খেতে হয়, আরো কত কি এটা-ওটা-সেটা তার হিসেব জানেন কনকপ্রসাদের বউ! গিন্নী আমাকে এ-সব গেলান ভটচায বামুনের বউ যে রকম বাড়িসুদ্ধ সবাইকে শাস্ত্রের বিধান গেলায় ভটচাযের চেয়েও

বেশী—কারণ ঠাকুর বরঞ্চ জানেন 'মাকড় মারলে ধোকড় হয়', কিন্তু ব্রাহ্মণীর কাছে নিপাতন বলে কোনো জিনিস নেই। ডাক্তার জানে, দু'টো নেবু এক দিন কম খেলে আমি কিছু শয্যাশায়ী হব না; ভটচাযও জানেন, সরস্বতী পূজার দিনে বই ছুঁলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না, কিন্তু ডাক্তারের বউ ভটচায-গিন্নী ও-সব বোঝেন না। আমাকে বারোটা কমলানেবু খেতে হত তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়ার মত, রিচুয়াল হিসেবে।

ঘড়ি ধরে সূর্যাস্তের ঠিক কুড়ি মিনিট আগে হুকুম হত সমুদ্র-পারে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরোবার। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি তদারক করতেন,—আমি পিচ-ঢালা কালো রাস্তার ফালি ওপার হয়ে, সবুজ মাঠের ফালি পেরিয়ে গিয়ে, সোনালী বালুতে ধাক্কা খেতে-খেতে সমুদ্র-পারে পৌঁছে মাকুটার মত উত্তর-দক্ষিণ করছি কিনা।

করতুম। 'পড়েছি যবনের হাতে'-র যবনকে যখন আর কারো হাতে পড়ে খানা খেতে হয়, তখন আর বুঝিয়ে বলতে হবে না, অখণ্ড-সৌভাগ্যবতী কনক-প্রসাদ-গৃহিণী কি ধরনের মানুষ ছিলেন।

পাইচারি করতুম আর হিংসেয় আমার বুক ফেটে টুকরো টুকরো হত একটি তামিল ব্রাহ্মণকে সমুদ্রপারে একটা জেলে নৌকার গা ঘেঁষে আরামসে বসে থাকতে দেখে। মাদ্রাজ শহরের শেষ-প্রান্ত বলে এখানে কেউ বড় একটা বেড়াতে আসে না—তাই মাসের আঠাশ দিন এই তামিল ব্রাহ্মণ আর আমাতে মিলে এ রাজত্বে পুরুষ-প্রকৃতির মত সৃষ্টি চালাতুম। ব্রাহ্মণটিই পুরুষ, কারণ তিনি নির্বিকার, নিশ্চল, নিশ্চুপ হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর আমি প্রকৃতি—শাটল কর্কের মত কখনো হেথায়, কখনো হোথায় গুত্তা খেয়েই যাচ্ছি, একটানা দশ মিনিটের বেশি জিরোবার হুকুম নেই। সেশ্বর সাংখ্যে প্রকৃতি-পুরুষের উপরেও আছেন আরেক জন। তিনি ডাক্তারের বউ।

ব্রাহ্মণের সামনেই আমি মাকু চালাতুম। কখনো কখনো ঘাড় বাঁকিয়ে দেখেছি, তিনি আমার দিকে এক বারের তরেও তাকান কি না। উহুঁ। তাঁর দৃষ্টি সমুদ্র পেরিয়ে সোজা দিগ্বলয়ের দিকে। হয়ত তিনি কোনো মারাত্মক রকমের সাধনা নিয়ে পড়ে আছেন,—শুনেছি, কোনো কোনো বিশেষ সাধনা যেমন গুহা-গহ্বরে করতে হয়, কোনোটা নাকি তেমনি করতে হয় সিন্ধু-পুলিনে, নির্জনে, গুরুগম্ভীর গর্জনের মাঝখানে। সাধকরা বলেছেন, লোকালয়ে বহু শব্দ, অরণ্যেও পশু-পক্ষীর অহেতুক কলরব; সমুদ্রের গর্জন আর সব ধ্বনি ডুবিয়ে দেয় বলে ঐ গম্ভীর মন্ত্রের দিকে মনোনিবেশ করে চিত্তবৃত্তি নিরোধের পয়লা ধাপ অতি অনায়াসে পার হওয়া যায়।

তা হয়ত যায়, ব্রাহ্মণ হয়ত হয়েছেন। আমার তাতে কোনো হিংসে নেই—হিংসে হয় শুধু দেখে, ভদ্রলোক কি রকম আয়েসে গা ডুবিয়ে দিয়ে সিন্ধুর গর্জন-গান শোনে, আকাশে রঙের নাচ দেখে, ইস-পার উস-পার জুড়ে যে চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি লাগে তারই দিকে আপন-ভোলা হয়ে তাকিয়ে থাকে।

লোকটি সুপুরুষ। শ্লেটার সায়েব দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন, মানুষ নাকি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিল, তাকে যেন প্রলোভনে ফেলা না হয়, আর তার-ই উত্তরে নাকি ভগবান তামিল রমণী সৃষ্টি করেছেন। দোহাই ধর্মের, এ মত আমার নয়, শ্লেটার সায়েবের, কারণ আমি তো বুঝে উঠতে পারিনে তামিল রমণী যদি সৌন্দর্যহীনাই হবে তবে এ রকম সুপুরুষ ব্রাহ্মণ জন্ম নিল কার গর্ভে ?

কী অপূর্ব কাঁচা সোনার রঙ। সমুদ্রের নীল জলে ধোওয়া সোনালি বালু যে রকম ঝলমল করে ওঠে, ঠিক তেমনি ভদ্রলোকের রঙ। নীল আকাশ আর নীল সমুদ্রের পাশে তাঁর মুখ, হাত-পা যে রকম আপন তেজে অপ্রকাশ হয়ে থাকতো, তা তাঁকে সমুদ্র-পারে না বসিয়ে দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হবে না। খুব কাছে গিয়ে দেখিনি তবু দূর থেকেই লক্ষ্য করেছি তাঁর শান্ত চোখ, ছোট একটুখানি মুখ, চওড়া কপাল আর গোল করে কামানো মাথার মাঝখানে এক ঝুঁটি মিশ-কালো চকচকে চুল। তামিল ব্রাহ্মণদের এ-রকম ঝুঁটিবাঁধা চুল দেখলেই আমার মনে প্রশ্ন জাগে, মানুষ ইচ্ছে করে নিজেকে এরকম কুরূপ কুৎসিত করে তোলে কেন ? কিন্তু এঁর চুল দেখে এই প্রথম বুঝতে পারলুম, তামিল নটবর কোনো শিব গড়তে গিয়ে কোন্ বাঁদর মাথায় তুলে নিয়েছে। এই বিদ্‌ঘুটে ঢঙের কামানো মাথায় ঝুঁটিবাঁধা চুলও যে কী আশ্চর্য সুন্দর হতে পারে, তা আমি দেখলুম এই প্রথম আর এই শেষ।

পরনে লুঙ্গীর মত করে ধুতি, মাদ্রাজী ধরনের কুর্তা, পায়ে চপ্পল্ কাঁধে তোয়ালে—যাকে বলে ন' সিকে মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ; নস্যি নিতে দেখিনি, বাদ পড়েছে মাত্র এইটুকু।

এ সবেতে আমার হিংসে হয় না, আমার হিংসে হত তার বসার ধরনটুকু দেখে। মুখে দুশ্চিন্তার লেশ নেই, বসেই আছেন বসেই আছেন, সূর্য ডুবলো, চাঁদ উঠলো, তাঁর কাছে যেন সবই সমান। বাড়ি ফেরার তাড়া নেই, আকাশে মেঘ জমলে ও বৃষ্টির ভয়ে তাঁকে আপন আসন ত্যাগ করে ব্যস্ত হতে কখনো দেখিনি।

পাকা তিনটি মাস ধরে আমি পুলিনবিহারী, আর তিনি পুলিনাসীন হয়ে রইলেন। আমি তাঁকে লক্ষ্য করলুম নিত্যি নিত্যি—এ-রকম সৌম্যকান্তি

লোককে অবহেলা করা কঠিন। তিনি আমাকে লক্ষ্য করলেন কিনা, বলতে পারবো না। কারণ আর যে দু'চারজন মাঝে-মাঝে এদিকে বেড়াতে আসেন, তাঁদের কাউকেও ওঁর সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি। তাই অনুমান করলুম, কাউকে লক্ষ্য করা এঁর অভ্যাস নয়, না হলে নিশ্চয়ই কারো না কারো সঙ্গে এঁর আলাপ-পরিচয়, অন্ততঃ নমস্কারনমূটা হয়ে যেত।

আমার আলাপ করতে ইচ্ছে হয়েছিল কিনা ঠিক বলতে পারবো না। কারণ আমি জানি, এ-রকম শান্ত ধীর সংযত সংহত লোকের সামনে চপল মানুষ লজ্জা পায় আপন চপলতা নিয়ে, আর সেটা ঢাকতে গিয়ে চপলতা বেড়ে যায় আরো বেশী। অথচ আলাপ করবার লোভও যে হয়নি, সে-কথাও বলতে পারি নে।

তবু হয়ে গেল এক দিন যোগাযোগ। বিনা মেঘে বজ্রপাত হয় শুনেছি, কিন্তু বিনা মেঘে বৃষ্টিপাত হয় এ-তত্ত্ব আমার জানা ছিল না। আমি ছিলুম একদৃষ্টে ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে। কবি নই, তবু মনে মনে ভাবছিলুম, এই যে দূর থেকে রোষে ক্রোধে তর্জনে গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সিন্ধুপারে লুটিয়ে পড়ে ঢেউগুলোর বিগলিত আত্মনিবেদন এর ঠিক জুতসই তুলনা কি বললে ঠিক ঠিক ওৎরাবে। মনে মনে ভাবছিলুম দুত্তোর ছাই, কবিরা বাণ্ডিল বাণ্ডিল তুলনা ছাড়ে কথায় কথায় আর আমার মাথা এমনি নিরেট যে, একটা পর্যন্ত তুলনা খুঁজে খুঁজে বের করতে পারছি নে! ভাগ্যিস, এ যুগের পরীক্ষায় কবিতা রচনা করতে হয় না, না হলে বাবাকে পরীক্ষার ফীজ দিতে দিতে ফতুর হতে হত।

হঠাৎ ঝমাঝ্‌ঝম বৃষ্টি। ছুট ছুট ছুট। এ-বৃষ্টিতে ভিজলে আমার তিন মাসের মেহন্নতে জমানো স্বাস্থ্য তিন টুকরো হয়ে যাবে। সেই নৌকাটার পাশ দিয়ে বেরুচ্ছি, এমন সময় দেখি তামিল ভদ্রলোকটি আমার দিকে ইঙ্গিত করছেন— সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করা মানুষের কর্ম নয়। আমি কাছে যেতেই বললেন, "নৌকর উপরে উঠে বসুন, আমি পাল দিয়ে আপনার গা ঢেকে দিচ্ছি। একটু পরেই আমার চাকর ছাতা নিয়ে আসবে।"

এ ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। যত তেজেই ছুট মারি না কেন, বাড়ি পৌছতে পৌছতে কাঁই হয়ে যাব।

গা বাঁচিয়ে বসার পর উত্তেজনা কাটতেই খেয়াল গেল, তামিল ভদ্রলোক কথা বলেছেন পরিষ্কার রাঢ়ী বাঙলায়! কি করে হল? এক মুহূর্তেই ভুলে গেলুম, এ-রকম শান্ত সংহত লোককে হড়বড় করে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা অনুচিত—চিৎকার করে পালের তলা থেকে শুধালুম, "এ-রকম বাঙলা বিদেশী বলতে পারে না। আপনার বাড়ি কোথায়?"

ভদ্রলোক শুনতে পেলেন কিনা, জানি নে। আমি কোনো উত্তর না পেয়ে বৃষ্টি-বাদল ভুলে গিয়ে ভাষা-সমস্যার সমাধানে লেগে গেলুম। অসম্ভব! এ-রকম অতি পরিষ্কার নদের বাঙলা মাদ্রাজী শিখবে কি করে? কিন্তু বাঙালী এ-রকম পাকা সেরী ওজনের কট্টর মাদ্রাজী বেশ-ভূষাই বা পরতে যাবে কেন? তাও না হয় বুঝলুম, কারণ বাঙালী বিদেশী ভূষা গ্রহণে হামেশাই তৈরী, কিন্তু মাথা ন্যাড়া করে ঝুঁটি বাঁধতে তো বাঙালীর রাজী হওয়ার কথা নয়। ফরাসী পণ্ডিত ফুশে সায়েব গণপতির মাথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, গণপতি অর্থাৎ গণ অর্থাৎ যূথ অর্থাৎ হাতীর রাজা। এক কালে তিনি পূজো পেতেন সাদাসিধে হাতীরূপেই—আজো যেমন হনুমানজী, বৃষরাজ পান। তার পর ক্রমে ক্রমে তাঁর নিচের দিকটা বদলে গিয়েছে—কিন্তু মাথাটি তিনি বদলাতে রাজী হননি, কারণ শিরাভরণ মানুষ সহজে বদলাতে চায় না। ফুশের কথাটি ঠিক—পূর্ব বাঙলার মুসলমান ধুতি পাঞ্জাবির সঙ্গে টুপি পরে, পাঞ্জাবী শিখ পাঠান স্যুট পরে পাগড়ীর সঙ্গে। তার উপর আরেকটা তত্ত্ব আমার বিলক্ষণ জানা আছে—বাঙালী আপন শরীরের অবহেলা করুক আর নাই করুক, চুলটিকে সে কেতা-দুরুস্ত রাখবেই। তাই তো গেঁয়ো কবিতায় আছে,

> বাইরে তোমার লম্বা কোঁচা
> ঘরেতে চড়ে না হাঁড়ি
> খেতে মাখতে তেল জোটে না
> কেরাসিনে বাগাও তেড়ি।

কেরাসিন দিয়ে কেশ-প্রসাধন করবে, তবু চুলের মায়া ছাড়ে না যে-বাঙালী, সে মাথা ন্যাড়া করে পরতে যাবে মাদ্রাজী ঝুঁটি!

কিন্তু নদের বাঙলা!

শুনলুম, "ছাতা-বরসাতি নিয়ে চাকর এসেছে, আপনি বাড়ি যান।"

আমি বেরিয়ে এসে শুধালুম, "আর আপনি?"

"ঠিক আছে" বলে কি ঠিক আছে, সেটা ভাল করে না বুঝিয়েই তিনি রওয়ানা দিলেন উত্তর মুখো হয়ে সমুদ্রের পারে পারে আর আমি পশ্চিম দিকে, বালু, ঘাস আর পিচের রাস্তা পেরিয়ে বাড়িমুখো।

অভদ্রতা হল অস্বীকার করি নে, কিন্তু তর্কাতর্কি করলে নেমকহারামী হতো। যে হাত ছাতা এগিয়ে দেয় সেটাকে তো আর কামড়ানো যায় না।

অপরিচিত মনিব সম্বন্ধে চাকরকে প্রশ্ন করা আরো বেশী অভদ্রতা। তাই কিছু জিজ্ঞেস করলুম না। বেশীক্ষণ সে সঙ্গে ছিলও না—সবুজ ফালির মাঝখানেই

অখণ্ড সৌভাগ্যবতীর পাঠানো ছাতা-বরষাত্তির সঙ্গে দেখা। বাড়ি পৌঁছে গেল মাথার উপর দিয়ে আরেক ঝড়। কনকপ্রসাদ ছাতা ধরবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শোনে কে? অখণ্ডসৌভাগ্যবতী বারে বারে বলেন দোষ তাঁরই, ছাতা পাঠিয়ে আমাকে এত্তেলা দেওয়া উচিত ছিল তাঁরই, কিন্তু ধমকটা দেন আবার আমাকেই। মেয়েদের বোধ হয় এই রকমই স্বভাব। বাচ্চা সংসারে আনেন ওনারাই আবার বাচ্চাকে গালাগাল দেন তেনারাই।

তাড়াতাড়ি খাইয়ে-দাইয়ে আলো নিবিয়ে দিয়ে আমাকে শুইয়ে দেওয়া হল।

দক্ষিণ মুখো হয়ে কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। বাঁ দিক থেকে আসছে সমুদ্রের কান্নার শব্দ—শোক যেন উথলে উথলে উঠছে। ডান দিকে নারকোলের ডগায় বাতাসের ঝিরিঝিরি—যেন মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। পায়ের তলায় ঝিল্লির রিনিরিনি। সামনের আকাশে মোমবাতির ফোঁটা-ফোঁটা চোখের জল জমে গিয়ে তারা হয়ে কালো চাদরের গায়ে লেগে আছে।

তামিল না বাঙালী, বাঙালী না তামিল?

এবং তার চেয়েও বড় সমস্যা, কাল দেখা হলে পরে তাঁর সঙ্গে যেচে গিয়ে কথা কইব, না উপেক্ষা করে যাবো? কোন্‌টা বেশী শোভন হবে?

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই বুঝলুম, অল্প জ্বর। খবরটা কিন্তু চেপে গেলুম। আমাকে আজ বিকেলে যে করেই হোক সমুদ্র-পারে যেতে হবে। যদি না যাই তবে পুলিনাসীন হয়ত ভাববেন আমি ইচ্ছে করেই তাঁকে কাট্ করেছি আর তারই ফলে তিনি চিরতরে কেটে পড়বেন।

অন্য দিনের তুলনায় একটু তাড়াতাড়িই বেরলুম।

সমস্যার ঝটিতি সমাধান হয়ে গেলে নিজের কাছে তখন নিজেকে কেমন যেন বোকা বনতে হয়। মানুষ তখন ভেবেই পায় না, এই সামান্য, সরল জিনিস নিয়ে সে আপন মনে এত তোলপাড় করেছিল কেন? আমার হল তাই। পরদিন সমুদ্র-পারে পৌঁছন মাত্রই ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন প্রসন্ন বদন দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে। কিছু না বলে আমার পাইচারিতে যোগ দিলেন এত সহজে যেন তিনি নিত্যি নিত্যি এমনি ধারা আমার সঙ্গে জোড়া-সান্ত্রীর টহল দেন। চলার ধরণটিও সুন্দর। হাত দু'খানি পিছনে নিয়ে মাথাটি নিচু করে পায়ের দু'টি পাতা এক দম সোজা ফেলে ফেলে।

সিন্ধু পার আর ড্রইং-রুম এক জিনিস নয়। ড্রইং-রুমে দু'জন লোক যদি চুপ করে বসে থাকে তবে সেটা নিশ্চয়ই বেখাপ্পা বলে মনে হয়। সমুদ্র-পারে হয় না।

বয়সে আমার চেয়ে যখন উনি বড় তখন পরিচয় ঘনানো না ঘনানো তো তাঁরই হাতে।

আমার ফিরোবার সময় এলে বললেন, "চলুন, নৌকোটার পাশে গিয়ে বসি।" আমি তাঁর বাঁ দিকে বসতে যাচ্ছিলুম—বললেন, "না, ডান দিকে বসুন। নৌকোটা তাহলে আপনার দৃষ্টি ঢেকে দেবে না।"

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর বললেন, "আপনি সাহিত্য-চর্চা করেন ?"

আমি বললুম, "না, তবে খবরের কাগজে মাঝে মাঝে কলাম লিখি।"

"কবিতা লেখেন না ? এখানে তো তার বিস্তর মাল-মশলা।"

আমি বললুম, "সমুদ্র, আকাশ আর বালু-পাড় এ তিনটে জিনিসই আমার কাছে এতই সহজ আর সরল বলে মনে হয় যে মনে মনে তার প্রকাশের ভাষা খুঁজতে গিয়ে বারে বারে হার মেনেছি!"

বললেন, "কথাটা ঠিক। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন,

'অপরিচিতের এই চির পরিচয়,
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়
সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি'।"

আমি শুধালুম, "আপনি সাহিত্য-চর্চা করেন ?"

বললেন, "দেশে থাকতে করতুম। কোন্ বাঙালী ছেলে করে না ? আর আমাদের আমলে বাঙালীর ছিল ঐ একমাত্র ব্যসন, আর কিঞ্চিৎ ধর্মচর্চা। রাম-কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ কিম্বা শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ।"

সেদিন আর বেশী কথাবার্তা হল না। বাড়ি ফেরার জন্য যখন উঠলুম তখন বললেন, "কিছু মনে করবেন না, আমি বয়সে বড় তাই আপনাকে আমি আমার আপন পর্যবেক্ষণ থেকে একটি কথা বলি। আকাশ সমুদ্র বালু-পাড় এগুলো আপনার কাছে এখন এতই সহজ ঠেকছে যে আপনি সেগুলোকে প্রকাশ করবার ভাষা পাচ্ছেন না। আরো কিছু দিন যাক, তখন আকাশের থমথমানি আর সমুদ্র-গর্জনের ভাষা এক দিন আপনার কাছে অনেক নূতন কথা বলতে আরম্ভ করবে।"

আমার লোভ হচ্ছিল জিজ্ঞেস করতে তিনি সাহিত্য-চর্চা করেন কিনা, কিন্তু চেপে গেলুম।

পরদিন বেড়াতে গেলুম অনেকগুলো প্রশ্ন এমনি কায়দা করে বানিয়ে নিয়ে যে তিনি কিছুটার উত্তর দিতে বাধ্য হবেনই হবেন। কিন্তু আমারই হিসেবে ভুল। ভদ্রলোক আমার পাইচারিতে যোগ না দিয়ে আপন আসনে চুপ করে বসে রইলেন

নিত্যিকার মত। আমার মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগল।

কিন্তু ঠিক বাড়ি ফেরার সময় তিনি উঠে এসে আমাকে বললেন, "দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলি। আপনি হয়ত নিঃসঙ্গ ভ্রমণ পছন্দ করেন তাই ইচ্ছে করেই আজ আমি দূরে ছিলুম। আমার কিন্তু দুই-ই সমান। আপনার ইচ্ছে হলেই আমার সঙ্গে এসে কথাবার্তা বলবেন আর আমি যখন চলা-ফেরাটা পছন্দ করি নে তখন আপনার ইচ্ছে হলেই একা-একা পাইচারি করতে পারবেন।"

ব্যবস্থাটা আমারও মনঃপূত হল।

তার পর দশ দিন ধরে রোজ বিকেলে বৃষ্টি। পাইচারি তখন মৌতাত হয়ে দাঁড়িয়েছে—বাধা পড়ায় হন্যে হয়ে উঠলুম। অনভ্যাসের ফোঁটা অভ্যেস হয়ে যাওয়ার পর ফোঁটা না কাটলে চড়চড় করে আরো বেশী।

এগারো দিনের দিন উঠলো কড়া রদ্দুর। বাড়ির বারান্দা থেকেই দেখতে পেলুম, দুপুর হতে না হতেই সমুদ্রপারের বালু শুকিয়ে গিয়েছে। মনটা আশ্বস্ত হল,—ভেজা বালুতে বসা যায় না বলে পাকা এক ঘণ্টা এক নাগাড়ে পাইচারি করা সহজ কর্ম নয়।

দশ দিন ধরে মনে মনে প্রশ্নগুলো আরো গুছিয়ে নিয়েছি।

বিকেল বেলা তারই একটা অতি সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। বললেন, "আমি বুঝতে পেরেছি আমি কে, কি বৃত্তান্ত জানবার জন্য আপনি ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। পৃথিবীতে এক রকম মানুষ আছে যারা সামান্যতম প্রহেলিকার সামনেও 'যাক্ গে ছাই, আমার কি ?' বলে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে আপন পথে চলে যেতে পারে না। আপনি সেই ধরনের। কিন্তু আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমিও স্থির করেছি আপনার সব প্রশ্নেরই উত্তর দেব এবং এমন আরো কিছু বলবো যা আপনার প্রশ্নেরও বাইরে।

"আমিই বলে যাই, আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আপন অজানাতেই আপনি জেনে যাবেন।

"পুতুকোট্টাই থেকেই আরম্ভ হোক। তার আগের পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বলবার মত বিশেষ কিছু নেই। জন্মেছি কৃষ্ণনগর, পড়াশোনা করেছি কলকাতায়, আর বিস্তর ছুটি কাটিয়েছি হয় শিলঙে না হয় ব্রহ্মপুত্র পদ্মায় ডিসপাচ জাহাজে। বাবা কাঠের ব্যবসা করতেন এবং আমা দ্বারা ব্যবসা হবে না জানতেন বলেই মরার পূর্বে আমার জন্য ভালো ভালো শেয়ার কিনে রেখে যান।

"তাই শ্রাদ্ধাদি চুকিয়ে পঁচিশ বৎসর বয়সে ভ্রমণে বেরবার পথে কোনো বাধাই ছিল না। প্রথমে দেখলুম উত্তর ভারত তন্ন তন্ন করে—আমার ইতিহাসে সখ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখা ইতিহাসের কঙ্কাল তক্ষশিলা কাশী, দিল্লী আগ্রা গিয়ে রক্ত-মাংস পেয়ে যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। তখন ইচ্ছে হল দক্ষিণ দেখবার। ওয়ালটেয়ার, রাজমহেন্দ্রী, বেজওয়াড়া সেরে এলুম মাদ্রাজ—তার পর কাঞ্চিবরম্, চিদম্বরম্, মাদুরা, তাঞ্জোর করে করে শেষটায় পৌঁছলুম গিয়ে পুদুকোট্টাই।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "পুদুকোট্টাই দেশী রাজ্য কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গায় আমার মনে পড়ছে না।"

বললেন, "না পড়ারই কথা। তবু জায়গাটার নাম মাঝে মাঝে কাগজে বেরোয়। আমাদের যেমন কুচবিহার, খাস দক্ষিণ অঞ্চলের তেমনি পুদুকোট্টাই। কিন্তু বাঙলা দেশের মাহাত্ম্য জানতে হলে যেমন কুচবিহার যাবার দরকার নেই, এদেশে এসে তেমনি পুদুকোট্টাই না গেলেও চলে।

"আমার ওখানে যাওয়ার একমাত্র কারণ আমার এক তেলুগু সতীর্থের পিতা সেখানে মহারাজার প্রাইভেট-সেক্রেটারি ছিলেন। য়লমঞ্চলি মাদ্রাজে এসে আমাকে এক রকম জোর করে পুদুকোট্টাই ধরে নিয়ে গেল।"

ভদ্রলোক থামলেন।

সেদিন ষোড়শী। চাঁদ উঠবে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর। বাড়িতে বলে গিয়েছিলুম চাঁদের আলোতে বাড়ি ফিরব। পুবের আকাশে তখন অল্প অল্প চিলিক্ লেগেছে—আমার চতুর্দিকে ঘন অন্ধকার আর তার সঙ্গে মেশানো রয়েছে সমুদ্রের গম্ভীর গর্জন ধ্বনি। তার ভিতর দিয়েও আমি স্পষ্ট অনুভব করলুম ভদ্রলোক তাঁর গল্পের, তাঁর জীবনের এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন যেখান থেকে এগোবার সময় ভেবে-চিন্তে কথা বলতে হয়।

চাঁদ উঠলো। আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি চোখ বন্ধ করে আছেন। হঠাৎ বললেন, "আপনি পিয়ের লোতির 'ইংরেজ-বর্জিত ভারতবর্ষ' পড়েছেন? আমি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদের কথা জিজ্ঞেস করছি।"

আমি বললুম, "কী আশ্চর্য! আজ সকালের ডাকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থা-বলী পেয়েছি। আর আজ সকালেই আমি লোতির পণ্ডিচেরী-বর্ণন পড়ছিলুম।"

অতি শান্ত স্বরে বললেন, "সবই যোগাযোগ। মানুষ তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে কি করে যতক্ষণ না যোগাযোগের উপর তার কর্তৃত্ব লাভ হয়? কিন্তু আজ আর না। বাড়ি ফিরে গিয়ে আমাকে এক গাদা প্রুফ দেখতে হবে। কাল সকালেই ফেরৎ পাঠাবার কথা। আপনি কাল আসবার সময় লোতির বইখানা সঙ্গে নিয়ে আসবেন।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "লোতির বইয়ের কোন্ অংশের কথা আপনি ভাবছিলেন ?"

বললেন, "পণ্ডিচেরি বাসের সময় তিনি যে ভরত-নাট্যম্ দেখেছিলেন, তার বর্ণনাটা পড়ুন।"

আমি বললুম, "আপনিই পড়ুন। আপনার উচ্চারণ আমার চেয়ে অনেক পরিষ্কার—আর ঢেউয়ের আওয়াজ ছাপিয়ে আমার গলা চড়াতে গেলে কষ্ট হয়, অল্পেতেই হাঁপিয়ে পড়ি।"

হেসে বললেন, "গলা নামিয়ে নিলেই হয়।"

তখন লক্ষ্য করলুম, এ-ভদ্রলোক যে ক'টি বার কথা বলেছেন, সব সময়ই গলার পর্দা নামিয়ে দিয়ে। কনকপ্রসাদ তাহলে জানেন না যে, সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথা কইতে হলে যেমন চড়িয়ে বলা যায়, তেমনি নামিয়ে বলতেও বাধা নেই। অত্যন্ত দ্রুত বাজিয়ে যে-রকম তবলচীকে কাবু করা যায় তেমনি অত্যন্ত বিলম্বিত লয় নিলেও তাকে হার মানানো যায় আরো সহজে।

'দীর্ঘায়ত-নেত্র-বিশিষ্ট, রং-করা একটি তরুণ মুখ,—ইন্দ্রিয়াসক্তি-পরিব্যঞ্জক মুখ, তিমির-রাজ্যের সুখ—খুব লঘু ভাবে, তাড়াতাড়ি একবার এগিয়ে আসিতেছে, —আবার পিছিয়া যাইতেছে। চোখের দুইটি তারা মিনা-র সাদা জমির উপর বসানো কৃষ্ণমণির মত কালো দুইটি তারা আমার চোখের উপর নিবদ্ধ। এই যে হৃদয়-দুর্গ অধিকার করিবার জন্য একবার আমাকে আক্রমণ করিতেছে, আবার পলায়ন করিয়া ছায়ান্ধকারের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে,—এই সমস্ত ক্ষণ উহার চোখের দুইটি কালো তারা আমার চোখের উপর সমান ভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে।...

'জনতার মধ্যে এই রমণীকে ছাড়া আমি আর কিছুই দেখিতেছি না—উহার ঐ সঁীথি-বিভূষিত মস্তক ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছি না। রমণী, হীরক-মাণিক্য-খচিত বলয়-কেয়ূরাদি ভূষণে আস্কন্ধ-বিভূষিত বাহুযুগকে ভুজঙ্গ গতির অনুকরণে কত রকম করিয়া বাঁকাইতেছে—কিন্তু না, সর্বাগ্রে উহার চোখের দৃষ্টি আমার চোখের অন্তস্তল পর্যন্ত এমন ভাবে ভেদ করিতেছে যে, আমার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে ; ঐ চোখে নানা প্রকারের ভাব খেলিতেছে—কখনো পরিহাসের ভাব, কখনো স্নিগ্ধ কোমল প্রেমের ভাব...উহার মণিরত্নখচিত শিরোভূষণের ও কর্ণ-নাসিকার অলঙ্কারের এরূপ উজ্জ্বলতা এবং ঐ উজ্জ্বল সোনার সঁীথিটি এমন পরিপাটি রূপে উহার মুখটি বেড়িয়া আছে যে, তাহাতে ঐ সুন্দর শ্যামল মুখখানিতে কি জানি একটা অস্পষ্ট দূরত্বের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে—আমাকে স্পর্শ করিলেও যেন

সে দূরত্ব ঘুচিবার নহে।

"এই নর্তকী নৃত্যশালার এক প্রান্তে কিছুক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে ছিল—সহসা আবার আসিয়া উপস্থিত। কুপিতা নায়িকার ন্যায় রোষ-কষায়িত-নেত্র হইতে আমার উপর তীক্ষ্ণ বাণ-বর্ষণ করিতেছে; আমি যেন উহার নিকট কি একটা অপরাধ করিয়াছি—তাহারই জন্য যেন সে স্বর্গ-মর্তকে সাক্ষী রাখিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছে···

"তার পর, নর্তকী হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, সে হাসি পরিহাসের হাসি, ঘৃণার হাসি, জনতার নিকট আমাকে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া হাসিতে লাগিল। জানা কথা, উহার ভর্ৎসনা যেমন কৃত্রিম, এইরূপ উপহাসও সেইরূপ কৃত্রিম। কৃত্রিম হউক, কিন্তু আসলের ঠিক নকল—চমৎকার নকল।

"নর্তকী, কণ্ঠ একটু উত্তোলন করিয়া, একটু গম্ভীর স্বরে, তীব্র হাসি হাসিতেছে তাহার হাসি—মুখ দিয়া, ভুরু দিয়া, উদর দিয়া, কম্পমান বক্ষ দিয়া যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে। হাসির আবেশে উহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে এবং এইরূপ হাসিতে হাসিতে সে দূরে সরিয়া যাইতেছে। সে হাসি দুর্দমনীয়, সে হাসি শুনিলে অন্যকেও হাসিতে হয়।

"আর যেন আমার মুখদর্শন করিবে না, এই ভাবে অত্যন্ত অবজ্ঞা সহকারে, মুখ ফিরাইয়া, নর্তকী দ্রুত পদক্ষেপে পিছাইতে পিছাইতে চলিয়া গেল। আবার ফিরিয়া আসিল। আমার উপর তাহার প্রবল ভালোবাসা পড়িয়াছে, সে সর্বজয়ী মদনের নিকট পরাভূত হইয়া, আমার দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া কর-যোড়ে মার্জনা ভিক্ষা করিতেছে, আমাকে তাহার সর্বস্ব দান করিবে বলিয়া অনুনয় করিতেছে, ইহাই তাহার শেষ প্রার্থনা। এবার যখন চলিয়া গেল, তখন তাহার দেহ একটু হেলিয়া পড়িয়াছে, ওষ্ঠদ্বয় একটু ফাঁক হইয়া তাহার মধ্য হইতে শুভ্র দন্তরাজি প্রকাশ পাইতেছে; তাহার নাসিকায় হীরকের টুকরাগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। সে চায়—সে নিতান্তই চায়, আমি তাহার অনুসরণ করি, সে তাহার বাহুর দ্বারা, তাহার কম্পিত বক্ষের দ্বারা, তাহার অর্ধনিমীলিত নেত্রের দ্বারা আমাকে ডাকিতে লাগিল, সে চুম্বকমণির মত, সর্বান্তঃকরণে আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল, আমিও মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায়, ক্ষণেকের জন্য তাহাকে অনুসরণ করিলাম, কেন না, সে আমাকে সত্যই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল।

"আবার সেই ভর্ৎসনা, সেই দুর্দমনীয় হাসি, নেত্রভঙ্গীতে সেই বিদ্রূপের ভাব, আবার সেই নিরঙ্কুশ প্রেমের আহ্বান······'।"

ভদ্রলোক থামলেন। আমি বললুম, "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষা সব সময়ই আমার কাছে কেমন জানি একটুখানি আড়ষ্ট বলে মনে হত। কিন্তু আপনার পড়ার ধরনটি এমনি সুন্দর যে সেটা আর কানে বাজে না।"

বলেই বুঝতে পারলুম, রসভঙ্গ করা হল।

কিন্তু ভদ্রলোক বিচলিত হলেন না। বললেন, "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তো আর রবীন্দ্রনাথের গড়ে-তোলা ভাষার সুযোগ পাননি। এমন কি আমার মনে হয়, তিনি যেন বঙ্কিমকেও এড়িয়ে যেতেন—বরঞ্চ তিনি যদি দ্বিজেন্দ্রনাথের লঘু-শৈলীর দিকে একটু নজর দিতেন তা হলেও হয়ত তাঁর ভাষা খানিকটা গতি-বেগ পেতো।"

তার পর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ভরত-নাট্যম্ দেখেছেন ?"

আমি বললুম, "দেখেছি, কিন্তু লোতির চোখ দিয়ে দেখিনি। এখন যদি আবার দেখতে পাই তবে তার থেকে অনেক বেশী রস বের করতে পারবো। আমার লজ্জা বোধ হয় যে বিদেশী লোতি প্রথম দর্শনেই ভরত-নাট্যমের এতটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পেল আর আমি এ-দেশের লোক হয়েও বিদেশীর সাহায্য নিয়ে আপন নৃত্য চিনতে যাচ্ছি।"

"রসের ব্যাপারে দিশী-বিদেশী বলে কোনো পার্থক্য তো নেই। আর অন্যের সাহায্য নিতেই বা আপত্তি কি ?

'ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্ত-কেশে আঁচলখানি দোলে'

শোনার পরই তো আমি প্রথম লক্ষ্য করলুম, দূর-দূরান্ত থেকে যখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষা ধেয়ে আসে গ্রামের দিকে তখন তার সৌন্দর্য আমার কোন চেনা জিনিসকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার মাধুর্য দিয়ে আমার হৃদয় ভরে দেয়। বেশির ভাগ লোকই তো প্রকৃতিকে চিনতে শেখে কবির সৃষ্টির ভিতর দিয়ে। আপনি যদি ভরত-নাট্যম্ লোতির সাহচর্যে শেখেন, তবে তাতে আর আপত্তি কি ? কিন্তু আপনাকে একটুখানি সাবধান করে দিই এই বেলা—লোতির বর্ণনাতে কোন জিনিসের অভাব লক্ষ্য করেছেন কি ?"

আমি খানিকটা ভেবে নিয়ে বললুম, "না তো।"

"কেন ? লক্ষ্য করেননি, লোতি দেখেছেন প্রধানতঃ অভিনয়ের দিকটা। নাচের দিকটা তাঁর চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। যে অঙ্গ-সঞ্চালন যে পদক্ষেপের উপর নির্ভর করে সমস্ত নৃত্যটি তার রূপ পেল, যে রূপ আমার হৃদয়ের ভিতর তার ছাপ মেরে রসসৃষ্টি করল সেই তো আসল নৃত্য,—অভিনয় তো তার সামান্য একটি অংশ মাত্র। মনে করুন, আপনি 'মেঘ' শুনছেন—তাতে বর্ষার খানিকটা বর্ণনা

থাকে কিন্তু সেইটেই তো সব চেয়ে লক্ষণীয় জিনিস নয়। তা হলে তো আসল রাগটি আপনাকে এড়িয়ে গেল—সত্যকার রসটি আপনি পেলেন না। রসের মা-ও বাচ্চাকে ভুলিয়ে রাখতে চান বর্ণনার ঝুমঝুমি দিয়ে—যে-বাচ্চা তখনো সন্তুষ্ট না হয়ে আরো বেশি কান্নাকাটি জুড়ে দেয় মা তাকে শেষ পর্যন্ত রসের স্তন্য না দিয়ে থাকতে পারেন না।

"আমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে যে নাচ দেখার অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও প্রথম দর্শনেই খাঁটি রসটাকে ধরতে পেরেছিলুম। আমি দম্ভ করছি নে, আর এতে আশ্চর্য হবারও কিছু নেই। দেখেননি, গাঁয়ের কত রাখাল ছেলের ভিতরেও এমন রসবোধ থাকে যে প্রথম শ্রবণেই তারা অজানা-অচেনা রাগ-রাগিণী চিনে ফেলে। শুধু তাই নয়, আপন বাঁশী দিয়ে বিনা কসরৎ বিনা মেহন্নৎ সেগুলো শুনিয়েও দেয়। তাই যখন প্রথম ভরত-নাট্যম্ দেখলুম—"

আমাকে বাধ্য হয়ে বাধা দিতে হল। শুধালাম, "কোথায় ?"

"ওঃ! আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, পুদুকোট্টাই থেকে আমার কাহিনী আরম্ভ হওয়ার কারণ আমি ওখানে প্রথম ভরত-নাট্যম দেখি। পুদুকোট্টাই মহারাজার সেক্রেটারির ছেলে য়লমঞ্চলি ভেঙ্কটরাও রামেশ্বরাইয়া চৌধুরী—আমার সতীর্থ—পুদুকোট্টাইয়ে আমার 'শুভাগমন উপলক্ষে' ভরত-নৃত্যমের ব্যবস্থা করেন। গাইয়ে বাজিয়ে নর্তকী আনানো হয় বিশেষ তোয়াজ করে মদুরা থেকে। লোতির জন্য যেমন করে পণ্ডিচেরির লোক বিশেষ নাচের ব্যবস্থা করেছিল আমার জন্য তেমনি য়লমঞ্চলি মদুরার তরুণী নর্তকীদের সব চেয়ে নামকরাকে মুজরার জন্য ডেকেছিল। পুদুকোট্টাইয়ে দ্রষ্টব্য জিনিস কিছুই নেই—একমাত্র অজন্তা শৈলীতে আঁকা কিছু গুহা-চিত্র ছাড়া, অবশ্য সে অপূর্ব জিনিস, অজন্তাকেও ছাড়িয়ে যায়—তাই য়লমঞ্চলি আমাকে এমন কিছু দেখাতে চাইলো যা আমি পূর্বে কখনো দেখিনি। স্কটিশে পড়ার সময় বিদেশী য়লমঞ্চলিকে আমি যে সামান্য হৃদ্যতা দেখিয়েছিলুম সে যেন তারই শোধ দেবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছিল।

"কি বলছিলুম ? হ্যাঁ—আমি প্রথম দর্শনেই ভরত-নৃত্যমে রস পেয়ে গেলুম। য়লমঞ্চলি আমাকে অভিনয় আর মুদ্রাগুলো পাশে বসে বুঝিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আমার প্রাণ নেচে উঠলো নর্তকীর রসসৃষ্টির শুদ্ধ নৃত্যের দিকটা অনুভব করতে পেরে। লোতির বর্ণনায় শুনলেন, নর্তকী প্রেমের কত চিত্র-বিচিত্র অভিনয় করল—লোতি নৃত্যের দিকটা লক্ষ্য করেননি বলে তার আসল রস, তার মূল রস ধরতে পারেননি। সেটা এক কথায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে,—'প্রেম'। প্রত্যেক রাগ-রাগিণীর যেমন একটা মূল বক্তব্য থাকে, প্রত্যেক ছবির যেমন একটা মূলবিষয়-

বস্তু বা 'লাইট-মতিফ' (Leit-motif) থাকে, ঠিক তেমনি সে রাত্রের ভরত-নৃত্যে আমি যে মূল রসটি ধরতে পারলুম সেটি অলঙ্কার-বিবর্জিত শুদ্ধ 'প্রেমে'র অনুভূতি।

"লোতি বলেছেন, নর্তকীর আহ্বান শুনে দেশ-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে ক্ষণেকের তরে তিনি নর্তকীর অনুসরণ করেছিলেন; আমিও ঠিক তেমনি একবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। য়লমঞ্চলি আমার কোটের আস্তিনে সামান্য টান দিতেই আবার স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়। শুনলুম বলছে, 'সুন্দরম্'—"

আমি শুধালাম, "সুন্দরম্ তো বাঙলা নাম নয়।"

বললেন, "আমার নাম রামেন্দ্রসুন্দর চৌধুরী। য়লমঞ্চলি মাঝখানের 'সুন্দর'টা নিয়ে মাদ্রাজী রসমের 'ম' লাগিয়ে সেটাকে দ্রাবিড়স্থ অর্থাৎ 'ভদ্রস্থ' করে নিয়েছিল।

"য়লমঞ্চলি বলেছিল, 'সুন্দরম্, নৃত্যটা তাহলে তোমার মত অরসিককেও চঞ্চল করে তুলেছে; আমার মেহন্নত সফল হল।' আমি বলেছিলুম, 'এ মেয়েটির নাচ আমাকে আরো দেখতে হবে।' য়লমঞ্চলি বলেছিল, 'সিনেমাতে প্রত্যেক ট্রেলার দেখার সময় যে রকম মনে হয়, ও ছবিটা আমাকে দেখতেই হবে আর তার পর ট্রামে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ট্রেলারের কথা বেবাক ভুলে যায়, ভরত-নৃত্যমের বেলাও তাই। কাল-পরশুর ভিতরেই তুমি সব কিছু ভুলে যাবে।'

"আমি কিছু বলিনি, কারণ যেখানে প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তির জন্য শুদ্ধ মাত্র তুলনার উপর নির্ভর করে সেখানে তর্ক করে কোন লাভ নেই। ট্রেলার তো চেষ্টা করে চোখের উপর কৌতূহলের চটক লাগাবার—তাই মানুষ দু'মিনিট পরেই সে ভেল্কি-বাজির কথা ভুলে যায়। ভরত-নাট্যম তো আমাকে দিল এক অভিনব রসের সন্ধান, যে-রস আপন গৌরবে 'স্বে মহিম্নি', ক্ষুদ্র কৌতূহল জাগাবার যার কোন প্রয়োজন নেই।

"নাচ শেষ হয়েছিল রাত প্রায় একটার সময়। বাড়ি ফিরে আমার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। পুদুকোট্টাই শহরে কোনো প্রকারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নেই কিন্তু রাজবাড়ি এবং সেক্রেটারীর বাঙলোর মাঝখানের পাঁচিল-ঘেরা লন্‌টি সত্যই মনোরম। বাঙলোর এক পাশে জলের চৌবাচ্চা। বারান্দার ডেক-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে চাঁদের আলোয় দেখলুম রাজার পোষা হরিণ জোড়ায় জোড়ায় এসে জল খেয়ে গেল—নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারণে। চাঁদ হেলে পড়তে লাগল, সারিবাঁধা গাছের ছায়া দীর্ঘতর হল, রাজার হরিণ আলো-ছায়ার আলিঙ্গনের মাঝখানে একে অন্যের গা ঘেঁষে ঘেঁষে পূর্বাকাশে আলোর আভাস লাগার পূর্বেই মিলিয়ে গেল।

"আমার মন এক অজানা অস্বস্তিতে ভরে উঠল।"

রামেন্দ্রসুন্দর থামলেন। সূর্য অস্ত গিয়েছে। আকাশের লাল আভা মিলিয়ে

যাওয়ার দরুন সমুদ্রের বেগুনি জল আবার গাঢ় নীল হয়ে হয়ে শেষটায় একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে। এখন আর দেখাই যায় না। আজ চাঁদ উঠবে অনেক দেরীতে।

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, "পর দিন সন্ধ্যেয় আমার মাদ্রাজ ফেরার ট্রেন। য়লমঞ্চলি স্টেশনে এল এগিয়ে দিতে। রাজাকে প্রজা যত না ডরায়, তার চেয়েও বেশি ডরায় তার সেক্রেটারীকে এবং সব চেয়ে বোধ হয় বেশি ডরায় তার বড় ব্যাটাকে। য়লমঞ্চলি দুঃখ করে বললো, 'ঐ দেখো, আমি আসবো বলে ওয়েটিং-রুম প্ল্যাটফর্ম ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। ভিড়ের মধ্যিখানে তুমি বসবে ট্রাঙ্কটার উপর, আমি হোল্ডলটা চেপে, আইসক্রীমটা পানটা খাবো, আড়-নয়নে এদিক ওদিক তাকাবো, তা না। চলতে গেলে সামনে পাইক, পিছনে বরকন্দাজ। কারো দিকে যদি সিকি-নয়নেও তাকাই সঙ্গে সঙ্গে খবর রটে যাবে, য়লমঞ্চলি কোডাই-কানাল গেছেন 'হনি-মুন' করতে। তোমাকে যে ইস্টিশনটা ভালো করে দেখাবো তারও উপায় নেই।' এ রকম অনবরত বকর-বকর করে য়লমঞ্চলি আসন্ন বন্ধু-বিচ্ছেদটা কাটাবার চেষ্টা করছিল।

"কিছু ভুলও বলেনি। কারো শুভাগমন উপলক্ষে সিঁড়ির উপর যে লাল কাপড় পাতা হয় সেটা দেখে আমারও ভয় লাগে। মনে হয়, ওয়েটিং-রুম রাক্ষসীর লাল জিভ লকলক করে বেরিয়েছে রাস্তা পর্যন্ত অতিথি অভ্যাগত সবাইকে গিলে ফেলবার জন্য।

"য়লমঞ্চলি বলল, 'চলো, প্ল্যাটফর্মে শেষের দিকে—যদি কিছু দেখবার মত থাকে।' পাইক-বরকন্দাজকে ধমক দিয়ে বলল, 'তোরা সব বস গিয়ে ওয়েটিং-রুমে—আমরা আসছি।'

"দূর থেকেই দেখতে পেলুম এক গাদা বাজনার যন্ত্রপাতি। কাছে আসতেই জন পাঁচেক লোক দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের নমস্কার করল। নর্তকী পিছন ফিরে কার সঙ্গে কথা বলছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে পেয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। আমার দিকে চোখ যেতেই আমি তাকে একটি ছোট্ট নমস্কার করলুম। লজ্জায় তার মুখ-কান লাল হয়ে গেল। আরো ভ্যাবাচাকা খেয়ে কি যে করবে বুঝেই উঠতে পারলো না—তারপর হঠাৎ যেন লুপ্ত বুদ্ধি ফিরে পেয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে নর্তকীদের কায়দায় আমাকে বার বার সেলাম করলো।

"য়লমঞ্চলি বললো, 'চলো।' একটু দূরে এসে বললো, 'পুদুকোট্টাই ভিন্ন অন্য যে কোন জায়গা হলে আমি তোমাকে পঙ্কজমের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতুম।'

'পঙ্কজম্', 'পঙ্কজম্'—'ম' যোগ করলে যে শব্দের সৌন্দর্য বাড়ে তা এই প্রথম লক্ষ্য করলুম।

"লোতি বলেছেন, 'জনতার মাঝখানে নর্তকীকে দেখাচ্ছিল পথ-হারা পরীর মতো।' আমার মনে হয়েছিল, 'নৃত্যের ভিতর দিয়ে যে রমণী সুধা-পারাবারের সন্ধান পেয়েছে, যার প্রতি পদক্ষেপ প্রতি হস্তবিন্যাস অফুরন্ত রসের ধারা বইয়ে দেয় প্রতিক্ষণে, সে তার ধ্যানলোক থেকে নিজেকে বিমুক্ত করে আর পাঁচজনের সঙ্গে কথা কয় কোন্ ভাষায়, খায়-দায়, ওঠে-বসে কি প্রকারে? খান আব্দুল করীম খান সাহেবের গান শোনার পর কখনো কল্পনা করা যায় যে তিনি ঐ গলা দিয়েই দৈনন্দিন কথাবার্তা বলছেন? নৃত্যের বশে যে-পদযুগ প্রজাপতির ডানা হয়ে আকাশে-বাতাসে উড়তে থাকে সেই পা-দু'খানি কি করে চলতে পারে শান-বাঁধানো প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে?

"পঙ্কজমের নৃত্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল নাচের মজলিসে কিন্তু স্টেশনে মুগ্ধ হলুম পঙ্কজম্‌কে দেখে। ভরত-নাট্যমের বেশ আমার কাছে সব সময়ই দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়েছে। উত্তর-ভারতের রাজপুত-মোগলাই নর্তকীরা পরে চুড়ীদার টাইট-পাজামা আর তার উপর মলমলের ঘাগরা। পাজামা বড় অপ্রিয়দর্শন জিনিস—সেটাকে আস্বচ্ছ ঘাগরা কিছুটা ঢেকে দেয় বলে উত্তর-ভারতের নর্তকীর সজ্জায় খানিকটা সৌন্দর্য আছে, কিন্তু ভরত-নাট্যমের নর্তকী পাজামার উপরে পরে মারাঠি ধরনের কাছা-মারা শাড়ি—দু'টো জিনিসই বাঙালীর চোখকে বড্ড বেশি পীড়া দেয়। উরু আর পদবিন্যাস দেখাবার জন্য মোগলাই পাজামার প্রয়োজন সে-কথা বুঝতে পারি, কিন্তু সেটার উপর মারাঠি শাড়ি চাপিয়ে যে নর্তকীর কোন সৌন্দর্যবর্ধন হয় সেটা আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

"স্টেশনে পঙ্কজমের পরনে ছিল মিলের মামুলী শাড়ি আর বাঙালোর সিল্কের কাঁচুলী। কিন্তু নাচের সময় যে-নর্তকীর প্রতি অঙ্গ বিশ্লেষণ করে দেখা সমঝদারের কর্তব্য, সেই যখন আটপৌরে কাপড় পরে নাচের বাইরে এসে দাঁড়ায় তখন তার দিকে তাকানো শালীনতার লক্ষণ নয়। লোতি নর্তকীর দেহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'তার গাত্র ধাতু-স্তম্ভের ন্যায় সুচিক্কণ'—আর আমি এক পলকে যেটুকু দেখতে পেয়েছিলুম তার স্মরণে আজ বলতে পারি, সে গাত্রে এতটুকু অনাবশ্যক মেদ ছিল না, এমন কি কোমর আর কাঁচুলির মাঝখানের অনাবৃত স্থলেও না।

"আমার বয়স তখন কম, তাই আমি যে লজ্জা করে দু'বার তাকাতে পারিনি সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না, কিন্তু নর্তকীও যে লজ্জা পেল সেইটে দেখে আমার আশ্চর্য

বোধ হল। কত লোক তাদের দিকে তাকায় প্রতিদিন, কই, তারা তো লজ্জায় জড়সড় হয় না? তবে কি আমার সঙ্কোচ-ভরা তাকানোটাই তার মুখে ব্রীড়ার ভাব এনে দিয়েছিল?

"সেটা ঢাকবার জন্তই বোধ করি একটুখানি হেসেছিল।

"আমি জানি, সাদা চামড়ার প্রতি বাঙালীর দুর্বলতা আছে কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দাঁতের আসল সৌন্দর্য ফুটে ওঠে শ্যামবর্ণের ভিতর দিয়ে—বিদ্যুল্লতার শিহরণ তো কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকেই।"

আমি বললুম, "তুলনাটি বেশ।"

বললেন, "সাহিত্য-সৃষ্টি যে করে না তার পক্ষে খুব মন্দ নয়। কিন্তু আমি তো কিছুমাত্র বানিয়ে বানিয়ে বলছি নে। আর তা করলেও বিশেষ কোনো ফল হবে না। কারণ সাহিত্য-রস সৃষ্টি করবার জন্ত যে খাটুনির প্রয়োজন তার উপযুক্ত সময় আমার আদপেই নেই। আমি যে কাজ নিয়ে পড়ে আছি তাতে সাহিত্য-রস সৃষ্টি করতে গেলেই সমঝদার পাঠক সন্দেহ করবে, তথ্যের অভাব আমি বাক-চাতুরী দিয়ে ঢাকতে চাই। থাক্ সে কথা।

"সমস্ত রাত আমার ঘুম হয়নি। অস্বীকার কোরব না, পঙ্কজমের নাচ আমাকে মুগ্ধ করেছিল আগের রাত্রিতে, আর আজ সন্ধ্যায় আমাকে মুগ্ধ করলো তার মামুলী আটপৌরে ভাব—সাধারণ মেয়ের সাধারণ ব্রীড়া, সাধারণ লজ্জা। নাচের পূর্বে নর্তকীকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে বিশেষ করে আমার জন্তই তাকে আনানো হয়েছে, এবং সেও তার সমস্ত কলা-নৈপুণ্য প্রয়োগ করেছিল আমার দেশ-কাল-পাত্র বোধ বিস্মৃতিতে বিলোপ করে দেবার জন্ত তবু আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনি,

'হৃদয় ব্যথিল মোর অতি মৃদু গুঞ্জরিত সুরে—
ও যে দূরে, ও যে বহুদূরে,
যত দূরে শিরীষের ঊর্ধ্বশাখা, যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণ গন্ধ নেমে এসে প্রাণের গভীরে—'

"আশ্চর্য! সঙ্গীত, পদ-বিন্যাস, অঙ্গ-সঞ্চালন, ভ্রূভঙ্গী, ওষ্ঠাধর কম্পন, অসিত নয়নের কৃষ্ণবিদ্যুৎবহ্নি দিয়ে যে-রমণী নিবিড়তম অন্তরঙ্গতায় শতাধিক বার আমার চিত্তজয় করেছিল কাল রাত্রে, তাকে তখন মনে হয়েছিল 'ও যে দূরে, ও যে বহুদূরে' আর আজ যখন সে লজ্জায় মুখ ফিরালো তখন মনে হল, সে তো অত দূরে নয়, সে যে অনেকখানি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

"আর সেই মুহূর্তেই আমি পেলুম ভয়। অজানা এক অদ্ভুত ধরনের ভয়, বহু

বিশ্লেষণ করেও আমি তখন সে ভয়ের কারণ বের করতে পারিনি। পরে এক দিন পেরেছিলুম—সে কথা পরে হবে।

"লোতি বলেছেন, ভরত-নাট্যম দেখে তাঁর ক্লান্তি বোধ হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভয়ও হচ্ছিল পাছে নর্তকী তার নৃত্য বন্ধ করে দেয়—তা হ'লে তো তিনি আর তাকে দেখতে পাবেন না। গাড়িতে শুয়ে শুয়ে আমারও মনে হচ্ছিল, নর্তকী আমাকে যে ভাবে অভিভূত করে ফেলেছে সেটা আমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে আশাও পোষণ করেছিলুম, সে যেন মাদ্রাজের আগে কোন স্টেশনে না নেমে যায়। জানতুম এ-গাড়ি কলম্ব থেকে আসা প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে মাদ্রাজ—অল্প দূরের যাত্রীকে এ গাড়িতে উঠতে দেয় না—তবু তো সামনে রয়েছে বড় বড় স্টেশন, তাঞ্জোর আর তার পর বিল্বপুরম্। সেখান থেকে ডাইনে পণ্ডিচেরি, বাঁয়ে তিরুআন্নামলাই হয়ে বাঙালোর. মহীশূর কত কি।

"রাত তখন তিনটে হবে। আমি আর কিছুতেই আমার কৌতূহল দমন করে উঠতে পারলুম না, পঙ্কজম্‌রা ইতিমধ্যে কোথাও নেমে গিয়েছে কি না জানবার জন্য। আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলুম অস্বীকার করি নে তবু মনে হয়েছিল ছেলেমানুষীটার বাড়াবাড়ি হচ্ছে—আমার ভিতরকার ছেলেমানুষ তখন বুড়ো সেজে বিজ্ঞ মনকে বোঝাচ্ছে, বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে দু'পা হেঁটে নিলে ঘুম পেলেও পেতে পারে—যেন আমি ইতিপূর্বে ট্রেনে আর কখনো বিনিদ্র যামিনী যাপন করিনি!

"না নামলেই ভালো হত। দেখি, কাঁটাল-বোঝাই নৌকার মত থার্ড ক্লাসের ভিড়ের এক কোণে পঙ্কজম্ জড়সড় হয়ে বসে আছে। ভিড়ের মাঝখানে নর্তকীকে আর লোতির 'পথহারা পরীর' মত দেখাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল স্টীম-রলারের এক পাশে যেন কোনো প্রকারে প্রাণ বাঁচিয়ে ফুটে রয়েছে পথপ্রান্তের বনফুল। দুঃখ হল, কিন্তু আশ্চর্য হলুম না, কারণ ইন্দোর না গোয়ালিয়র কোথায় যেন একবার দেখেছিলুম, ওস্তাদ ফৈয়াজ খান বসে আছেন থার্ড ক্লাসের জগদ্দল ভিড়ের মাঝখানে। গুণীর কদর পৃথিবী করে না—হয়ত ভালোই। অন্ততঃ ভরত-নাট্যমের নর্তকীদের পয়সা হলে তাদের নাচ তিন বৎসরের ভিতরেই বন্ধ হয়ে যায় —গাদা গাদা ভাত, রসম্ আর মণ মণ ঘি খেয়ে তারা দেখতে না দেখতে রাগ্‌বি বলের ঢপ ধরে ফেলে,—নৃত্য তখন সে-দেহ-বর্তুল ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় খোঁজেন। কিন্তু তখনকার মত দুঃখ হয়েছিল এ-কথা অস্বীকার করি নে—কারণ তখনো আমার এ-সব গূঢ়তত্ত্ব জানা ছিল না।

"ততক্ষণে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছলুম মাদ্রাজ। আমার সঙ্গে ছিল বাড়ির পুরনো চাকর তারাপদ। মাল-বোঝাই

কুলির পিছনে যেতে যেতে তাকে জিজ্ঞেস করলুম যে প্ল্যাটফর্মে পঙ্কজমকে লক্ষ্য করেছে কি না—পুত্তুকোট্টাইয়ের নাচে সে আমার সঙ্গে গিয়েছিল তাই লক্ষ্য না করাটাই আশ্চর্যের বিষয় হত। তারাপদ বিচক্ষণ লোক। উত্তর শুনে বুঝলুম, সে প্রয়োজনেরও বেশী অনেক কিছু লক্ষ্য করেছে—এমন কি আমি যে রাত তিনটের সময় একবার গাড়ি থেকে নেমেছিলুম সেটাও তার চোখ এড়িয়ে যায়নি।

"বললুম, 'আমি হোটেলে যাচ্ছি। তুমি দেখে এসো তো এরা সব কোথায় ওঠে।'

'তারাপদ আমাকে ছেলেবেলা থেকেই চেনে—আমার জীবনের কিছুই তার কাছে অজানা ছিল না। তাই সে একটু আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকালো। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললো, 'আচ্ছা'।'

[রচনাটি অসম্পূর্ণ—মাসিক বসুমতী অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা ১৩৫৬]

নারীর অধিকার

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী এম-এ ডি-ফিল (অক্সন) "নারীর অধিকার" সম্বন্ধে একখানা রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রধান বক্তব্য নরনারীর অধিকার সমান হওয়া উচিত। আমাদেরও সেই মত। কিন্তু প্রবন্ধে লেখিকা এমন অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, যেগুলি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ একমত নহি। আমাদের মূল বক্তব্যে উপস্থিত হইবার পূর্বে দুই একটি সাধারণ আলোচনার প্রয়োজন।

প্রথমত লেখিকা বলিয়াছেন, "সেই (অর্থাৎ বৈদিক) সুবর্ণযোগে নরনারীর মধ্যে কোনরূপ সামাজিক বৈষম্য করা হইত না।" কিন্তু "বৈদিক যুগের পরবর্তী স্মৃতিযুগে নানা দিক হইতেই সমাজের দুরবস্থা উপস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নারীগণের পূর্ব গৌরবোজ্জ্বল অবস্থারও অবসান ঘটে।"

লেখিকার সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু প্রশ্ন, এই বৈদিক যুগের সুবর্ণকাল হইতে নারী যে হঠাৎ স্মৃতি-যুগের লৌহকালে পতিত হইল তাহার জন্য দায়ী কে? লেখিকার পরবর্তী বাক্য "স্মার্ত-সমাজপতিগণ নারীগণের জন্য নানাবিধ বেদ-বিরুদ্ধ আইন-কানুন প্রচলিত করেন এবং ফলে নারী সকল স্বাতন্ত্র্য, সকল ন্যায্য অধিকার হারাইয়া ক্রীতদাসীরূপে পরিণত হন।" কিন্তু স্মার্ত-সমাজপতিগণ কেন করিলেন? লেখিকা সেদিকে কোনো ইঙ্গিত করেন নাই। আমাদেরও আশ্চর্য বোধ হয়; কথা নাই, বার্তা নাই, স্ত্রী-পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করিতেছে, হঠাৎ পুরুষ তেরিয়া হইয়া স্ত্রীকে ক্রীতদাসী বানাইয়া কি চরমসুখ পাইল? লেখিকা দর্শন-

শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ; কারণ বিনা কার্য হয় না,—এই তত্ত্ব তো তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশী বোঝেন।

আমরা যদি বলি যে, নারীগণই দায়ী, তবে আমরা লিঙ্কনের কথাতেই সায় দিব। আমাদের বক্তব্য, নারী যে তাহার অধিকার হারাইল তাহার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক।

বৈদিক যুগে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল, তাহার কারণ যে পুরুষ তখন বেশী ন্যায়ধর্মী ছিল (ও স্মৃতি যুগে অধর্ম পথে চলিল) তাহা নহে। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে সমাজ যাযাবর অবস্থায়, শেষের দিকে প্রধানত কৃষি ও গো-পালন সংগঠনে প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় ব্যবস্থাতেই স্ত্রীলোকের অর্থ নৈতিক মূল্য পুরুষের অপেক্ষা বিশেষ ন্যূন নহে—প্রায় সমান সমান। সেই যাযাবর কৃষি সমাজ ব্যবস্থার চতুর্দিকে যে ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের রীতি-নীতি নির্মিত হইল সেইগুলি সেই কারণেই সমান সমান। গ্রামাঞ্চলে তাই আজও দেখিতে পাইবেন, চাষীর মেয়ে-বউয়ের অধিকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী—চাষীর মেয়ে গতর খাটায়, ছেলেও গতর খাটায়—মেয়ের উৎপাদনী শক্তি ধান ভানিতে, চাউল কুটিতে, গোয়াল ধুইতে ব্যয়িত হয়। তাহার মূল্য পুরুষের শস্যোৎপাদনের অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নহে। তাই চাষার মেয়ের বিবাহে পণ-প্রথা প্রায় নাই, কারণ বর বিবাহ করিয়া বাড়ীতে বোঝা লইয়া যাইতেছে না, লইয়া যাইতেছে উৎপাদনী শক্তি। মধ্যবিত্ত ঘরে কন্যা শুধু রন্ধন গৃহ সম্মার্জনই করে, তাহার অর্থ নৈতিক মূল্য চাষীর মেয়ের তুলনায় কম। চাষীর মেয়ের দাম যে কত বেশী তাহার আর একটি উদাহরণ দেই। মুসলমানী চাষী মেয়ে বিধবার বিবাহ হয়। যে চাষীর বউ ভালো খাটিতে পারে, তাহার স্বামী বিয়োগ হইলে অতি অনায়াসে পুনরায় বিবাহ হয় ; অপেক্ষাকৃত অলস বিধবার বিবাহে হাঙ্গামা বেশী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীতেও দেখিবেন যে মেয়ে মাস্টারী করিয়া টাকা রোজগার করে তাহাকে বৌদি, দাদা চোপা দিতে সাহস করেন না। অনেক সময়ে পরিবারে তাহার অধিকার সর্বাধিক।

আমাদের মনে হয়, বৈদিক যুগের শেষের দিকে অর্থাৎ স্মার্ত-যুগ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ব্যবস্থা জটিল হইতে আরম্ভ করিল। সে জটিল ব্যবস্থার ভিতর বুদ্ধির প্রবেশ লাভ ঘটিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজ্য চালনা, সেনা-সংগঠন, যুদ্ধবিদ্যা, নৌ ও জলনিকাশ আয়োজন ইত্যাদি ব্যাপারে 'গতরের' অপেক্ষা বুদ্ধির, সৃজনী শক্তির প্রয়োজন অধিক। যে পুরুষ সেই সমাজ পরিবর্তনের যুগে যত বেশী দান করিতে পারিল তাহার সম্মান ততই বাড়িল। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি হইল ;

সে সমাজে স্ত্রীলোককে গতর খাটাইবার আর প্রয়োজন নাই ; সে-সমাজে স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয়—অর্থ নৈতিক দৃষ্টিবিন্দু হইতে।

যদি বলি সেই অর্থ নৈতিক যুগ পরিবর্তনের সময়, নূতন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সময় স্ত্রীলোকের অবদান নগণ্য ছিল বলিয়া তাহাদের অর্থ নৈতিক মূল্য কমিল, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ও ধর্মের নানাবিধ অনুষ্ঠানে তাহার অধিকার হ্রাস পাইল, তবে কি ভুল বলা হয়? লেখিকা দার্শনিক। নিরপেক্ষ ভাবে কোনো বিত্তান্বেষণের জন্য চিত্তের যে উৎকর্ষের প্রয়োজন হয় তাহা তাঁহার আছে। তিনি যদি সমাজতত্ত্বের এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঙ্গটি দার্শনিক মননবৃত্তি দিয়া আলোচনা করিয়া নারী জাতিকে সারতত্ত্বটি বুঝাইয়া বলেন, তাহা হইলে আমাদের মহদুপকার হইবে, সন্দেহ নাই। পুরুষের দ্বারা আলোচিত এই সব বিষয় আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত শ্রদ্ধেয়া লেখিকা সতীদাহ, কৌলীন্য-প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "এইরূপ স্মার্ত ভট্টাচার্যগণের সম্পূর্ণ বেদ-বিরুদ্ধ, বৈষম্য-মূলক, অন্যায্য (আমরা অনার্যও বলিব—লেখিকা) বিধি-বিধানে নারীগণ ক্রমশ দুর্গতির চরম গর্ভে নিক্ষিপ্ত হন।"

কোনো সন্দেহ নাই ; কিন্তু প্রশ্ন, মাত্র পুরুষেরাই কি দায়ী? সতীদাহই ধরুন। পুরুষেরা তো বিধান দিলেন—না হয় মানিয়াই লইলাম, যদিও বুঝিতে পারিলাম না কেন যে এ হেন বিকট বিকৃত মনোবৃত্তি এই ভারতবর্ষের পুরুষেই সঞ্চারিত হইল—কিন্তু প্রশ্ন, নারী কি নারীকে এই হৃদয়হীন আচারে সাহায্য করে নাই, প্ররোচিত করে নাই? শোকাতুরা বিধবাকে হৃদয়হীনা নারীরা কি চতুর্দিকে ঘিরিয়া সতীদাহের ফলস্বরূপ নানা রকম স্বর্গ-সুখের বর্ণনা দেয় নাই? জ্বলন্ত চিতায় পতি-অনুগমন না করিলে যে কোন অজানা শতগুণে যন্ত্রণাদায়ক নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইবে তাহার বীভৎস চিত্র অঙ্কন করে নাই? পতি-অনুগমন করিলে যে সে কি 'ভয়ঙ্কর' প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া সমাজের আদর্শস্থলা হইয়া থাকিবে তাহার জাজ্বল্যমান—চিতাগ্নি অপেক্ষা সহস্র গুণে জাজ্বল্যমান চিত্র অঙ্কন করিয়া পতিশোকাতুরা বিগতপ্রজ্ঞা, হতবুদ্ধি বিরহবিধুরাকে প্রলুব্ধ করে নাই? হয়ত বিধবা সারা জীবন অজানা কোণে কাটাইয়াছে ; হঠাৎ লোকচক্ষুর সম্মুখে দেবীরূপে বিভাসিত হইবার লোভ তাহাকে প্রধানত দেখাইল কে? সেই রোরুদ্যমান অন্তপুরে স্মার্ত পণ্ডিতেরা তখন প্রধান নায়ক, না তাঁহাদের পত্নীরা, মাতারা? কে জানে?

নিরম্বু উপবাসের বিধান দিয়া যখন স্মার্ত পণ্ডিত গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন

তখন মাতা কি অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে প্রকাশ্যে অথবা গোপন জল দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন? এস্থলে তো গায়ের জোরের কথা উঠিতেছে না। পুরুষ যে পৈশাচিক আচারের সৃষ্টি করিল, নারী তাহাকে ধর্মজ্ঞানে স্বীকার করিল কেন? গোপনে জল দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত—'মঞ্জুলিকা'র মাতারা সব ছিলেন কোথায়? অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধকে গৌরী দানের সময় সর্বাবস্থায় কি মা-জননীরা আপত্তি জানাইয়াছিলেন, না সমাজের উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিবার প্রমত্ততা তাঁহাদের স্কন্ধেও ভূতের মত চাপিয়াছিল? না, অন্যান্য নারীর (পাঠিকা লক্ষ্য করুন, নারীই) গঞ্জনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কন্যাকে অন্তর্জলি বরের সঙ্গে সপ্তপদী হইবার জন্য অগ্রপদী করিলেন?

বিধবা বিবাহ প্রচেষ্টা নিষ্ফল করিল শুধু পুরুষ? "ওমা, কি ঘেন্না, ছ্যা ছ্যা," বলিয়াছে কাহারা—ঐক্যতানে, নির্মম ভাবে?

তাই শ্রদ্ধেয়া লেখিকাকে সবিনয় নিবেদন করি যে, শুধু পুরুষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে চলিবে না, আপন ভুল বুঝিয়া নারীকে নারীর বিরুদ্ধে সতর্ক হইতে হইবে, আপন ঘর প্রথম গুছাইতে হইবে। নারী আন্দোলন ব্যাপকভাবে করিতে হইলে হৃদয়হীন আচারের একসিকিউটিভ অফিসার নারীগণকে 'তুমিও ভালো, আমিও ভালো' বলিয়া আগাইয়া গেলে চলিবে না—মেয়েরাই line of supply কাটিবে—স্রেফ অভ্যাসজনিত হৃদয়হীনতা দ্বারা।

এখন মূল বক্তব্য—শ্রদ্ধেয়া লেখিকা কি বৈদিক যুগেই ফিরিয়া যাইতে চাহেন? বৈদিক যুগই কি বিংশ শতাব্দীতে আমাদের আদর্শ? শুনিয়াছি, বৈদিক যুগেও নাকি পিতা ও ভ্রাতাহীন অরক্ষণীয়াকে ঘৃণ্যবৃত্তিতে যোগদান করিতে হইত। তাহাকে বরদাস্ত করিতে হইবে? জানি ঋষি ঐ কু-ব্যবস্থার সমর্থন করেন নাই—কিন্তু আদর্শ বাছিবার সময় নিরঙ্কুশ আদর্শ লইব না কেন? আর এক বিপদ এই যে, বৈদিক যুগ বলিতে অথর্ব বেদের যুগও তো বোঝায়। সেখানে দেখি জ্বর হইলে রোগীকে 'দুই নদীর মোহনায় খড়ের ঘরে শোয়াইয়া খাটে ব্যাঙ বাঁধিয়া মন্ত্রোচ্চারণের ব্যবস্থা—কুইনিনের উল্লেখ নাই। লেখিকা কি সত্যই এই চিকিৎসায় ফিরিয়া যাইতে চাহেন? স্বামী অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইলে সে নারীকে ধ্বংস করিবার যে কৌশল বর্ণিত হইয়াছে (ভাগ্যিস, তাহা ফলপ্রসূ নয়) শ্রদ্ধেয়া লেখিকা কি বিংশ শতাব্দীর নারীকে তাহাই বরণীয় বলিয়া উপস্থাপিত করেন? বিবাহ-চ্ছেদ বা ডিভোর্সের দিকে অগ্রসর হওয়াই কি অধিকতর যুক্তিযুক্ত নহে? অরক্ষণীয়ার বর লাভের জন্য যে প্রজাপতিমন্ত্র শিখানো হইতেছে, এ যুগে তাহাই আমাদের চরম আদর্শ?

আমাদের তো মনে হয়, কি স্মার্ত, কি বৈদিক, সর্বশাস্ত্র মাথায় থাকুন। নারীকে অগ্রসর হইতে হইবে যুগ যুগ সঞ্চিত নিরপেক্ষ অর্থনীতি, রাজনীতি—বিশেষ করিয়া সমাজ-নীতির—প্রসূত জ্ঞানের সাহায্যে—কোনো 'সুবর্ণ-বৈদিক যুগে' ফিরিয়া যাইবার জন্য নহে, কোনো রঘুনন্দনকে ভুল বলিয়া প্রমাণ করিয়া নহে—তাঁহাকে ও সে যুগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া।

আমাদের মত সাধারণ কোনো নারী বৈদিক যুগে ফিরিয়া যাইতে চাহিলে আমি কোনো উচ্চবাচ্য করিতাম না—কারণ যদিও তাহা স্বীকার করিতাম না তবু সে-নারীর মনস্তত্ত্ব বুঝিতে পারিতাম। কারণ দেখিয়াছি বহু আন্দোলন গোড়ার দিকে 'ধার্মিক' বা 'পশ্চাদমুখী' হয়—অর্থাৎ কোনো কাল্পনিক সুবর্ণযুগে ফিরিয়া যাইতে চাহে। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম যে স্বাধীনতার আন্দোলন হয় তাহাতে বাঙলাদেশে 'মা কালী'কে লইয়া দাপাদাপি করা হইয়াছিল—আজ আমরা আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন 'মা কালী'কে বাদ দিয়াই করিয়া থাকি ('মা কালী' নারী; তাঁহাকে যে স্বাধীনতা আন্দোলনে আজ পুরুষ সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিয়াছে তাহার জন্য আমরা নারীরা দুঃখিত নই)। কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতায় যে আন্দোলন হইয়া গেল, তাহাতে 'মা-কালী'কে আবাহন করা হয় নাই। মুসলিম লীগ নূতন আন্দোলন, তাই সে আন্দোলন ধর্মপ্রধান। ইসলামের সহিত সুপরিচিতা নহি বলিয়া মুসলমান ভ্রাতারা কোন্ সুবর্ণ যুগে যাইতে চাহেন জানি না, কিন্তু ইতিহাস স্মরণ করিয়া ভরসা রাখি তাঁহারাও একদিন ধর্মালোচনা রাজনীতি হইতে বাদ দিয়া 'বাঙলা কথা' বলিতে শিখিবেন—অর্থাৎ স্পেডকে স্পেড বলিবেন। লেখিকা দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা—তিনি স্থির বিচারে আমাদিগকে পথ দেখাইবেন। কোনো দার্শনিক কি সত্যই কোনো বিশেষ সুবর্ণ-যুগে বিশ্বাস করেন?

বঙ্কিম একদিন বলিয়াছিলেন, 'যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র।' আমরা বলি যাহা বৈদিক যুগ তাহাই কাম্য নহে, যাহা কাম্য তাহাই বৈদিক যুগ। যদি ভবিষ্যৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের নারী ব্যবস্থা আমাদের মনঃপূত না হয়, কিন্তু চৌকশবৈদিক, তবুও বেদচতুষ্টয়কে পরম শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করিয়া লেখিকার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিব,—

If you Vedas come, with you ; if you do not come inspite of you.

[সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় ডঃ রমা চৌধুরীর "নারীর অধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিত। নিবন্ধটি লেখকের স্বনামে প্রকাশিত হয় নাই। 'ইন্দ্রাণী সরকার' এই ছদ্মনাম লেখক ব্যবহার করেন।]

ঘরে বাইরে শ্রমিক নীতি

শ্রমিক দল সংখ্যাগৌরবের বিজয়শঙ্খ বাজাইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সে শঙ্খরবের প্রতিধ্বনি সর্বদেশে মুখরিত হইয়াছে। কেহ বা ভয় পাইয়াছেন, কেহ ভরসা পাইয়াছেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, আমাদের সকলের অগোচরে, এমন কি, স্বয়ং ইংরেজের অজানাতে ইংলণ্ডে রাতারাতি রাজনৈতিক বিপ্লব নিঃশব্দে ঘটিয়া গেল। ইংরেজের স্বভাবই এই রকম—তাহার বাম হস্তের আচরণ দক্ষিণ হস্ত জানিতে পারে না। এ স্থলে আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বয়ং বামহস্তই জানিত না যে সে কি করিয়া বসিয়াছে।

গৃহে যখন এ রকম বিপর্যয় বিপ্লব ঘটিল, তখন বাইরেও কিঞ্চিৎ হইবে, এই রকম ভয় বা আশা অনেকেই পোষণ করিতেছেন। আমাদেরও দুশ্চিন্তা বাহির লইয়া।

প্রশ্ন এই, শ্রমিক দলের প্রথম কার্য কি হইবে। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যে সব নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম পূর্ববর্তী শ্রমিক দল না করিয়া অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন সেগুলি তাঁহারা এইবার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইবেনই।

ইতঃপূর্বে বহু সদুদ্দেশ্য লইয়া শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলী কর্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টা, তাঁহাদের আদেশ-উপদেশ পদে পদে খণ্ডিত করিয়াছিল প্রগতি পরিপন্থী, শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধী আমলারা। এতদিন ধরিয়া তাহারা যে পদ্ধতিতে রাজ্য শাসন করিয়াছিল, তাহার উল্টা করিলে তাহাদের পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় ও তাহাদের আত্মীয়স্বজন..গোষ্ঠীবর্গের স্বার্থহানি হয়। দেশে-বিদেশে কাহারোই বুঝিতে অসুবিধা হয় নাই যে, ইহাদের নবীন তিলকটি শুধু যে অনভ্যাসের তাহা নয়, চন্দনে বিছুটি মাখানোও বটে।

তবে প্রশ্ন, ইহাদিগকে পদচ্যুত করা হইল না কেন? সে সাহস শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলীর ছিল না; অন্তরায়ও বিস্তর ছিল। প্রথমতঃ, আমলাতন্ত্র যে পাকাপোক্ত শতাব্দ-বৃদ্ধ আইনকানুন নজীর রেওয়াজের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা নূতন আইন না গড়িয়া ভাঙা অসম্ভব; দ্বিতীয়তঃ, শক্তি গ্রহণের প্রথমাবস্থায় তাহা করিতে গেলে প্রগতিপন্থীরা তারস্বরে সে আইনের এমনি কদর্থ করিত যে, দেশের পাঁচজন ভাবিত যে, শ্রমিক দলের নেতারা অধর্ম বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া প্রাচীন আমলাদের তাড়াইতেছেন—সেই সব আপন আপন আত্মীয়স্বজনকে দিবার জন্য। এই কুৎসা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য শ্রমিক মন্ত্রীরা অনেক সময় জানিয়া শুনিয়াও শ্রমিক বিরোধী কর্মচারীদের গাত্রে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

দেশের ভিতরে তো এই। বিদেশে যে সব কনসুলেট, লিগেশন, এম্বেসি

সেগুলি ধনপতিদের আত্মীয়স্বজনে পরিপূর্ণ। তাহারা রাজার হালে থাকে, তাহাদের প্রধান কর্ম সরকারী অর্থে, শ্রমিক দলের অনর্থে ভোজ দেওয়া ও ভোজ খাওয়া। তাহাদের অধিকাংশ অভিজাত শ্রেণীর; শ্রমিক দলের মুখপাত্র হইতে তাহাদের যেমন লজ্জা, তেমনি ঘৃণা। তাহারা পদে পদে শ্রমিক মন্ত্রিদলের মতামত উপেক্ষা করিয়া পুরাতন নীতি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে ও রাজনৈতিক ধড়িবাজিতে তাহারা বংশানুক্রমে পরিপক্ক বলিয়া দেশের কর্তাদের আদেশ-উপদেশ যে অর্বাচীনতানিবন্ধন, তাহা বিদেশে সপ্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছে। শ্রমিক দলকে অপদস্থ করিতে ইহারাই সর্বাপেক্ষা উদগ্রীব ও অকুতোভয়। ইহাদের পৃষ্ঠে সম্মার্জনী সঞ্চালন সুকঠিন, প্রায় অসম্ভব।

এই দেশী-বিদেশী আমলাদের পিছনে রহিয়াছে রক্ষণশীল ধনপতির দল। ইহারা ব্যাঙ্ক, কারবার, ধর্মসঙ্ঘ (চার্চ), বিশ্ববিদ্যালয়, আইন আদালত, প্রেস ইত্যাদির শক্তি-কুঞ্চিকা লইয়া বসিয়া আছে। শ্রমিক দল ইহাদের এক ধাক্কায় সরাইবার চেষ্টা করে নাই। ইহাদের সহযোগে রাজ্য-চালনা করিয়া ধীরে ধীরে ইহাদের রাজনৈতিক শক্তি কমাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে হস্ত অপেক্ষা আম্র বৃহত্তর হইয়া পড়াতে সফল হয় নাই। পূর্বে প্রকাশিত "পরাজিত জর্মনী" প্রবন্ধেও উল্লেখ করিয়াছি যে, বাইমার রিপাবলিকের সোশাল ডিমোক্রেট সভ্যগণ শক্তি পাইয়াও এ-সাহস সঞ্চয় করিতে পারেন নাই—য়ুঙ্কার, সামরিক কর্তা-ব্যক্তি, ধনপতিগণের রাজনৈতিক শক্তি কমাইবার চেষ্টা করেন নাই। কংগ্রেস যখন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করেন, তখন তাঁহারাও এই বিপদে পড়িয়াছিলেন।

এটলি সাহেব ইতিমধ্যেই কয়েকটি মোক্ষম কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন;— প্রথমতঃ, নূতন মন্ত্রিসভায় অ-প্রাচীনদিগকে স্থান দেওয়া হইবে। অর্থাৎ প্রাচীন শ্রমিকপন্থীদের এতটা সাহস নাই যে, রক্ষণশীলদের নির্মমভাবে আঘাত করিতে পারে। তাহাদের চক্ষুলজ্জা বেশী ও হস্তকণ্ডুয়ন কম। আমরাও বলি, শবদাহে তরুণদেরই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, যদি তখন শবদেহ উচ্চবাচ্য করে অর্থাৎ মৃতদেহ ভূতগ্রস্ত হয়, তবে 'শ্রমিক দল রক্ষণশীল দলের বিরোধিতার জন্য প্রস্তুত আছেন।' এই কথাটিই ট্রেড ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট জর্জ আইসাক সাহেব আরো লবণ-লঙ্কা মিশাইয়া হুঙ্কার দিয়া বলিয়াছেন, "পূর্বের ন্যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা আর নয়, এইবার দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রগামী হইবে।" বাঙলা কথায় 'যুদ্ধং দেহি।'

তৃতীয়তঃ, খবর আসিয়াছে যে, কনসুলেট, লিগেশন, এম্বেসিগুলির সংস্কার করা হইবে। এতদ্ব্যতীত নানাবিধ খবর আসিয়াছে, তবে সেগুলি সরকারী শীলমোহর-

যুক্ত নয়—তন্মধ্যে প্রধান এই যে, কতকগুলি মোটা কারবার অচিরাৎ রাষ্ট্রধন করিয়া ফেলা হইবে।

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু প্রশ্ন এই ; ধনপতিরা কি এতই নির্জীব যে, চতুর্দিকে বিস্তৃত তাহাদের শক্তিধারাগুলিকে একত্রীভূত করিয়া প্লাবনের দ্বারা শ্রমিকদিগকে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন না? ইহার উত্তর কেহই আপ্তবাক্যের ন্যায় নির্ভুল দিতে পারিবেন না, আমরাও অক্ষম। তবে ভাগ্যফল গণনাকালে যেমন কোনরকম গ্যারান্টি কেহ চাহে না, আমাদের নিকটও আশা করি কেহ নির্ভুল ফল গণনা আশা করিবেন না।

মনে হইতেছে বিনা বিপ্লবে শ্রমিক দল এত বড় শ্রেণীস্বার্থবিরোধী কার্যপরিক্রমা সফল করিতে পারিবেন না। অথচ বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাতের সম্ভাবনাও তো রহিয়াছে এবং দেশের অভ্যন্তরবর্তী কর্মকলাপে এই সব বর্বর রক্তপাত নীতি তো ইংরেজ বহুকাল হইল বর্জন করিয়াছে। তবে উপায় কি?

উপায় আছে ও সেইখানেই আমাদের মত গরীব ভারতবাসীর ভয়। আমার মনে হয়, ধনপতিদিগকে দেশে ধনক্ষয় ও শক্তিক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে বিদেশে। বেদে কথিত আছে, যম পিতৃপুরুষের প্রথম যিনি স্বর্গ অধিকার করেন। মনে হয় পরবর্তী যুগে ইন্দ্র তাহাকে খেসারৎ হিসাবে নরক দান করেন।

অস্ট্রেলিয়া, কানাডা গিয়াছে। বিধ্বস্ত, বিধ্বংস ইউরোপে মার্কিন প্রবেশাধিকার চাহিতেছে। চীনের বাণিজ্যাধিকারও নাকি তাহাদিগকেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে ইংরেজ ধনপতিরা যায় কোথায়?

তাই ভয় হইতেছে শ্রমিক দল নির্বিকার চিত্তে ভারতবর্ষকে ডাকিনীর হস্তে সমর্পণ করিবেন। ভুরি ভুরি প্রমাণ দিবার উপায় নাই—যদিও পূর্বতন শ্রমিক মন্ত্রিদল ভারতবর্ষের প্রতি কি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই ভুলেন নাই! তবে একটি সামান্য নজীর নিবেদন করিতেছি। বর্মা বিজয়ের পর সেখানে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার যে নূতন পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে বর্মীরা পুনরায় মূষিক হইবে। এই প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় স্বাক্ষর আছে মোটা মোটা অক্ষরে, কট্টরদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া শ্রমিক নেতাদেরও।

আনন্দবাজার পত্রিকা ৩.৮.১৯৪৫

অফগান ইতিহাসের মদনাঙ্ক

যে অঙ্কটি আমি লিখিতেছি তাহার মূল ঘটনাগুলি যে কোনো আফগান ইতিহাসে পাওয়া যায় কিন্তু পশ্চাতে যে দাবাবড়ের চাল চলিয়াছিল, তাহা আমি

কাবুলে মোল্লা মৌলবী ও রাজপরিবারের লোকের কাছ হইতে সংগ্রহ করি। যাঁহারা মোগল বাদশাহ অওরঙ্গজেবের পরবর্তী ফররুখ-সিয়র, নিকু সিয়র, রফি-উদদৌলা, রফি উদ-দরজাত, মুহম্মদ শাহ প্রভৃতি বাদশাহের দ্রুত পরিবর্তনশীল ও ঘটনাময় জীবন লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, সে যুগের ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পরেই মনে হয়, ইতিহাস পড়িতেছি না, পড়িতেছি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর রোমান্টিক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আফগানিস্থানের আমীর ছিলেন হবীবউল্লা খান। তাঁহার ভ্রাতার নাম নসরউল্লা খান ও দুই পুত্রের নাম যথাক্রমে ইনায়েতউল্লা খান ও আমীর (পরে) আমানউল্লা খান। পাঠক ভয় পাইবেন না; উপস্থিত এই কয়টি নাম স্মরণ করিয়া রাখিলেই আফগান ইতিহাসের প্রধান নায়কদের ভাগ্য-চক্রগতি লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

হবীবউল্লার ভ্রাতা নসরউল্লা দেশের মোল্লাদের এমনি প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র ইনায়েতউল্লা তাঁহার মৃত্যুর পর আমীর হইবেন এই ঘোষণা হবীবউল্লা করিতে সাহস পান নাই। বরঞ্চ দুই ভ্রাতাতে এই নিষ্পত্তিই হইয়াছিল যে, হবীবউল্লার মৃত্যুর পর নসরউল্লা আমীর হইবেন ও তাঁহার মৃত্যুর পর আমীর হইবেন ইনায়েতউল্লা। এই নিষ্পত্তি দৃঢ়তর করিবার বাসনায় হবীবউল্লা-নসরউল্লায় মীমাংসা করিলেন যে, ইনায়েতউল্লা নসরউল্লার কন্যাকে বিবাহ করিবেন। হবীব-উল্লা মনে মনে বিচার করিলেন যে, আর যাহাই হউক, নসরউল্লা জামাতাকে হত্যা করিয়া 'দামাদ-কুশ' (জামাতা-হন্তা) আখ্যায় কলঙ্কিত হইতে চাহিবেন না। ঐতিহাসিকদের স্মরণ থাকিতে পারে, জয়পুরের রাজা অজিত সিং যখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া জামাতা দিল্লীর বাদশাহ ফররুখ-সিয়রকে নিহত করেন, তখন দিল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতার 'দামাদ-কুশ' 'দামাদ-কুশ' চিৎকারে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রাস্তার বালকেরা পর্যন্ত নির্ভয়ে অজিত সিংহের পাল্কির দুই পাশে ছুটিয়া চলিত ও সিপাই বরকন্দাজের তম্বি-তম্বা উপেক্ষা করিয়া তারস্বরে ঐক্যতানে 'দামাদ-কুশ' 'দামাদ-কুশ' বলিয়া চিৎকার করিত। এমন কি জয়পুরেও তিনি এতই অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এক বিশেষ পত্র দ্বারা তিনি জামাতা হত্যার কারণ দর্শাইয়া সাফাই গাহিয়াছিলেন। পত্রখানা অধুনা বোম্বায়ের এক ঐতিহাসিক ত্রৈমাসিকে বাহির হইয়াছে।

হবীবউল্লা-নসরউল্লা-ইনায়েতউল্লা সকলেই এ চুক্তিতে অল্লাধিক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইলেন। অসন্তুষ্ট হইলেন মাতৃহীন ইনায়েতউল্লার বিমাতা, আমানউল্লার মাতা, হবীবউল্লার দ্বিতীয় মহিষী। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হইতে পারে, কিন্তু তিনিও

দাবার ঘুঁটিগুলির দিকে কড়া নজর রাখিয়া স্থির করিলেন, নসরউল্লা, এনায়েত-উল্লার মত দুই প্রধান ঘুঁটিকে মারিয়া তাঁহার নিজের বড়ে-পুত্র আমানউল্লাকে দিয়া তিনি রাজা (হবীবউল্লাকে) মাত করিবেন।

এমন সময় কাবুলের অতি উচ্চ খানদানী বংশের মুহম্মদ তর্জী সিরিয়া-নির্বাসন হইতে দেশে ফিরিলেন। সঙ্গে তাঁহার পরমাসুন্দরী তিন কন্যা, কাওকাব, সুরাইয়া ও বীবী খুর্দ। ইঁহারা দেশ-বিদেশ দেখিয়াছেন, লেখাপড়া জানেন, উত্তম বেশভূষা পরিধান করিতে পারেন ; ইঁহাদের উদয়ে কাবুল-কন্যাদের মুখ অতি ম্লান, কুৎসিত, 'অমার্জিত' বা 'অনকলচরড' (অজ জঙ্গল অমদেহ—যেন 'জঙ্গলী') মনে হইতে লাগিল।

হবীবউল্লা রাজধানীতে ছিলেন না। আমানউল্লার মাতা—যদিও আসলে দ্বিতীয়া মহিষী, কিন্তু ইনায়েতউল্লার মাতার মৃত্যুতে প্রধানা মহিষী হইয়াছেন—এক বিরাট ভোজের বন্দোবস্ত করিলেন। প্রধান অতিথি তর্জী পরিবার, কন্যাগণ-সহ। রাণী অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনকে হুকুম দিলেন যে, ইনায়েতউল্লাকে কাওকাবের প্রতি যে কোন প্রকারে আকৃষ্ট করিতেই হইবে। বিপুল রাজপ্রাসাদের আনাচে-কানাচে দুই একটি কামরা বিশেষ করিয়া খালি রাখা হইল। সেখানে যেন কেহ হঠাৎ গিয়া উপস্থিত না হয়।

খানাপিনা চলিল, গানবাজনায় রাজবাড়ি সরগরম। রাণী স্বয়ং ইনায়েত-উল্লাকে কাওকাবের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন, আর অতি সন্তর্পণে কানে কানে কাওকাবকে বলিলেন, "ইনিই যুবরাজ (মুঈন উস-সুলতানে), আফগানিস্থানের ভবিষ্যৎ আমীর।" কাওকাব ইঙ্গিতটা হয়ত বুঝিয়াছিলেন। অসম্ভব নহে। তা ছাড়া শঙ্করাচার্যও তো বলিয়াছেন, তরুণ তরুণীর রক্ত অনুসন্ধান করে। প্ল্যানটা ঠিক উতরাইয়া গেল। বিশাল রাজপ্রাসাদে ঘুরিতে ঘুরিতে ইনায়েত কাওকাব পুরীর এক নিভৃত-কক্ষে বিশ্রম্ভালাপে রত হইলেন। ইনায়েত ভাবিলেন, স্বেচ্ছায় ঐ কক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন (ধর্মশাস্ত্রে যাহাকে বলে ফ্রীডম অব উইল), রাণী জানিতেন তাঁহার জালে ঠিক মাছ ধরিয়াছে (ধর্মশাস্ত্রে যাহাকে বলে প্ল্যানড্ ডেস্টিনি)।

প্ল্যান মাফিকই রাণী হঠাৎ যেন লক্ষ্য না করিয়া, সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। তরুণ-তরুণী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া সম্মানার্থে নত মস্তকে দাঁড়াইলেন। রাণী সোহাগ মাখিয়া অমিয়া ছানিয়া সপত্নী-পুত্রকে বলিলেন, "বাচ্চা, তোমার মাতা নেই, আমিই তোমার মাতা। তোমার সুখ-দুঃখের কথা আমাকে বলিবে না তো কাহাকে ? তোমার বিবাহের ভার তো আমার স্কন্ধেই। এই কন্যা যদি তোমার

মন হরণ করিয়া থাকে তবে এবম্প্রকার ব্রীড়াবনত হইতেছ কেন ? তর্জী-কন্যার পাণিগ্রহণ অতীব শ্লাঘনীয়। তোমার হৃদয় কি বলে ?"

হৃদয় আর কি বলিবে ? ইনায়েত তখন কাওকাব ও রাণীর দুই জালে বদ্ধ মক্ষিকা।

হৃদয় যাহা বলে বলুক। মুখে কি বলিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কাবুলের চারণরা পঞ্চমুখ। কেহ বলেন, তিনি মৌনতা দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কেহ বলেন, মৃদু আপত্তি জানাইয়াছিলেন, কেন না জানিতেন যে, নসর-কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ প্রায় স্থির ; কেহ বলেন, মৃদুস্বরে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কেন না পূর্বমুহূর্তেই নাকি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া প্রেম নিবেদন করিয়া বসিয়াছিলেন—হয়ত ভাবিয়াছিলেন প্রেম আর বিবাহ তো ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপীড়া—পরমুহূর্তেই এড়াইবেন কি করিয়া ; কেহ বলেন, শুধু 'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ' করিয়াছিলেন তাহা হইতে 'হস্ত-নীস্ত' ('হাঁ'-'না'—যে কথা হইতে বাঙলা 'হেস্ত-নেস্ত' আসিয়াছে) কিছুই বুঝিবার উপায় ছিল না। কেহ বলেন, তিনি কিছু প্রকাশ করিবার পূর্বেই রাণী কক্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ কাবুল চারণবর্গের পঞ্চমুখ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী বলে।

অর্থাৎ সেই অবস্থায় রাজা হউক, রাজপুত্র হউক, প্রজা হউক, দাস হউক, সাধারণ লোক গুরুজনের সম্মুখে যাহা করিয়া বা বলিয়া থাকে, ইনায়েত তাহাই করিয়াছিলেন।

কিন্তু কি বলিয়াছিলেন, তাহা জানিবার যত না প্রয়োজন, তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, রাণী-মা মজলিসের সম্মুখে গিয়া সে বলার কি অর্থ প্রকাশ করিলেন। জালবদ্ধ ভারতবাসী মাত্রই জানে, আমরা ক্ষীণকণ্ঠে দেশে আবেদন ক্রন্দন করিয়া কি বলি না বলি তাহার উপর নির্ভর করিয়া নূন, মুদলেয়ার বিশ্বের মজলিসে নিজেদের ভাষণ তৈয়ার করেন না। তাঁহাদের কণ্ঠ রাজকণ্ঠ। সে প্ল্যানে খোলে, প্ল্যানে বন্ধ হয়।

রাণীর কণ্ঠ মজলিসের আনন্দোল্লাস ধ্বনি ক্ষণিকের মত ছাপাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল, "আজ পরম আনন্দের দিন। যুবরাজ ইনায়েত তর্জী-কন্যা-কাওকাবকে বিবাহ করিবেন। খানা-মজলিস রাত্রি দুইটার সময় ভাঙিবার কথা ছিল ; তাহা বাতিল। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আনন্দোৎসব চলিবে। আজ রাত্রেই আমি কন্যাপক্ষকে প্রস্তাব পাঠাইতেছি।"

মজলিসের ঝাড়বাতি দ্বিগুণ আভায় জ্বলিয়া উঠিল। চতুর্দিকে হর্ষধ্বনি, আনন্দোচ্ছ্বাস। দাসদাসী ছুটিল বিবাহ প্রস্তাবের 'তত্ত্বের' তত্ত্বতাবাস করিতে।

সব কিছুই রাজবাড়িতে সেই দ্বিপ্রহর রাত্রে মৌজুদ পাওয়া গেল ? আশ্চর্য হইবার সাহস কাহার ?

তর্জী হাতে স্বর্গ পাইলেন ; কাওকাব হৃদয় স্বর্গ পাইয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাণী হবীবউল্লার নিকট 'সুসংবাদ' জানাইয়া দূত পাঠাইলেন। মাতা ও রাজমহিষীরূপে তিনি ইনায়েতউল্লার হৃদয়ের গতি কোন দিকে জানিতে পারিয়া তর্জীকন্যা কাওকাবের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। প্রগতিশীল আফগানিস্থানের ভবিষ্যৎ রাজমহিষী সুশিক্ষিতা হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। কাবুলে এমন দ্বিতীয় বধূ নাই যিনি রাজপ্রাসাদ অলঙ্কৃত করিতে পারেন। প্রাথমিক মঙ্গলানুষ্ঠান খোদাতালার মেহেরবাণীতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহারাজ অতিসত্বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 'আকদ-রসুমাতের (আইনত পূর্ণ বিবাহ) দিবস ধার্য করিয়া পৌরজনের হর্ষবর্ধন করুন।

হবীবউল্লা পত্র পাইয়া ক্ষিপ্ত হইলেন, কিন্তু রাগান্ধ হইলেন না। আর কেহ না হউক, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, মূর্খ ইনায়েত নসরকন্যাকে হারায় নাই, হারাইতে বসিয়াছে রাজসিংহাসন। কিন্তু হবীবউল্লা যদিও অত্যন্ত অলস ও কামুক ছিলেন, তবু বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না যে, সমস্ত ষড়যন্ত্রের পশ্চাতে রহিয়াছেন মহিষী। বিমাতার এত প্রেম তো সহজে বিশ্বাস হয় না। হবীবউল্লা কখনো পূর্ববঙ্গে আসেন নাই ; কিন্তু প্রবাদটি জানিতেন,

সতীন মা'র কথাগুলি
মধুরসের বাণী
তলা দিয়ে গুঁড়ি কাটেন
উপর থেকে পানি।

ক্রোধ সম্বরণ করিয়া হবীউল্লা অতি কমনীয় নমনীয় উত্তর দিলেন। খোদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে মহিষী শুভবুদ্ধিপ্রণোদিতা হইয়া এই বিবাহ স্থির করিয়াছেন। তর্জীকন্যা কাওকাব যে সর্বাংশে রূপগুণসম্পন্না তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু শুধু কাওকাব কেন, সুরাইয়াও সর্বাংশে কাওকাবের ন্যায় সুশিক্ষিতা, সুরূপা, সুমার্জিতা। দ্বিতীয় পুত্র আমানউল্লাই বা খাস কাবুলী জংলী বিবাহ করিবেন কেন ? অতএব তিনি মহিষীর সৎদৃষ্টান্ত অনুকরণে সুরাইয়ার সঙ্গে আমানউল্লার বিবাহ স্থির করিয়া সেই মর্মে তর্জীর নিকট প্রস্তাব এই পত্র লিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠাইয়া দিয়াছেন। সত্বর তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া—ইত্যাদি ইত্যাদি।

হবীবউল্লা জানিতেন রাণীর মতলব, এনায়েতের স্কন্ধে কাওকাবকে চাপাইয়া

দিয়া, আমানউল্লার সঙ্গে নসরকন্যার বিবাহ দিবার। তাহা হইলে নসরউল্লার মৃত্যুর পর আমানের আমীর হইবার সম্ভাবনা অনেকটা বাড়িয়া যায়। হবীবউল্লা সে পথ বন্ধ করিবার জন্য আমানের স্কন্ধে সুরাইয়াকে চাপাইলেন। যে-রাজমহিষী কাওকাবের বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার প্রশংসায় শতমুখ তিনি কোন লজ্জায় সুরাইয়াকে ঠেকাইবেন। বিশেষত যখন চিহলসতুন হইতে বাগইবালা পর্যন্ত সুবে কাবুল জানে যে সুরাইয়া কাওকাব হইতে উৎকৃষ্টা বই নিকৃষ্টা নহেন।

রাণীর মস্তকে বজ্রাঘাত। বড়ের কিস্তিতে রাজাকে মাত করিতে গিয়া তিনি যে বিপদগ্রস্ত হইলেন। হবীবউল্লাকে অভিসম্পাত দিলেন, 'নসরকন্যাকে তুই পেলিনি, আম্মো পেলুম না। তবু মন্দের ভালো, নসরউল্লার কাছে এখন ইনায়েত আমান দুইই বরাবর। ইনায়েতের অঙ্ক এখন আর নসরকন্যা সীসায় পক্ষপাতে পুষ্ট হইবে না তো!—সেই মন্দের ভালো।'

এখন কি কর্তব্য। রাণী মন্ত্রণা করিলেন, এখন দ্রষ্টব্য যে হবীবউল্লা যেন এমন সময় মারা যান, যে-সময় আমানউল্লার শুভযোগ আছে—ফলিত জ্যোতিষার্থে নহে, এই অর্থে যে তখন যেন নসর, ইনায়েত কেহই রাজধানীতে না থাকেন। কিন্তু মানুষ মরে ভগবদিচ্ছায়—সে আমীরই হউক, আর ফকীরই হউক। অতএব হবীবউল্লাকে হত্যা করিতে হইবে—গুপ্তহত্যা।

রাণী হবীবউল্লার দুশমনদের ডাকিয়া পাঠাইলেন।

কিন্তু এইখানে আফগান ইতিহাসের দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হয়। সে অঙ্ক লিখিবেন—কৌটিল্য, কারণ সে অঙ্ক নির্জলা রাজনীতি, অর্থনীতি; আমি মদন-পর্যায় বাৎস্যায়নের হইয়া লিখিয়া দিলাম।

আমি শুধু ভাবি যে তর্জী এই গজকচ্ছপ যুদ্ধে কী বিমলানন্দই না উপভোগ করিয়াছিলেন। ডবল কন্যার জন্য রাতারাতি ডবল রাজপুত্র!

'দেশ', পূজাসংখ্যা, ১৩. ১০. ১৯৪৫

বেলজেন, স্টেটস্‌মেন

১

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি কারাদমদমম্
শ্বেতাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম।

(পরিবর্তিত মহাভারত—বকের প্রশ্নে যুধিষ্ঠির)

২৭শে অক্টোবরের স্টেটসমেন কাগজের সম্পাদকীয় বেলজেন ও এই দেশের জেলের তুলনা করিতে গিয়া নানা কথা বলিয়াছেন। সেগুলির উত্তর 'আনন্দ-

বাজারে' প্রকাশিত হইয়াছে। বেলজেন ও ভারতীয় জেলে তুলনা করা যায় কিনা, বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তাহাই দ্রষ্টব্য।

তৎপূর্বে দুই একটি কথা অবতরণিকা হিসাবে বলিয়া লইলে ভালো হয়। প্রথমতঃ, বেলজেন, বুখেনবাল্ট, ওরানিয়েনবুর্গ, ডাশাওয়ের সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় নাই—স্টেটসমেন সম্পাদকেরও নাই। আলিপুর, দমদমা, লাহোর, লালকেল্লা চিনিবার সৌভাগ্য আমাদের অনেকেরই হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। স্বয়ং বিশ্বকবি, পরম খানদানি—কত যে খানদানি তাহার প্রমাণ কবির 'স্যর' উপাধি, তাঁহার পিতামহের 'প্রিন্স' উপাধি স্টেটসমেনের জাতভাইদেরই দেওয়া—চিরটা কাল কাটাইলেন পদ্মার বিশাল বক্ষে ও শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত প্রান্তরে। কিন্তু তিনি পর্যন্ত কারারুদ্ধদের প্রতি উল্লেখ করিয়া গাইলেন,

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন ইত্যাদি

(অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার)

ইংরাজ যাহা করিতে পারেন নাই—রবীন্দ্রনাথ তাহাও করিয়াছেন। আলিপুরের জেলখানাকেও তাঁহার কাব্যে অমর করিয়া গিয়াছেন;—শুনছি নাকি বাঙলা দেশের গান হাসি সব ঠেলে / কুলুপ মেরে করছে আটক আলিপুরের জেলে।

* * *

টুটল কত বিজয় তোরণ লুটলো প্রাসাদ চুড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হল গুঁড়ো
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে,
তখনো এই বিশ্বদুলাল ফুলের সবুর সবে।

(পূরবী)

স্টেটসমেনের খুব সম্ভব সব এই জায়গার সঙ্গে পরিচয় নাই। যাঁহারা এই সব জায়গায় স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় গমনাগমন করেন, তাঁহাদের সঙ্গেও বোধ করি, স্টেটসমেনের কোন যোগাযোগ নাই। তিনি ফিরপোতে খান, পেলিটিতে নাচেন; সেসব জায়গায় যাবার মত অর্থ ও ইচ্ছা রাজবন্দীদের থাকার কথা নহে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে উভয়ের যোগাযোগ যদি কখনো হয় তবুও ধরিয়া লইতে পারি যে, স্টেটসমেন তখন পরম উৎসাহে জেলের নিদারুণ কাহিনী আকণ্ঠ পান করেন না। এদিকে সরকারও জেলে যে-সব অত্যাচার অনাচার হইতেছে সেসব অভিযোগের কোন উত্তর দেন নাই—স্বয়ং 'স্টেটসমেন' ও তাঁহার 'স্টেট' অথবা

কূটবুদ্ধি দ্বারা তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তবেই প্রশ্ন, স্টেটসমেন বিচার করিতেছেন কি প্রকারে? তাহার আভাসও তিনি দিয়াছেন; ভাবটা এই, ইংরেজের যে জাজ্বল্যমান আদর্শবাদের ইতিহাস রহিয়াছে তাহা হইতে কিছুতেই কল্পনা করা যায় না যে, ভারতের জেলগুলি বেলজেনের দ্বিতীয় সংস্করণ। ইংরাজ যে অনেক মহৎ কীর্তি করিয়াছেন সে বিষয়ে কাহারো মনে সন্দেহ নাই—অবশ্য ধর্মতঃ বলিতে গেলে সকল জাতই কিছু না কিছু মহৎ কীর্তি করিয়াছেন ও পরিমাণ নির্ভর করে প্রোপাগাণ্ডা শক্তির উপর। কিন্তু অভিযোগ উপস্থিত হইলে তো পূর্ব ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া সব কিছু হাসিয়া বা 'হিট ব্যাকের' ভয় দেখাইয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ ভারতের জেলগুলি তো ডীন ইনগু জাতীয় ধর্মভীরু মহাজন দ্বারা চালিত হয় না—হইলে কোন্ পাষণ্ড বেলজেনের সঙ্গে দেশী জেলের তুলনা করিত?

এমন লোক যদি পাওয়া যাইত, যিনি জার্মান ও ভারতীয় উভয় জেলেরই বিকট রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাহা হইলে মীমাংসা সহজ হইত। কিন্তু তাহা তো হইবার উপায় নাই। কারণ যে জর্মন জেলে মার খাইয়াছে সে ইংরাজের স্নেহ পায়, আর যে আলিপুর ফের্তা তাহাকে নাৎসিরা 'বৎস' বলিয়া কোল দেয়। কিন্তু সৃষ্টির কি বিচিত্র প্যাটার্ণ নির্মাণ! এই রকম একটি লোকও জন্মিয়াছেন এবং কি কৌশলে যে তিনি এই অলৌকিক সাধনাটি সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন তাহার রহস্য আমরা আজও নিরূপণ করিতে সমর্থ হই নাই।

সেই খানদানি বিশ্বকবির ঘরের ছেলে শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ভাবিতেছি। তিনি জর্মন জেলের নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন ও এদেশের জেলের আরাম যে কতবার কত বৎসর ধরিয়া উপভোগ করিয়াছেন সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। তিনি যদি স্বাস্থ্যসমেত দমদমা হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদের বহু সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন।

প্রথম প্রশ্ন: ইংরাজ সভ্যতার নিকট বহু প্রকারে 'ঋণী' অথচ 'নেমকহারাম' ভারতবাসীই কি এ তুলনা প্রথম আরম্ভ করিয়াছে? উত্তরে একখানা সুবিখ্যাত পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব।

"I once did my best to persuade Goering to use his influence with a view to their (i. e. concentration camps) abolition. His answer was typical. After listening to all I had to say, he got up without a word and went to

a book-case, from which he took a volume of the German Encyclopaedia. Opening it at Konzentrationslager (concentration camps) he read out "First used by the British in the South African War." He was pleased with his own retort, but the truth of the matter was that, though it was he who had originally formed the camps, when he was Minister of Police for Prussia, he had no longer anything to do with them. They were entirely under the control of Himmler."*

"আমি একবার গ্যোরিঙকে যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যেন তিনি তাঁহার প্রভাবের জোরে এইগুলি (অর্থাৎ ডাশাও ও বুখেনবাল্ডের কনসানট্রেশন ক্যাম্পগুলি) উচ্ছেদ করিয়া দেন। তিনি যে উত্তর দেন, সে তাঁহাকেই মানায়। আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা তিনি কান দিয়া শুনিলেন ও একটি মাত্র বাক্য-ব্যয় না করিয়া উঠিয়া গিয়া পুস্তকের সেলফ হইতে জর্মন বিশ্বকোষের এক খণ্ড লইয়া আসিলেন। কনসেনত্রাৎসিয়োনসলাগারের (কনসানট্রেশন ক্যাম্প) স্থানটি খুলিয়া জোরে পড়িতে লাগিলেন, "সর্বপ্রথম ইংরাজ কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে ব্যবহৃত"। গ্যোরিঙ আমার মুখের উপর পাল্টা জবাব দিয়া নিজে নিজে খুশী; কিন্তু সত্য কথা এই যে, যদিও তিনিই প্রাশার পুলিস মন্ত্রী হিসাবে ঐ সব ক্যাম্পগুলি প্রথম নির্মাণ করেন, সেগুলির উপর তখন তাঁহার আর কোন হাত ছিল না। হিমলারই তখন সর্বেসর্বা।"

জর্মনীতে গ্যোরিঙই এগুলি প্রথম নির্মাণ করেন তাহা তো বুঝিলাম, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার অভিযোগের তো কোন সদুত্তর হইল না। বিশ্বাস না হয় ২য় পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়ুন। পাঠক আশা করি, বলিবেন না যে, যে-লোকটির পুস্তক হইতে আমি উদ্ধৃত করিতেছি তিনি নিতান্ত সফরীপ্রোষ্ঠি! গ্যোরিঙের সঙ্গে কোন অধম দরহম-মহরম করিতে সক্ষম। লেখক মহামান্য সম্রাটের অতিমান্য প্রধান রাজদূত, সর্বাধিকারী (প্লেনিপটেনশিয়ারী) শ্রীযুত স্যর নেভিল হেণ্ডারসন। তিনি জর্মনীতে ১৯৩৭ হইতে ১৯৩৯এর যুদ্ধারম্ভ পর্যন্ত চেম্বারলেন সরকারের মুখ-পাত্র হিসাবে ছিলেন। ম্যুনিকে বিনা ক্লোরোফর্মে যখন চেকদের পদযুগল কপাৎ করিয়া কাটা হয় তখন তিনিই রামদাখানা আগাইয়া দিয়াছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা ৭. ১১. ১৯৪৫

* Failure of a mission P. 29.

সে যাহাই হউক, আণবিক বোমার স্থায় কনসানট্রেসন ক্যাম্প (ক-ক) নামক আপামর ত্রাসসঞ্চারক প্রতিষ্ঠানটি কে প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আমরা শুধু সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে সব জনমান্ত জর্মন বিশ্বকোষ ও গ্যোরিঙ নিজেদের কারাগারগুলিকে আফ্রিকাস্থ ইংরাজ কারা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। এবং ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য সে-যুগে ইংরাজ-জর্মনে শত্রুতা ছিল না—হেণ্ডারসন তখন গ্যোরিঙের পরম মিত্র—তাঁহার সঙ্গে নিত্য নিত্য খানাপিনা করিতেছেন, পূর্ব প্রাশায় তাঁহার জমিদারীতে শিকার খেলিতে গিয়াছেন। এই হৃদ্যতাকে শ্লেষ করিয়াই তৎকালীন বার্লিনস্থ মার্কিন রাজদূত ডডের কন্যা মার্তা তাঁহার পুস্তকে 'জর্মনীতে আমার কয়েক বৎসর'য়ে লিখিয়াছিলেন, 'হেণ্ডারসনকে লইয়া খুব মাতামাতি হইতেছিল'—'হি ওয়জ ওয়াইণ্ড এ্যাণ্ড ডাইনড'!

দ্বিতীয় তুলনাটি একটি গল্প দিয়া আরম্ভ করি। শুলৎসে ও শ্মিটে বার্লিনের রাস্তায় দেখা। শুলৎসে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি বেশ কিছুকাল ক-কতে কাটিয়ে এসেছ? নানা লোকে নানা কথা কয়; তুমি তো সবকিছু দেখেশুনে এসেছ—সত্যি খবর তুমি বলতে পারো।" শ্মিট হাসিয়া বলিল, "উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত। আমাকে দিয়েছিল একখানা সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট—ড্রইং রুম, ডাইনিং রুম, বেড রুম, ড্রেসিং রুম, বাথ। তোফা লুই ক্যাঁজ ফর্নিচার। পাঁচবেলা আহার। ব্রেক-ফাস্টে পরিজ, ভাজা সামোন, মোলায়েম সসিজ, নরম মুর্গী, গরম কটলেট—" শুলৎসে অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "সে কি কথা? মূলারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে তো সম্পূর্ণ অন্য কথা বলল—তা শুনে তো গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়।" শ্মিট বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল, "বলেছিলেন নাকি? বেশ করেছিলেন। খুব করে-ছিলেন। তাই তো আবার পাকড়ে নিয়ে গেছে যেখান থেকে বেরিয়ে এসে-ছিলেন।"

গল্পটি হইতে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল যে জর্মনীর জনসাধারণ ক-ক সম্বন্ধে নানাবিধ গুজব শুনিয়া সত্য নিরূপণে উৎসুক থাকা সত্ত্বেও হিমলার কোনো বিবৃতি দেন নাই।

আমাদের জানামতে ভারত সরকারও মৌলানা আজাদের ভাষায়, 'অমানুষিক অত্যাচারে'র কোনো প্রতিবাদ করেন নাই। খবরটি স্টেটসমেনও দুসরা নবেম্বরের কাগজে বাহির করিয়াছেন। শিরোনামা দিয়েছেন—"Atrocities in Indian

Jail." Government Silence Criticized! স্টেটসমেন কি উদ্দেশ্য লইয়া খবরটি ছাপাইয়াছেন জানি না। বোধ হয় সরকার যাহাতে 'হিট ব্যাক' বা 'উল্টা চড়' মারেন সেই উদ্দেশ্যে। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য স্টেটসমেন ইংরাজ সরকারের চোপদার নহেন—চোপাদেনেওয়ালা বটেন, ভারতীয়দের কাছে কাগজ বেচিয়া ভারতীয়দেরই—। চোপাদার না হইয়া চোপদার হইলে বহু পূর্বেই স্বরাজ আসিত।

সদাশয় সরকারকে কোনো অনুরোধ আমি কখনো করি না। কিন্তু এখন করিতেছি, "হে সরকার বাহাদুর, দমদমায় সুপারিনটেণ্ডেণ্টের নোকরীটি খালি পড়িলে স্টেটস্‌মেনকে দিয়ো। মাগগী ভাতা আমরাই বারোয়ারি করিয়া দিব।"

বেলজেনের ভিতরে কি অত্যাচার হইত ও ভারতীয় জেলে কি অত্যাচার হইতেছে তাহার আলোচনা আমরা করিব না। কারণ বেলজেন জাতীয় যে আধা ডজন ক-ক জর্মনীতে ছিল সেগুলি মিত্রশক্তি তন্ন তন্ন করিয়া, দলিলদস্তাবেজ ঘাঁটিয়া, মাটি খুঁড়িয়া, ফোটো তুলিয়া, বাইস্কোপ বানাইয়া, তেইশ লোক ঘুরাইয়া সর্বত্র বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। ইংরাজরাজত্বে ভারতে এদেশবাসীরা যে দিন অক্ষরে অক্ষরে সে সুযোগ পাইবে সেই দিনই ভিতরকার তুলনা সম্ভবপর হইবে। তদুপরি আরেকটা মারাত্মক তফাৎ রহিয়াছে। ক-ক মাত্র আধ ডজন-খানেক ছিল। ভারতবর্ষে জেলের সংখ্যা কত ঠিক জানি না। বোধ হয় ছয়টির বেশীই হইবে। সেই পঙ্গপালের আনাচে-কানাচে সরকারের জানা-অজানাতে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুঁশিয়ার খেয়াল-খুশীতে কি হইতেছে না হইতেছে তাহার হিসাবনিকাশ করিতে হইলে বিরাট সেনসাস আপিসের হাজারো ডেরা বসাইতে হবে। আর বসাইয়াই বা হইবে কি? রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন—

রাজকারা বাহিরেতে নিত্যকারাগারে

জেলের বাহিরেও তো জেল। এই যে মাত্র সেই দিন কলিকাতার বুকের উপর অসংখ্য লোক না খাইয়া মরিল তাহা কোন্ বেলেজেনে কি সংখ্যায় হইয়াছে স্টেটসমেনই জানেন।

পাঠক স্বপ্নেও ভাবিবেন না, আমরা ক-কর পক্ষে সাফাই গাহিতেছি। এমন অপকর্ম করিলে যেন আমরা কোনো দিন স্বাধীনতা না পাই। যুদ্ধ লাগিবার পূর্বেও ইংলণ্ড সরকার জানিতেন ডাশাও ও ওর‍্যানয়েনবুর্গে কি হয় না হয়; পূর্বে উল্লিখিত হেণ্ডারসেন সাহেবের পুস্তকে তাহার উল্লেখ আছে। তবে যুদ্ধ না লাগা পর্যন্ত সরকার এ সমস্ত জর্মনীর নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই। যুদ্ধ লাগার পর সরকার ইহাদের প্রচুর নিন্দা করিয়া তাঁহাদের মতে

'প্রামাণিক' ব্লু-বুক প্রকাশ করেন। নিঃস্বার্থ সত্যের খাতিরে, না ইংরাজ জনগণের মন জর্মন বিমুখ করিবার জন্য তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু ভারতবাসীরা যুদ্ধ লাগার পূর্বেও নাৎসি অনাচারের নিন্দা করিয়াছেন।

হলপ করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু ভাসা ভাসা মনে পড়িতেছে স্বয়ং স্টেটসমেনও ক-কর নিন্দা করিয়া যুদ্ধ লাগার পূর্বেই লিখিয়াছিলেন। তাই জিজ্ঞাস্য, কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা ভারতীয় জেলের নির্মম নিন্দা না করা পর্যন্ত স্টেটসমেন কয়বার জেল-তদন্ত চাহিয়াছেন। দেশের মৃদু প্রতিবাদ গুঞ্জরণ কি স্টেটসমেনের মত ভারী কাগজের পাতলা কানে কখনো পৌঁছায় নাই? আশ্চর্য!

কিন্তু এসব কথা থাক। স্টেটসমেনের কথায় বেলজেন চলে নাই, আলিপুর চলে কি না জানি না।

কিন্তু আসল তফাৎ কোথায় ও সে তফাৎ কাহার স্বপক্ষে কাহার বিপক্ষে যায় পাঠক বিবেচনা করিবেন।

(১) যুগ-পরিবর্তনকারী আন্দোলনের পুরোভাগে সব সময় শান্তশিষ্ট ভদ্র-মণ্ডলী থাকেন না—বড় বড় অভিযানেও না। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রথম প্রতিষ্ঠাতারা খানদানি ঘরের সুবোধ ছেলে ছিলেন না। ক্লাইভ হেস্টিংস ইত্যাদি সব দুঁদে দস্যি ছেলে—এ্যাডভেঞ্চারার! অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ঔপনিবেশকগণ সম্বন্ধেও নানা কথা শুনিয়াছি। ইহারা 'কিড গ্লাভস' বা মোলায়েম নিয়মে বিশ্বাস করে না।

জর্মনীর ভদ্রঘরের সুবোধ ছেলেরা যখন ফরাসী-ইংরাজ তথা লীগ অব নেশনের বিস্তর খোসামোদ করিয়া রাজ্য চালনা করিতে পারিলেন না, তখন তাহাদিগকে পদাঘাত করিয়া আসিল দুঁদেরা। তাহাদের সর্দার হিটলার, হিমলার, শ্লাইখার, রোয়াম জাতীয় ঐতিহ্যহীন অশিক্ষিত নিষ্ঠুর, জেল নীতিতে অনভ্যস্ত শত্রুর প্রতি নৃশংস সাক্ষাৎ খাণ্ডার। তাহারা মোলায়েম নিয়মে বিশ্বাস করে না। তাহারা যে নিষ্ঠুর প্রথা অবলম্বন করিতে পারে ইংরেজের তো সে 'হক্' নাই।

ক্লাইভ ভারতীয়দের কোন্ বেকায়দায় শায়েস্তা করিতেন জানি না কিন্তু তাহার পর তো দুই শত বৎসর কাটিয়াছে। এতদিনে তো সে দুরন্তপনা চলিয়া যাইবার কথা। যদিও নেহরুজী বলিয়াছেন যে, এদেশের আই সি এস আপিসাররা অপদার্থ তবু তো স্বীকার করিতে হয় ইঁহাদের অনেকেই অতি ভদ্র ঘরের ছেলে, বেশীর ভাগই ইংলণ্ডের সর্বোত্তম বিদ্যায়তনে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন বলিয়াই জানি, নাৎসি বড়কর্তাদের ন্যায় নীচ তাড়িখানায় মাতলামি করেন না, রোয়াম জাতীয় জঘন্য অনৈসর্গিক লিপ্সা ইঁহাদের আছে একথা কখনো শুনি নাই।

কাজেই তাঁহাদের ব্যবহারের সমালোচনা আমরা করি। তাঁহাদের হুকুমে চিমটিটি কাটা হইলে সে বেলজেনের মূষল অপেক্ষাও নিন্দনীয়।

বাঙলার লাট দুনিয়ায় নামকরা রাজনৈতিক, ভারতের বড়লাট বড় বড় লড়াই করিয়া নাম করিয়াছেন—হারাজেতার কথা সব সময় উঠে না—ইঁহাদের 'বিশ্বরূপ' আছে। ইঁহাদের আমলে জেলে ক্ষুদ্রতম অন্যায় হইলেই ইঁহাদের বিশ্বমূর্তির মৃত্তিকা নির্মিত পদযুগ বাহির হইয়া পড়িবে। আমাদের ইচ্ছা ইঁহাদের 'বিশ্বরূপ' যেন অটুট থাকে, ভারতের জেলে যেন রাজনৈতিক বন্দী না থাকে। তাঁহারা সেই মহৎ কার্যটি তো অনায়াসেই করিতে পারেন।

২। ক-কর বহু বন্দী নাৎসীদের ব্যক্তিগত শত্রু ছিল। কেহ হিটলারকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছে, কেহ হিটলারের বন্ধু হর্সট বেজেলকে খুন করিয়াছে, কেহ রোমকে চাবকাইয়াছে, কেহ গ্যোবেলসকে অপমান করিয়াছে। নাৎসীরা শক্তি পাইয়া যে ইহাদের হত্যা করিবে ও বহুদিন ধরিয়া জিঘাংসার আনন্দ পাইবার জন্য না মারিয়া অত্যাচার করিবে, ইহা তো বোঝা যায়, যদিও ক্ষমা করা যায় না।

কিন্তু এদেশের কোন রাজবন্দী কোন্ বড়কর্তার ব্যক্তিগত শত্রু? জেলে যাইবার পূর্বে কোন্ বন্দী কোন্ জমাদার-হাবিলদার-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-হাকিম-লাটের ব্যক্তিগত শত্রুতা করিয়াছে? বরঞ্চ উল্টো কথাই তো শুনিয়াছি। বিপদ আপদে এই সব সর্বত্যাগীদের নিকট হইতেই তো তাঁহারা সাহায্য পান—সরকারের লাল ফিতার কালা অনাচারের প্রতিবাদ করিতে হইলে তো গোপনে ইঁহাদের দ্বারস্থ হন; কৌন্সিলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করান, খবরের কাগজে দুর্নীতি নিবারণের আন্দোলন করান ইহাদেরই দ্বারা।

৩। হিমলার নিজে স্যাডিস্ট ছিলেন এবং যখন দেখিলেন যে সুস্থ জর্মন জেলার ওয়ার্ডাররা বন্দীদিগকে অমানুষিক অত্যাচার করিতে রাজী হয় না তখন তিনি সমস্ত জর্মনী হইতে বাছিয়া বাছিয়া একদল স্যাডিস্ট সংগ্রহ করেন এবং তাহারাই ক-ক-গুলিতে পাশবিক অত্যাচার করিয়া অনৈসর্গিক আনন্দ লাভ করিত।

ইংরাজ সরকার স্যাডিস্ট বাছাই করেন এ অভিযোগ কখনো শুনি নাই। গণ্ডমূর্খ বাছাই করার নীতি কোথাও কোথাও আছে শুনিয়াছি।

সর্বশেষে সর্বাধিক মারাত্মক পার্থক্যটি দেখাইবার চেষ্টা করিব।

৪। নাৎসীরা হৃদয়মন দিয়া বিশ্বাস করিত যে, তাহারা দেশের দশের তথা বিশ্বজনের 'মঙ্গলার্থে' নাৎসী আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে ও সেই 'পুণ্য প্রচেষ্টা'য় অগ্রসর হইতেছে। যাঁহারা তাহাদের বাধা দিবার চেষ্টা করেন তাঁহাদের বেশীর

ভাগই কম্যুনিস্ট। আদর্শে আদর্শে সেখানে লাগিল নিদারুণ দ্বন্দ্ব। যে জিতিল সে অন্যকে 'দেশদ্রোহী' 'সমাজদ্রোহী' ও 'বিশ্বদ্রোহী' হিসাবে চরম শাস্তি দিল।

কিন্তু ভারতে তো তাহা নহে। সদাশয় সরকার যে সৃষ্টির কোন আদিম প্রভাতে সদম্ভে বলিয়াছেন 'ভারতবর্ষে চরম আদর্শ স্বরাজ লাভ' তাহা আমাদের স্মরণ নাই। তদবধি মহামান্য সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া লাট-বেলাট সকলেই সেই কথাটি বার বার বলিয়াছেন।

দমদম আলিপুরের বন্দীরাও ঐ আদর্শেই বিশ্বাস করেন। আদর্শে আদর্শে এখানে কোনো দ্বন্দ্ব নাই। তফাতের মধ্যে এই যে, সদাশয় সরকার স্বরাজ দিবার শুভ দিনটি কত হাজার বৎসর পরে কোন্ প্রলয় রাত্রির পূর্ব মুহূর্তে ছাড়িবেন তাহা বলেন নাই, বলিবার বাসনাও রাখেন না। ভাবটা এই 'সবুরে মেওয়া ফলে'। দেশসেবকেরা বলেন, "মেওয়া ফলিয়ে যে পচিবার উপক্রম করিল। দুর্ভিক্ষে পচিতেছে, অশিক্ষা-কুশিক্ষায় পচিতেছে, রোগ-মহামারিতে পচিতেছে, নৈরাশ্য-হাহাকারে পচিতেছে। আর কত অপেক্ষা করিব?"

অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে 'timing' বাঙলাতে যাহাকে বলি 'লগ্ন' সেই লইয়াই তফাৎ। এবং এই সামান্য তফাতের জন্য এত লাহোর, এত লালকেল্লা? ইংরাজরা তো খৃষ্টান। প্রভু যীশু বলিয়াছেন, 'হে ভগবান অদ্যকার রুটি অদ্যই দাও।' আরো বলিয়াছেন, 'কল্যকার ভাবনা আজ ভাবিয়ো না', অর্থাৎ অদ্যকার কর্তব্য, আজই সমাপ্ত করো। আমরা নেটিভরা সংস্কৃতে বলি 'শুভস্য শীঘ্রং', আরবীতে বলি 'অল-ইন্তিজারু আশাদ্দু মিনাল মওত' অর্থাৎ 'অপেক্ষা করা মৃত্যু-যন্ত্রণার অপেক্ষাও পীড়াদায়ক'।

সর্বজনকাম্য মঙ্গলদায়ক স্বরাজ লাভের জন্য যাঁহারা কিঞ্চিৎ 'অসহিষ্ণু' তাঁহাদের জন্য শাস্তি!

নিন্দুকে বলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশে আছে উদর পূর্তির জন্য। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে সে তো আরো নিদারুণ। তাহার অর্থ তো এই দাঁড়াইবে যে, স্বাধীনতাকামীরা নিঃস্বার্থ ভাবে যে পুণ্য কর্ম করিতেছেন, স্বার্থান্বেষীরা তাহাতে বাধা দিতেছে। তাহা হইলে তো সেই বাধা দানের প্রতীক আলিপুর, দমদমা নির্মাণ করাই পাপ। সেখানে কি 'শাস্তি' দেওয়া হইতেছে না হইতেছে তাহার আলোচনা তো অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয়—বেলজেনের সঙ্গে তুলনা কোথায়?

হিটলার কখনো কোনো ক-ক হইতে কাহাকেও খালাস করিয়া মিত্রভরে আহ্বান করিয়া বলেন নাই 'আইস, তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া দেশের মঙ্গল

সাধন করি।' কারণ নাৎসীদের হিসাবে তাহারা দেশদ্রোহী কুষ্ঠরোগী।

আনন্দবাজার পত্রিকা ৯. ১১. ১৯৪৫

মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্য লইয়া সদাশয় সরকার সমূহ বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। বিপদে পড়িলে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায় ও তখন রাগের বশে হাঙ্গামহুজ্জৎ করে ও যত্র তত্র কটুবাক্য নিক্ষেপে লিপ্ত হয়। বেভিন-ভিশিনস্কিতে যে বাক্যালাপ হইল তাহার ভাষাতে কিঞ্চিৎ বিশেষ রস-সম্পর্কের আত্মীয়তাবাচক শব্দ প্রয়োগ করিলেই মুক্ত মৎস্যহট্টে সে ভাষা জয়ধ্বনি লাভ করিবে।

সরকারের উষ্মার কারণ পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত। ১৯১৯ সনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সরকার দেখেন, তখন যুদ্ধের রক্তক্ষয়ের ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রভু জিহোভা তাহাকে ইরাণ দিয়াছিলেন, ইরাক দিয়াছিলেন, হিজাজ দিয়াছিলেন, ট্র্যান্সজর্ডান দিয়াছিলেন, প্যালেস্টাইন দিয়াছিলেন, এমন কি তাবৎ মিশরদেশ এবং সুদান দিয়াছিলেন, ইস্তেক বসফরস-দার্দানেলেজসহ তুর্কী দিয়াছিলেন। একমাত্র সিরিয়া-লেবাননে ফরাসী ঈষৎ নাসিকাগ্র প্রবেশ করাইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে তাহা কর্তন করিতে বিশেষ অসুবিধা হইত না।

অর্থাৎ তাবৎ মধ্যপ্রাচ্য সরকারের হাতে, খানিকটা সরকারী খানিকটা বে-সরকারী ভাবে। এবং এই মধ্যপ্রাচ্যে সরকারের ফরফরদালালি খবরদারি সরদারি মৌজুদ ছিল বলিয়াই রমেলকে হারানো সম্ভবপর হইল, অতিকষ্টে সরকার মহতী বিনষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

১৯৪৫-৪৬ অবস্থা ভিন্ন। মধ্যপ্রাচ্যে সরকারের একচ্ছত্র আধিপত্য। ফরাসী সম্পূর্ণ ঘায়েল। সে জখমী কুকুরের ন্যায় দেশের ক্ষতস্থল লেহন করিতেছে, মধ্যপ্রাচ্যের শিকার তাড়না করিবার মত উৎসাহ ও শক্তি তাহার আদপেই নাই। প্রমাণস্বরূপ এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দিনকয়েক পূর্বে সিরিয়া যখন ফরাসীকে তন্বী করিয়া বলিল 'কুইট সিরিয়া' তখন তাহাকে কর্ণ মর্দন করিবার মত 'বাঘা' ক্লেমাসোঁ আর নাই, মেরা ভেদো বিদো (ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব Bidault) সকরুণ কণ্ঠে কহিলেন, "ইংরাজ সরকার সিরিয়া সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য বিবেচনা করেন, আমো তাহাই করিব।" অর্থাৎ জ্ঞানদাসী ভাষায় বলিলেন, 'বধু, তোমার গরবে গরবিনী হম, ভীতুয়া তোমার ভয়ে।'

কিন্তু হায়, এই নশ্বর সংসারে অবিমিশ্র আনন্দ কোথায়? ফরাসী নাই, জর্মন নাই; তাবৎ মধ্যপ্রাচ্য সরকার পুরষ্টু পাঁঠার ন্যায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া

বেড়াইতেছেন, চণ্ডীমণ্ডপের ভয় নাই, তথাপি প্রশ্ন যদিস্যাৎ বিপদ উপস্থিত হয় তবে ত্রাণ করিবে কে। পূর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ আছে,—

একা ঘরে বউ হয়ে খেতে বড় সুখ,
মারের বেলায় ধরবে কে, ঐ বড় দুখ।

অর্থাৎ যে বাড়ীতে শাশুড়ী নাই, ননদী নাই, জা নাই সে বাড়ীতে একা বউ নিত্য নিত্য নূতন রান্না করে, স্বামীকে খাওয়ায়, নিজে মনের সুখে খায়, কিন্তু বিপদ কিল মারার গোসাঁই যখন কাঁঠাল পাকানো আরম্ভ করেন, তখন তাহাকে ঠেকাইবার মত কেহই থাকে না। কাজেই বিচক্ষণা বউ একটি যত অপ্রিয়ই হউক না কেন বিধবা সধবা জা ননদীর সন্ধানে থাকে।

সদাশয় সরকার অধুনা সেই সন্ধানে আছেন। কারণ ইরাণ হইতে লিবিয়া পর্যন্ত সরকার যত ঘোঁৎঘোঁৎই করুন না কেন, কিল মারার গোসাঁই রাশিয়া দরজার কাছে বসিয়া কখন যে কি করিয়া বসে তাহার ঠিক নাই। তখন তাহাকে ঠেকাইবে কে? ফরাসী নাই, জর্মনী নাই, ইটালী নাই, এমন কি জাপানও নাই। অন্যকে দিয়া লড়ানোর কায়দা সরকার এত যুগ ধরিয়া রপ্ত করিয়াছেন; অন্য সবই লড়িয়া লড়িয়া প্রাণ দিয়াছে। তবে কি আখেরে সরকারকেই লড়িতে হইবে? সে যে অভূতপূর্ব অচিন্তনীয়।

তবে ভয় নাই, বোকা মার্কিন রহিয়াছে। জর্মনীকে শেষ পর্যন্ত সে-ই শায়েস্তা করিয়াছে। রুশকেও কেনই বা সে-ই শায়েস্তা করিবে না?

উপস্থিত তাহাকে প্যালেস্টাইনের ফাঁদে বাঁধা হইয়াছে।

প্যালেস্টাইনের জমিজমার উপর সদাশয় সরকারের কোন লোভ নাই একথা তাহার পরম শত্রুও স্বীকার করিবে। সেখানে তেল নাই, লোহা নাই, কয়লা নাই, কিছুই নাই যাহার উপর লোভ করা যাইতে পারে। যাহাও বা সামান্য কিছু আছে, যথা লবণ সমুদ্র হইতে উৎপাদিত রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রী তাহাও ইহুদীরা এমন দাম দিয়া কিনিতে প্রস্তুত যে, সুচতুর ইংরাজ কারবারী সে দাম দিতে রাজী হইবে না। কাজেই প্যালেস্টাইনে ইংরাজের স্বার্থ সেখানে সমর, নৌ ও বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া মধ্যপ্রাচ্য হাতের কব্জায় রাখা। এবং প্যালেস্টাইনে যদি মহাপ্রলয় পর্যন্ত সরকারের থাকার বাসনা থাকে, তবে সে দেশ আরব বা ইহুদী কাহাকেও ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। অতএব সেখানে সেই সনাতন অথচ চিরনবীন পন্থা, ভাগ করিয়া রাজত্ব করো, চালাইতে হইবে। সেই দ্বি-ধা-করণ উচাটন-মন্ত্র জপিয়া জপিয়া সরকার পুনরায় প্যালেস্টাইনকে পাকিস্থান-ইহুদীস্থান রূপে দ্বি-ধা করিতে চাহিয়াছেন—১৯৩৮ সালে প্রথম এই প্রস্তাবটি করা হয়, তখন

ইহুদী আরব দুই দলই হুঙ্কার দিয়া তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিয়াছিল। এখনও করিবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই নীতি ইংরাজ একা চালাইতে পারিবে না বলিয়া দোসর খুঁজিতেছিল। মূর্খ মার্কিন ধরা দিয়াছে। আমেরিকার বহু ধনপতি ইহুদী, তাহারা বস্তা বস্তা ইহুদী প্যালেস্টাইনে চালান করিতে বসে—এদিকে সদাশয় সরকার আরবকে কথা দিয়াছিলেন যে, আর ইহুদী আমদানী করা হইবে না। কাজেই সরকার মার্কিন ইহুদী ধনপতিদিগকে বলিলেন, ১৫০০ ইহুদী প্রতি মাসে প্যালেস্টাইন চালান করিতে দিব কিন্তু আরব আপত্তি করিলে—এবং আরব অতি অবশ্য করিবে—সে ঠেলা তোমাদিগকে সামলাইতে হইবে। ইহুদী ধনপতি তৎক্ষণাৎ রাজী হইল—যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় তাহার বিস্তর টমিগান, মেসিনগান বেকার পড়িয়া আছে। সেই সব মাল গোপনে ও ইহুদী মাল প্রকাশ্যে প্যালেস্টাইনে চালান করিতেছে—আরবের নাকের ডগার উপর দিয়া। আরব আপত্তি করিলে ইহুদীরা ঐ সব বন্দুক কামান দিয়া আরবকে নির্বংশ করিবে।

সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান ইংরেজের সঙ্গে যুগ্ম কৌন্সিলে বসিয়া ইহুদীদিগের সুরাহার তদারকী করিতেছে। মার্কিন ইহুদী খুশী, এখতেয়ার চালাইতে পারিয়া—ইংরাজ খুশী মার্কিনকে অক্টোপাশের পাশে জড়াইতে পারিয়া।

এতদিন মার্কিন ইংরেজের হইয়া লড়িত এখন ইংরেজের হইয়া নোংরা পলিটিক্সও করিবে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতীক মার্কিন কুসংসর্গে পড়িয়া নিরীহ আরবকে ধর্ষণ করিবে। মূর্খের ইহাই পরম গতি।

এই বিশাল ভূখণ্ডের অধিকাংশ এককালে তুর্কীর সুলতানের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ১৯১৮-এর যুদ্ধের পর সুলতানের প্রায় সকল ক্ষমতা যায়—ক্রুসেডের আমল হইতে খৃষ্টশক্তিবর্গ সুলতানকে হৃতবল ও হৃতসর্বস্ব করিবার যে প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল, তাহা ১৯১৮-এ সফল হয়। সুলতানের তখন এমন অবস্থা যে খাস তুর্কীতেও তাঁহার স্বাধীনতা লোপ পাইয়াছে।

তা পাউক। কিন্তু যে সব ভূখণ্ড সুলতানের হাতছাড়া হইল সেগুলি স্বরাজ পাইল না। ইংরাজ ও ফরাসীতে মিলিয়া আরবদিগকে এমনি নির্মম শোষণ করিতে লাগিল যে, তাহাদিগের মোহমুক্ত হইতে বেশী দিন লাগিল না। সুলতানের কড়াইসিদ্ধ হইতে লাফ দিয়া বাঁচিতে গিয়া আরব যে ইংরাজ-ফরাসীর নগ্ন অগ্নিতে পড়িয়াছে, সে কথা বুঝিতে পারিল।

তখন সর্বত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মিশরের প্রাতঃস্মরণীয়—সর্বস্বাধীনতাকামীর প্রাতঃসন্ধ্যাস্মরণীয়—সা'দ জগলুল পাশা তখন মিশরের জন্য যে

সংগ্রাম করিলেন, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

প্যালেস্টাইনে মহামুফতী সেই প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন ; আজ তিনি গৃহহারা দেশত্যাগী।

নজদের ইবনে সাউদ মক্কা হইতে ইংরাজের ক্রীড়নক শেরিফকে তাড়াইয়া পূর্ণ হিজাজের স্বাধীনতা অর্জন করিলেন। ইবনে সাউদ আজ পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান। শুধু শক্তিমান নহেন, ন্যায় ও ধর্মাচরণে দেশের দশের মঙ্গল সাধন কর্মে তিনি লিপ্ত।

এই সব বিভিন্ন ভূখণ্ডের আরবের ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে না। প্যালেস্টাইনের আরব এই কথা বলে না যে, সে সিরিয়ার আরব হইতে ভিন্ন। এবং একথাও বুঝিয়াছে যে ইরাক, মিশর, সিরিয়া যদি পৃথক পৃথক ভাবে স্বাধীনতা অর্জনে লিপ্ত হয় তবে ইংরাজ-ফরাসী সেই সনাতন 'দ্বি-ধা করিয়া পরাধীন রাখো' বা 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতি বলবৎ রাখিবে। এ কথা, এ নীতি সর্বাপেক্ষা অধিক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন ইবনে সাউদ।

সমস্ত আরবকে কি করিয়া এক পতাকার নীচে সম্মিলিত করিয়া খ্রীষ্ট-শোষক-নীতি নির্মূল করা যায় তাহার সাধনা ইবনে সাউদ গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া করিয়াছেন।

হয়ত আজ সে সুদিন আসিয়াছে।

খবর আসিয়াছে, ইবনে সাউদ মিশরের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামানলে মধ্যপ্রাচ্য শীঘ্রই উদ্দীপ্ত হইবে, তাহাতে প্রধান কর্মকর্তা হইবেন ইবনে সাউদ। মিশর হিজাজ-নজদ অপেক্ষা অনেক 'সভ্য' অর্থাৎ ইয়োরোপীয় কায়দাকানুনে পরিপক্ক তাই হিজাজ-নজদের আরবের ধমনীতে যে উষ্ণ স্বাধীন রক্ত প্রবাহিত তাহার সঙ্গে মিশরী রক্তের তুলনা হয় না। তাই হিজাজী আরব সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিবে।

মধ্যপ্রাচ্যে সম্মিলিত আরবশক্তি যখন সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে সংগ্রাম ঘোষণা করিবে তখন যেন ভারতবর্ষও তাহার সুবর্ণ সুযোগ না হারায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা

২৩. ২. ১৯৪৬

মিশর

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতি কি দুর্দান্ত হৃদয়হীনরূপে প্রকাশ পাইতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মিশর দেশ। সে সাম্রাজ্যনীতি ইংলণ্ডে কে রাজত্ব করিতেছে তাহার

উপর বিন্দুমাত্র নির্ভর করে না ; শ্রমিক দলই হউন আর রক্ষণশীল দলই হউন মিশর সম্বন্ধে কূটনীতি কখনও পরিবর্তিত হয় না। সে নীতি দ্বি-ধা করিয়া সিধা রাখো নহে, কারণ সাম্রাজ্যবাদের পরম দুর্ভাগ্যবশতঃ মিশরে দ্বিখণ্ডিত করিবার মত দুই বর্ণ, ধর্ম বা সম্প্রদায় নাই। মিশরের প্রাচীনতম অধিবাসীরা 'কপ্ট'। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ধর্ম পরিবর্তন করিয়া করিয়া সর্বশেষে খৃষ্টান হয় এবং আরব অভিযানের পর ইহাদের অধিকাংশ মুসলমান হইয়া যায়। মুষ্টিমেয় যে কতিপয় খৃষ্টান 'কপ্ট' এখন মিশরে আছে, তাহাদিগকে সাম্প্রদায়িক আরক খাওয়াইয়া উন্মত্ত করিবার চেষ্টা যে কখনো করা হয় নাই এমন নহে, কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় সা'দ জগলুল পাশার বদান্যতা সাম্রাজ্যনীতির ক্ষুদ্র প্রলোভনকে পরাজিত করে ও 'কপ্ট'রা অল্পদিনের মধ্যেই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় যে, তাহাদের চরমস্বার্থ কাহার উপরে নির্ভর করিলে সুরক্ষিত হইবার সম্ভাবনা বেশী। ইদানীং মিশরে যে ব্যাপক আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে 'কপ্ট'রা হয় যোগদান করে, না হয় এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সহানুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে ; কিন্তু কোন অবস্থাতেই তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে যোগদান করিয়া ইহকাল পরকাল বিনষ্ট করিতে সম্মত হয় না। মিশরের অন্যতম প্রধান নেতা, অর্থনীতিতে তাবত মিশরীয়দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ মুকরিম পাশা আবিদ খৃষ্টান 'কপ্ট'। ব্যক্তিগত কারণে ওয়াফদ দলের নেতা মুস্তফা নহ্হাজ পাশার সঙ্গে তাঁহার কখনো কখনো মনোমালিন্য হইয়াছে ও তিনি ওয়াফদ-বিরুদ্ধ মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ করিয়াছেনও বটে, কিন্তু দেশের অনিষ্টকারী কোন দলের সঙ্গে যোগদান করিয়া তিনি কখনো স্বধর্মাবলম্বীদিগের জন্য অন্যায় পারিতোষিক গ্রহণ করেন নাই।

মিশর সম্বন্ধে তাই সরকারের চিরন্তন নীতি—যত কম পারো দাও, যতদিন পারো ঠেকাইয়া রাখো। দ্বিতীয়তঃ, দেশ চুপচাপ থাকিলে কোন নূতন সন্ধি-শর্তের আলোচনা আদপেই করিবে না, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হিংস্র, অহিংস কোন আন্দোলন হইলেই বলিবে,—আমাদিগকে ভয় দেখাইয়া কিছুই হইবে না, প্রথম আন্দোলন থামাও, তারপর সন্ধি-শর্ত লইয়া আলোচনা হইবে। গত সপ্তাহে মিশরে যে হানাহানি হইয়া গেল, তাহার উত্তরে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন, উই শাণ্ট বি ইন্টিমিডেটেড। এ নীতি কিছু নবীন নহে। আমরাও বলি, বর্ষাকালে ছাত মেরামত করিবার উপায় নাই, কারণ বৃষ্টিপাত হইতেছে, শীতকালে করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ বৃষ্টি কোথায় ?

কিন্তু মিশরীরা আমাদের মত সহিষ্ণু নহে। ১৯১৯ সাল হইতে ব্যাপক আন্দোলনের ফলে তাহারা সম্পূর্ণ পরাধীনতা হইতে ১৯৩৯ সালে আভ্যন্তরীণ বহু

সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ স্বাধীনতা মিশর কখনও পায় নাই ও আমাদের বিশ্বাস ভারতবর্ষ স্বরাজ না পাওয়া পর্যন্ত ইংরেজ অধ্যুষিত কোন অঞ্চলই সম্পূর্ণ স্বরাজ পাইবে না।

মিশরের সম্পূর্ণ স্বরাজ পাওয়ার পথে অন্তরায় মিশরস্থিত ইংরাজবাহিনী। সুদ্ধ মিশরী বাহিনী একটি আছে বটে ও একদিন তাহাদের শোভাযাত্রা দেখিবার সুযোগও আমার হইয়াছিল। বন্দুক কামান দেখিয়া এক নাগরিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি কি নেপোলিয়ন এদেশে ফেলিয়া গিয়াছিলেন?" উত্তরে নাগরিক করুণ কণ্ঠে বলিল, "সে সৌভাগ্য কোথায়? এগুলি ১৯১৮এর যুদ্ধের বরবাদ জঞ্জাল। ইংরাজের কাছ হইতে হীরার মূল্যে কেনা। এগুলি কখনো কোন কাজে লাগিবে না। কিন্তু বন্দুক-কামান ছাড়া সৈন্যবাহিনী নিতান্ত হয় না বলিয়াই ক্রয় করা হইয়াছে।"

১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মিশরস্থ ব্রিটিশ বাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া মিশরের রাজনৈতিক আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করিয়াছে। ওয়াফদ দল যখনই ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া পূর্ণ স্বরাজের পথে দেশকে অগ্রগামী করিতে চেষ্টা করিয়াছে তখনই রাজার উপর চাপ পড়িয়াছে ওয়াফদকে বিতাড়িত করিবার। সে চাপ উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই কারণ তাঁহার সেনাসামন্ত কোথায়? অত্যধিক দৃঢ়গ্রীব হইলে সিংহাসনচ্যুত হইতে কতক্ষণ? সাম্রাজ্যবাদের দুর্বিষহ তাড়নার ফলে রাজা পুনঃপুনঃ দেশের জনমত পদদলিত করিয়া ওয়াফদ দলকে বিতাড়িত করিয়া কখনো ইসমাইল স্বিদকীপাশাকে 'চোটা মুসোলিনী'—তখনো হিটলার সর্বাধিকারী হন নাই—রূপে দেশ শাসন করিতে দিয়াছেন; কখনও ইয়াহ্‌ইয়া পাশার মত নপুংসককে প্রধান মন্ত্রী করিয়া দেখিয়াছেন, দিনের পর দিন মন্ত্রণা সভায় তিনি ওয়াফদ কর্তৃক কিরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছেন। সেণ্ট্রাল এসেম্বলির উভয়কর্ণকর্তিত নির্লজ্জতা শুধু এদেশে নহে, মিশরে ও অন্য সর্বপরাধীন দেশে দুর্গন্ধ সাম্রাজ্যবাদ-বাতে স্ফীত বেলুনের ন্যায় উড্ডীয়মান হয়। দেশের লোক তাজ্জব মানিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া নানাবর্ণের সেই বেলুনের খেলা দেখে; জানে, সূত্র কাহার হস্তে এবং ইহাও জানে, সাম্রাজ্যবাদের পত্তন হইলে পর এগুলিকে নষ্ট করিবার জন্য সূচ্যগ্রই যথেষ্ট।

কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি—মিশরীরা অসহিষ্ণু। কোন মহাপ্রলয়ের পূর্ব মুহূর্তে স্বরাজ সপ্রকাশ হইবেন, সে আশায় বসিয়া থাকিতে জানে না। কাজেই যখনই কোনো নপুংসক বা চোটা মুসোলিনী জনমত উপেক্ষা করিয়া রাজ্যচালনা করিবার চেষ্টা করিয়াছে তখনই তাহারা ব্যাপক আন্দোলন চালাইয়াছে; গত

সপ্তাহে যাহা করিয়াছে তাহা যে কতবার করা হইয়াছে তাহার হিসাব রাখিতেও মিশরীরা ভুলিয়া গিয়াছে।

১৯৩৯ পর্যন্ত এই লীলা চলিয়াছিল। যুদ্ধ লাগার অল্প কিছুদিন পরেই ব্রিটিশ দেখিল যে, মিশরকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত না করিলে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। ওয়াফদ-দল ইংরেজকে সেই সঙ্কটের সময় সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল বটে, কিন্তু দেশের সর্বস্ব বিনাশ করিয়া নহে। কে জানে, বাঙলাদেশের দুর্ভিক্ষের ন্যায় সেখানে কোনো অঘটন ঘটনের প্রয়াস চলিতেছিল কি না—কারণ, জাপানের ইম্ফল আগমন ও রমেলের অল-অলামেন গমন তো একই রোগ—বৈদ্যরাজ যখন একই তখন ঔষধও একই হইবে না কেন? সে যাহাই হউক, ওরাফদ সরিয়া দাঁড়াইল, আকাশে দেখা দিলেন দুর্গন্ধবাতপূর্ণ বেলুন, আলী মেহের পাশাই প্রধানমন্ত্রীরূপে। তৃতীয়বার বলি, মিশরী অসহিষ্ণু। আততায়ীর হস্তে আলী মেহের প্রাণ হারাইলেন। তখন আসিলেন নুক্রাশী পাশা। ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। মিশরীরা দেখিল, বহু কষ্টে, বহু রক্তপাতে অর্জিত তাহাদের আভ্যন্তরীণ আংশিক স্বাধীনতা যুদ্ধের হট্টগোলের ভিতরে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সন ১৯১৯-এ ফিরিয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ সমস্ত রাত প্রাণপণ নৌকা বাহিয়া সূর্যোদয়ের সময় দেখে—নৌকা বাড়ির ঘাটে।

চতুর্দিকে কচুরীপানা। মিশরী মরীয়া হইয়া সেই পানা কাটিতে উদ্যত। পানা বলে—মধ্যপ্রাচ্যের জল শীতল রাখিবার জন্য বিশ্ব শান্তির জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে আমরা আছি। মিশরীরা বলে তাহা হইলে সুয়েজখালের ঐ পারে প্যালেস্টাইনে গিয়া থাকিলেই পারো।

ইহার সদুত্তর অসদুত্তর সরকার কিছুই দেন নাই।

আনন্দবাজার পত্রিকা ১. ৩. ১৯৪৬

যবনিকান্তরালে

ফরাসী বইয়ের দোকান থেকে যে কেতাবখানা কিনেছিলাম, তার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব এ রকম একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম সে কথাটা মনে পড়েছে। কারবারে আদালতে হরবকতই ওয়াদা-খেলাফ করা হয়, আইন-আদালত ব্যবসায়ী-কারবারি তার জন্য প্রস্তুতও থাকেন কিন্তু খোস গল্পের বাজারে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মানে মকমল ডিক্রী কবুল করে নেওয়া। কিস্তি রদবদলের কথা তুললেই সবাই চেঁচিয়ে বলে, 'দেউলে হওয়ার নোটিশ দাও, বুরুজ হয়ে গেছ মেনে নাও।'

করি কি? কারণ কেতাবখানা ভালো না। অর্থাৎ আমার মতের সঙ্গে

কেতাবখানা সায় দেয়নি। নিরপেক্ষ পাঠক হুঙ্কার ছেড়ে বলবেন, 'অবাক করলে। তোমার মতের সঙ্গে কেতাবখানার মত মিলল না বলেই কেতাবখানা খারাপ। এ তো বড় তাজ্জবকী বাৎ।'

নিবেদন করছি। আমি আপনারই মত ভারতীয়। সন ২৯-এ যখন জর্মনি যাই তখন হিটলার জর্মনিতে কল্কি, কিন্তু পেয়েছেন বটে বসবার জন্য ইঁট পাননি। ১৯৩৮—এ যখন শেষ বারের মত জর্মনি ছাড়ি তখন স্বয়ং চেম্বরলিন জর্মনিতে উড়োউড়ি করছেন হিটলারের মন পাবার জন্য। কাজেই হিটলার সম্বন্ধে আমার দু'চারটে তথ্য জানার কথা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনি হয়ত আরো বলবেন, 'ফরাসী গ্রন্থকার তোমার চেয়েও ঢের বেশী জানে।'

কবুল। কিন্তু হিটলার বাবদে ফরাসী গ্রন্থকারের চেয়ে আপনার আমার মত ভারতীয়ের নিরপেক্ষ থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশী। কারণ ফ্রান্স আমাদের জানের দুশমন নয়, জর্মনি আমাদের দিলের দোস্তও নয়। ফ্রান্স জর্মনি দুইই আমাদের কাছে বরাবর—এবং এ সম্বন্ধে এণ্টনি ফিরিঙ্গি যে মোক্ষম তর্জাখানা ঝেড়েছেন সেটি অশ্লীল বটে, কিন্তু এমন তাগসই আপ্তবাক্য আর কেউ কখনো শোনাতে পারেননি!

থাক সে কথা।

কেতাবখানার নাম 'লে সেক্রে দু লা গের'। (Les Secrets de laguerre) অর্থাৎ যুদ্ধের খবর। গোপন গ্রন্থকারের নাম রেমো কার্তিয়ে। সায়েব বিস্তর কাঠ খড় পুড়িয়ে, ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমার দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে এ-কেতাবখানা তৈরী করেছেন। বইখানার ষাটের সংস্করণ আমার হাতে পড়েছে। ছাপা ১৯৪৬ সনে। তাই বিবেচনা করি আরো অনেক সংস্করণ ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। গ্রন্থকার আরো বিস্তরে বিস্তর কেতাব পয়দা করেছেন। তার মধ্যে নাম করা চার্চিল, রুজোভেল্ট এবং পিটার দি গ্রেটের জীবনী।

তাহলে কোন সাহসে এ গুণীর সঙ্গে কাজিয়া করি? তবে সায়েবদের প্রবাদেই রয়েছে "Fools rushing where angels fear to tread" অর্থাৎ "বামুন যেথা ঢুকতে নারে, চাঁড়াল সেথা লম্ফ মারে।" ষাট হাজারী বাজারে গুণীজন ঢুকতে ভয় পেতে পারেন, আমার কি পরোয়া!

মসিয়ো কার্তিয়ের সঙ্গে আমার প্রথম এবং প্রধান ঝগড়া যে তিনি কোনো জায়গায় রুশের কথা তোলেননি। মসিয়ো গোটা লড়াইটার দোষ একমাত্র হিটলারের কাঁধেই চাপাতে চান। রুশ শেষ মুহূর্তে যদি জর্মনির সঙ্গে সন্ধি না করত তবে যে হিটলার কস্মিনকালেও পোলাণ্ড আক্রমণ করবার হিম্মৎ যোগাড়

করতে পারতেন না সে কথাটা কার্ভিয়ে সায়েব কর্তন করে গিয়েছেন। হয়ত উত্তরে মসিয়ো বলবেন, রুশ এ-যুদ্ধের জন্য কতটা দায়ী সে কথাটা যে সব দলিল-দস্তাবেজে স্বপ্রমাণ হয়, সেগুলো ন্যুরনবের্গে পেশ করা হয়নি।

কথাটা ঠিক। গোড়ায় গলদ এখানটায়ই যেহেতুক রুশ (এবং মিত্র পক্ষ) ফরিয়াদি তাই রুশের বিরুদ্ধে যে সব দলিল-দস্তাবেজ অকাট্য সাক্ষ্য দেবে সেগুলো চেপে রাখা হয়েছে। তাই যদি হয় তবে হিটলার তথা জর্মনপক্ষের পুরা তসবির ফুটবে কি প্রকারে?

কিন্তু এ গোড়ার গলদের গোড়ায়ও আরেকটা গলদ রয়েছে। সেটাও ন্যুরনবের্গ এবং কাজে কাজেই মসিয়োর চেপে গেছেন। হিটলারের সঙ্গে রুশের মিতালি হওয়ার পূর্বে এই হিটলার এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গকে লাই দিয়ে আসমানে চড়াল কে?

ইংরেজ। ১৯৩০-৩২-এ জর্মনির প্রধান মন্ত্রী ব্রুনিঙ যখন ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে জীনীভা-লণ্ডনে মাকু চালাচ্ছিলেন, তখন ইংরেজ হাত গুটিয়ে বসে ছিল। ব্রুনিঙ কান্নাকাটি করে ইংরেজকে বহুবার বলেছিলেন, "জর্মনির এ-দুর্দিনে যদি তোমরা দু'মুঠো ময়দা দিয়ে সাহায্য না করো, তবে আমাদের সোস্যালিস্ট সরকার টিকতে পারবে না। ফলে হিটলার আর তাঁর কট্টর ন্যাশনালিস্ট দলের হাতে গোটা দেশটা চলে যাবে। আর তারা যে শান্তি চায় না, চায় যুদ্ধ, সে কথা তারা লুকিয়ে রাখেনি, তোমরাও বিলক্ষণ জানো। বিশ্বশান্তি যদি চাও, তবে উপস্থিত জর্মনকে বাঁচানোই তোমাদের প্রধান কর্তব্য।"

ইংরেজ তখন কানে তুলো দিয়ে বসে ছিল। তার কারণ, ইংরেজ তখন মনে মনে অন্য প্যাঁচ কষচে। ইংরেজের সে প্যাঁচের পিছনে যুক্তি ছিল এই—ব্রুনিঙের সমাজতন্ত্রী দলকে দানাপানি দিয়ে তাগড়া করে কোনো লাভ নেই। ইংরেজ রুশে যদি কোনো দিন লড়াই লাগে তবে সমাজতন্ত্রী জর্মনি পত্রপাঠ রুশের সঙ্গে যোগ দেবে। অথচ ইংরেজের প্রধান উদ্দেশ্য রুশকে বিনাশ করা। তাই ইংরেজের উচিত ব্রুনিঙ আর সমাজতন্ত্রী দলকে গদি থেকে সরিয়ে এমন এক খাণ্ডারকে বসানো, যে ব্যক্তি রুশের নাম শুনলেই মারমুখো হয়ে ওঠে। 'মাইন কাম্পফে' হিটলার অন্ততঃ সাতান্ন বার বলেছে, মোকা পেলে সে রুশকে তুলোধুনো করে ছাড়বে। অতএব 'হাইল হিটলার' আর ব্রুনিঙকো কান পকড়কে নিকাল দো।

এই যুক্তির জোরেই ইংরেজ জর্মনিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে দিল না। হিটলার শক্তি পেলেন। জর্মনি কট্টর ন্যাশনালিস্ট এবং রুশদ্রোহী হয়ে উঠল। ইংরেজ ড্যাম গ্ল্যাড।

তারপর ইংরেজ হিটলারকে দানাপানি দিতে আরম্ভ করল। হিটলার যখন রাইনল্যাণ্ডে সৈন্ত পাঠালেন তখন হুকুম দিয়েছিলেন যে যদি ইংরেজ বা ফরাসী তখন সৈন্ত নিয়ে আক্রমণ করে, তবে পিছু হটে বার্লিনে ফিরে আসবে—কারণ জর্মন বাহিনী তখনো যথেষ্ট তাগড়া হবার সুযোগ পায়নি। হিটলারের জেনারেলরা একবাক্যে বলেছিলেন, ইংরেজ ফরাসী যুদ্ধ ঘোষণা করবেই করবে। হিটলার বলেছিলেন, 'করবে না' কারণ তিনি বিলক্ষণ জানতেন ইংরেজের দুষ্ট মতলব জর্মনি যা চায় তাকে তাই দেওয়া যাতে করে গাট্টাগোট্টা হয়ে একদিন রুশের মোকাবেলা করতে পারে।

এ ব্যাপারটার ইঙ্গিত ন্যুরনবের্গের দলিল-দস্তাবেজ থেকে পাওয়া গিয়েছে। মসিয়ো কার্তিয়ে সেটা চেপে যাননি।

এই হল পটভূমি।

দৈনিক বসুমতী

হিটলার মাহাত্ম্য

মসিয়ো কার্তিয়ের কেতাব 'লে সেক্রে দ্য লা গের' (Le Secrets de la Guerre)-এর সঙ্গে আপনাদের খানিকটে পরিচয় গেল 'যবনিকান্তরালে' হয়ে গিয়েছে। সময় থাকলে তার কেতাবখানা অনুবাদ করে আপনাদের শুনিয়ে দিতুম—উপস্থিত তার থেকে মূল তথ্যগুলো নেওয়া যাক।

একটা বিষয়ে মসিয়োর প্রশংসা না করে থাকা যায় না। ইভা ব্রাউনের সঙ্গে হিটলারের কি সম্পর্ক ছিল তা নিয়ে তিনি কেলেঙ্কারি কেচ্ছা তো রচনা করেনই নি, বরং ব্যাপারটা অনেকখানি সহানুভূতি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। মসিয়োর মতে হিটলার যদিও আহার-পানাদি ব্যাপারে সংযমী ছিলেন, তবু একথা বললে ভুল হবে যে, হিটলার স্ত্রীজাতিকে ঘৃণার চোখে দেখতেন অথবা স্ত্রী সংসর্গ তিনি আদপেই পছন্দ করতেন না। হিটলারের চরিত্র সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন গ্যোরিঙ, কাইটেল, য়োড্‌ল্‌, র‍্যাডার, জ্যোনিৎস, জেনারেল ব্লমবের্খ, এন ব্রাউখিটশ, ফন বণ্টস্টেট, হালডের, মিলখ, পাউলুস, ফন্ কাল্কেনহর্স্ট, ইত্যাদি বড় বড় জাঁদরেলরা। এঁদের সবাই যে হিটলারের ইয়ার-বক্সীর দলে ছিলেন তাও নয়। এঁদের মত নিলে দেখা যায়, হিটলারের নারীলিপ্সা আর পাঁচজনের মতই ছিল; কিন্তু দেশের কাজ নিয়ে অহরহ তাঁর মন এমনি মগ্ন থাকত যে, তাঁর যৌন ক্ষুধা কখনো তার সম্পূর্ণ বিকাশ পায়নি।

এখানে মসিয়ো ঠিক তত্ত্বটা ধরতে পেরেছেন। হিটলার জর্মন জাতি, তার

ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যৎ সফলতাকে এত ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন যে, অন্য কোনো জিনিস তাঁর মনের ভিতর ঠাঁই পেত না। আর পাঁচজন সঙ্গীসাথীর জন্য হিটলার অনেক সুখ-সুবিধা করে দিয়েছিলেন; কিন্তু নিজের জন্য তিনি কিছুই করেননি। এমন কি বেরেস্টেষগার্ডেনে তিনি যে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন তাতে তাঁর নিজের জন্য কামরা আসবাবপত্র ছিল কমই। তিনি তাঁর সহকর্মীদের জন্য সেখানে উত্তম বন্দোবস্ত করে রাখতেন; এমন কি যাঁরা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন স্ত্রী পরিবারের কাছে যাবার সুবিধে পেতেন না তাঁদের পরিবারকে বেরেস্টেষগার্ডেনে আনিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করে দিতেন। হিটলারের সহচরেরা বলেন কিন্তু বেরেস্টেষগার্ডেনের জীবনযাত্রার সঙ্গে ইভা ব্রাউনের প্রায় কোনো যোগাযোগই [illegible] না। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতেই ভালবাসতেন ও অতি দৈবাৎ কেউ তাঁকে দেখতে পেত।

ইভা ব্রাউন সুন্দরী ছিলেন এবং হিটলারকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। মসিয়ো এ সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেননি; এবং না করে আমার মতে ভালোই করেছেন। ইভা ব্রাউনের জীবনকাহিনী আমি অন্যত্র পড়েছি এবং তাঁর প্রেমের কাহিনী পড়ে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেছি। হিটলারকে তিনি তেমন করে পাননি, আর পাঁচটি মাটির গড়া তরুণী তাদের বল্লভকে যে রকমধারা পায়। এই না-পাওয়ার দুঃখ ইভা ব্রাউনকে শেষদিন পর্যন্ত কাতর করে রেখেছিল। অসাধারণ মানুষকে ভালোবাসতে পাবার দুঃসহ সৌভাগ্য ইভা ব্রাউন বুঝতে পেরেও কোনোদিন মেনে নিতে পারেননি।

মসিয়ো কিন্তু আরেকটি খাঁটি তত্ত্বকথা আবিষ্কার করেছেন।

হিটলার যখন রাইনল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠান তখন তাঁর জেনারেলরা তারস্বরে প্রতিবাদ করেছিলেন, তিনি যখন পর পর অস্ট্রিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়া দখল করেন তখনো তাঁরা আপত্তি করে বলেছিলেন ইংরেজ ফরাসী তাহলে জর্মনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, হিটলার বলেছিলেন করবে না। তাই যখন হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করবার জন্য জেনারেলদের প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন তখন তাঁরা আর অতটা তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করেননি, ইংরেজ ফরাসী যুদ্ধ ঘোষণা করল বটে; কিন্তু হিটলারের ব্লিৎসক্রীগ বা বিদ্যুৎগতিতে যুদ্ধ এমনি অল্প সময়ের মধ্যে এতটা সফল দিল যে, জেনারেলরা হতভম্ব হয়ে হিটলারের কাছে নাকে খৎ দিলেন।

এবং শুধু তাই নয়। ন্যুরনবের্গের দলিলপত্র থেকে মসিয়ো সপ্রমাণ করেছেন যে, পোলাণ্ড অভিযানের সমস্ত প্ল্যান করেছিলেন স্বয়ং হিটলার। হিটলার আপন

জেনারেলদের সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন সত্য ; কিন্তু গোটা যুদ্ধটা কি ভাবে চালাতে হবে, কখন চালাতে হবে, কতটা ডিভিশন লাগাতে হবে, সেনাদলের কোন্ ভাগ কোন্ গতিতে কোন্ দিকে অগ্রসর হবে, এ সমস্ত ব্যাপার হিটলার একা বসে বসে রাতের পর রাত খেটে খেটে তৈরী করতেন।

অথচ আশ্চর্য, হিটলার কোনো দিন কোনো মিলিটারি স্কুলে যুদ্ধবিদ্যা শেখেননি। কাউকে গুরু বলে তিনি তো স্বীকার করেনইনি, এমন কি ঝুনো জাঁদরেলদের উপদেশও তিনি অবজ্ঞা করে যেতেন।

হিটলার গুরু বেছে নিয়েছিলেন রণবিদ্যার পূর্বাচার্যগণদের ভিতর থেকে। কাইটেল বলেন, হিটলার রণবিদ্যা শিখেছেন শ্লিফেন, মল্টকে এবং ক্লাউজেবিৎসের কাছ থেকে। পৃথিবীর যত বড় বড় যুদ্ধাভিযান হয়ে গিয়েছে, হিটলার সব কটা অধ্যয়ন করেছিলেন বহু বিনিদ্র যামিনী যাপন করে। বিশেষ করে ফ্রেডরিক দি গ্রেটের প্রত্যেকটি অভিযানের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

ফ্রান্সকে হারিয়েছেন একা হিটলার,—বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, গ্রীস জয় করেছেন একা হিটলার। মস্কো, স্তালিনগ্রাদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন একা হিটলার।

এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে হিটলার-বৈরী মসিয়ো কার্তিয়ে বার বার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং হিটলারের সামনে মাথা নিচু করেছেন। যুদ্ধ চালনায় অনভিজ্ঞ, মিলিটারি একাডেমির সঙ্গে সম্পর্কহীন এই অর্বাচীন কি অলৌকিক ক্ষমতাবলে এই সব বিরাট অভিযানের পরিকল্পনা সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলতে সক্ষম হল ? কি করে বুঝতে পারল যে, ট্যাঙ্ক এবং এরোপ্লেন দিয়ে এমন এক অভূতপূর্ব গতিবেগ প্রবর্তন করা যায়, যার সামনে ফ্রান্স ইংলণ্ডের পূর্বার্জিত সর্ব অভিজ্ঞতা নিষ্ফল, সর্ব কলাকৌশল 'বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে' ?

শেষ পর্যন্ত হিটলার পরাজিত হলেন। কেন পরাজিত হলেন তার অনুসন্ধান মসিয়ো কার্তিয়ে করেছেন। তাতে আর কিছু প্রমাণ হোক আর না হোক, অন্তত: এ তত্ত্বটি সপ্রমাণ হয়নি যে স্তালিন অথবা আইজেনহাওয়ার হিটলারের চেয়ে বেশী সমরবিদ্যা জানতেন।

তাই মসিয়ো কার্তিয়ে সসম্ভ্রমে বলেন, 'এই ভয়ঙ্কর লোকটির সব কিছু হয়ত ইতিহাসের স্মৃতিপট থেকে মুছে যাবে ; কিন্তু তিনি যে সব যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনা রেখে গেলেন সেগুলো যুদ্ধ-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সেই রকম মনোযোগই দিয়ে পড়বে যে মনোযোগ দিয়ে ছাত্রেরা ফ্রেডেরিক দি গ্রেটের অভিযান অধ্যয়ন করে।'

এ বিষয়ে কারো মনে কোনো দ্বিধা নেই।

দৈনিক বসুমতী

যে ভূতকে মারার জন্য তামাম দুনিয়ার তাবৎ সর্ষে জড়ো করে পিষে ছাতু করে ফেলতে হল, সেই ভূতকে জ্যান্ত করবার জন্য নাকি নবীন ভগীরথ নূতন তপস্যায় মগ্ন হয়েছেন।

হিটলার 'দানব' মারা গিয়েছে চার বৎসরও হয়নি—পরশু দিন এক জর্মান কাগজে পড়লুম, জেনারেল হাল্‌ডারকে বড়কর্তা বানিয়ে নূতন জার্মান চমূ গড়ে তোলবার জন্য মার্কিন এবং জার্মান উজীর-নাজিরের দল উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন। সংবাদটা চট করে কেউ বিশ্বাস করবেন না বলে খবরের কাগজখানা সযত্নে তুলে রেখেছি। কাগজখানা অন্য আরেকটি কাজে লাগবে। যাঁরা দিশী প্রবাদ-বাক্যের উপর নির্ভর করে এ-দুনিয়ায় চলা-ফেরা করেন, তাঁদের সামনে সপ্রমাণ করে দেব, মাথা না থাকলেও মাথা-ধরা হতে পারে,—জর্মান রাষ্ট্র নামে আজ কোনো পৃথক সত্তা নেই বটে, কিন্তু জার্মান বাহিনী তৎসত্ত্বেও গড়ে উঠতে পারে।

এই খবরের কাগজখানার রসবোধও আছে। সম্পাদক লিখেছেন, "গ্যোবেল্‌স্‌ সায়েব মরার পূর্বে দু'খানা বোম্বাই-সাইজ টাইম বম্‌ রেখে গিয়েছিলেন; তার পয়লাখানার ভিতরে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, 'হে জার্মানগণ, মার্কিন-ইংরেজ যে বলছে স্বাধীনতা আর সাম্য-মৈত্রীর জন্য তারা লড়ছে, সে কথা আরব্যোপন্যাসের মত অবিশ্বাস্য—তারা লড়াই জিতলে তোমরা যে 'স্বাধীনতা' পাবে সে দুরাশা কোরো না।"

এ বম্‌টা ফাটল মার্কিন-ইংরেজ জার্মানী দখল করার সঙ্গে সঙ্গে। 'স্বাধীনতা' মাথায় থাকুন,—অনাহারে রোগে-শোকে কত জার্মান যে এযাবৎ মহাপ্রভুদের 'সুশাসনে' মারা গিয়েছে, তার আদম-সুমারী এখনো আরম্ভ হয়নি। গ্যোবেল্‌স্‌ সায়েবের দুই নম্বরের বোমাতে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল 'কিন্তু জার্মানীকে বাদ দিয়ে মার্কিন-ইংরেজের চলবে না, সে-কথাও বলে দিচ্ছি। রুশকে ঠেকাতে পারে ইহজগতে একমাত্র জার্মান জাতই।'

জার্মান সম্পাদক বলছেন, 'এইবারে দুই নম্বরের বোমাখানা ফেটেছে।' যে জার্মানবাহিনীর ঠেলায় মার্কিন-ইংরেজ-রুশ মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছে, সেই জার্মানবাহিনীকে ফের জ্যান্ত করবার জন্য গণ্ডায় গণ্ডায় ভাগীরথী পশ্চিম জার্মানীতে নাবানো হচ্ছে—অর্থাৎ আমেরিকা থেকে বিস্তর খানাদানা আসছে, কলকব্জা বানাবার জন্য টাকা-পয়সা আসছে, রূঢ় কয়লার খনির আগুন যজ্ঞিবাড়ীর

মত ফের অষ্টপ্রহর জলতে আরম্ভ করেছে, বন্দুক-কামান বানাবার কারখানাগুলো ধ্বংস করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এক কথায় বলতে গেলে মার্শাল নামক যে গৌরীসেন দুনিয়ার আর সর্বত্র কাঁচা টাকা ঢালছেন, তিনি সব বিখ্যাত 'মার্শাল প্ল্যান' জার্মানীতেও চালাতে নারাজ নন, সে-কথাও বলে দিয়ে গিয়েছেন।

অর্থাৎ ভূতটা যাতে রাতারাতি দাবড়াতে আরম্ভ করতে পারে, তার জন্য রক্ত সংক্রমণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। মার্কিন নাগরিকের বড় দুঃখে জমানো টাকা—সবাই জানেন, মার্কিন টাকাকে রক্তের চেয়েও মূল্যবান মনে করে—ভাগীরথী বেয়ে পশ্চিম জার্মানীতে পৌঁচচ্ছে, পুষ্পকরথ চড়ে বার্লিনে ঝরে পড়ে সেখানকার মার্কিন-দোস্ত জার্মানদের কানে বেটোফেনের সঙ্গীতের চেয়েও মিষ্টি ঠুঠাং করে বাজছে।

অবিশ্বাস্য, সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কিন্তু পৃথিবীর তাবৎ জিনিসই যখন তুলনামূলক (এ কথাটাও 'রিলেটিভিটি' নাম দিয়ে এক জার্মানই প্রচার করে গিয়েছেন) তখন এর চেয়েও অবিশ্বাস্য আরেকখানা খবর যদি পরিবেশন করি, তবে হয়ত পাঠক উপরের খবরখানা বিশ্বাস করে ফেলবেন।

শাখ্‌টের নাম অনেকেই শুনেছেন। ইংরেজই তার হুনর-ভানুমতী দেখে তাকে wizard নাম দিয়েছে। টাকাকড়ি, ব্যাঙ্কিং বাবদে হেন ফন্দিফিকির নাকি নেই, যা তাঁর কাছে অজানা,—শুধু তাই নয়, এই স্বল্পপরিসর জীবনেই নাকি তিনি জার্মানের ধন-দৌলত দুবার বাঁচিয়ে দিয়েছেন। একবার ১৯২১-এ ইনফ্লেশন নামক নূতন জিনিস আবিষ্কার করে, এবং দ্বিতীয়বার দেউলে জার্মানীকে হিটলারের আমলে তালেবর করে দিয়ে।

সেই শাখ্‌টের বিরুদ্ধে এখনো নানা মোকদ্দমা চলছে। অপরাধ? তিনি নাকি গ্যোরিঙ, রিবেনট্রপের মত হিটলারের নন্দী-ভৃঙ্গীর দলে ছিলেন। তা সে যাই হোক তিনি কিন্তু এ-যাবৎ খালাসই হয়ে আসছেন, গোটা দুই মোকদ্দমা এখনো মুলতুবী আছে।

মোকদ্দমার ফাঁকে শাখ্‌ট্ সাহেব একখানা প্রামাণিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বিষয়, মার্শাল প্ল্যান। অস্মদ্দেশীয় কোনো দেশী-বিদেশী ভাষায় সেটি অনূদিত হয়নি বলে পাঠককে সেটি নিবেদন করছি।

শাখ্‌টের পেটে বহুৎ এলেম। তাই তাঁর ভাষা এবং বর্ণনশৈলী অতীব সরল। অতুলনীয় ভাষায় তিনি যে ক'টি কথা লিখেছেন, তার সারমর্ম হচ্ছে, 'হে মার্কিনগণ, মার্শাল প্ল্যান নামক যে দলিলে তোমরা আমাদের দস্তখত চাইছ তার দাম কিছুই নেই—অর্থাৎ তোমাদের মনে যদি ক্ষীণতম আশাও থাকে যে,

আমরা একদিন এ প্ল্যানের ঋণ পরিশোধ করতে পারব, তবে সে আশা শিকেয় তুলে রাখো।' (এ স্থানে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই যে, একদিন কাইজার যে রকম বেলজিয়ামের সঙ্গে সন্ধিপত্রকে 'স্ক্র্যাপ অফ পেপার' বলেছিলেন, শাখ্‌ট্ সেই কথাই বলেছেন অপেক্ষাকৃত সংস্কৃত ভাষায়) তার কারণ—

১। ঋণশোধ করার মত সোনা আমাদের কাছে নেই, কখনো হবে না। কাজেই সে প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

২। তাহলে তোমরা টাকার বদলে চাইবে তৈরী মাল (finished goods), কিন্তু তা নিয়ে তোমাদের লাভটা কি? তোমরা সে মাল বেচবে কোথায়? আপন দেশে? কিন্তু তোমরা তো নিজেই শিল্পপ্রধান (industrial) দেশ। আমাদের মাল যদি বাজারে ছাড়ো, তবে তোমাদের শিল্প কোণঠাসা হয়ে তোমাদের শিল্পের বিনাশসাধন হবে না? (শাখ্‌ট্ বলেননি, কিন্তু আমাদের স্মরণ আছে, ইংরেজ, বিশেষ করে ফরাসী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর কাছ থেকে এ রকম ফোকটে পাওয়া মাল নিয়ে মহা বিপদগ্রস্ত হয়েছিল)। তবে কি তোমরা আমেরিকার বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য বাজারে আমাদের দেওয়া মাল বেচবে; তাহলে সে সব জায়গায় তো প্রথম মার্কিন মাল সরিয়ে তারপর আমাদের মাল চালাতে হবে।

এই কথাটুকু বলে শাখ্‌ট্ সাদা কালিতে একটা কথা লিখেছেন—তার মর্ম আপনাদের আশীর্বাদে আমি ধরতে পেরেছি। তিনি লিখেছেন, 'বলিহারি তোমাদের বুদ্ধি' (এইটুকু সাদা কালিতে), 'হিটলারও তো ঠিক এই সুবিধেটাই চেয়েছিল। সেও তো বলেছিল যে, দুনিয়ার বাজার তোমরা চেপে ধরে বসে আছ। তোমাদের সোনার ধানে সব নৌকো ভরে গিয়েছে, তাকে আদপেই ঠাঁই দিচ্ছে না এবং শেষটায় হিটলার বাজার পাবার আশায়ই তো তোমাদের সঙ্গে লড়ল। যে বাজার তোমরা লড়াই করে বাঁচালে, সেই বাজার তোমরা খুশ-এখতেয়ারে 'ফ্রি, গ্র্যাটিস এণ্ড ফরনাথিং' আমাদের হাতে তুলে দেবে?

তারপর শাখ্‌ট্ কৌটিল্যের মত একখানা মোক্ষম তত্ত্বকথা ছেড়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমেরিকার মত শিল্পে উন্নত দেশ পয়সা যদি ধার দেয়, তবে ফেরৎ পাবার আশা করতে পারে একমাত্র সে সব দেশ থেকেই, যারা কাঁচামাল (raw material) বিক্রী করে। কারণ কাঁচা মালের প্রয়োজন তোমাদের সব সময়ই থাকবে।'

এবং শেষ কথা বলেছেন, 'অতএব, হে মার্কিনগণ, যদি কিছু ধারফার দাও, তবে ওটা দানের মত করেই দিয়ো। ওর জন্য মনের কোনো কোণে মায়া রেখ

না। ও পয়সা কখনই ফেরৎ পাবে না।'

শাখ্‌টের লেখা এ-সুসমাচার পড়ে মার্কিনরা কি বলেছেন, তার সন্ধান এখনো পাইনি।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, গাঁটের পয়সা খরচ করে, খাতকের টক-কথা বরদাস্ত করে, জার্মান 'দানব' গড়ে তোলা—এত সব বয়নাক্কা কেন?

বেদনাটা কোথায়? ভয়টা কিসের?

রুশ বর্গী আসছে। বুলবুলিতে যখন সব ধান খেয়ে ফেলেনি তখন সে ধান পাঠাও বস্তা বস্তা জার্মানীতে। সেখানে জার্মান মুর্গী পোষো। তারপর রুশ-দর্গায় জবাই করো, ফাঁড়াগর্দিশ যখন উপস্থিত হবে।

অবশ্যি জার্মানীও জানে, কার যেন ভালোবাসা, কিসের যেন মুর্গী পোষা।

দৈনিক বসুমতী

মার্শাল-মার্গ

সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, ভালো-মন্দ সংসারের সব জিনিস জোড়ায় জোড়ায় দেখা এক-রকম লোকের স্বভাব। এদের পিছনে রয়েছেন সাংখ্যকার—তিনি বলেন, প্রকৃতি এবং পুরুষ এই দুই মূল বস্তু স্বীকার করে নিলে বাদবাকী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ছকে ফেলে বিশ্লেষণ করে ফেলা যায়।

আজকের দিনে এঁরাই বলেছেন, 'সংসারে মাত্র দুটি পন্থা এখন দেখতে পাচ্ছি। তার একটা কম্যুনিজম, অন্যটি ক্যাপিটালিজম। কম্যুনিজম বলতে এখন বোঝায়, স্তালিন যে-রাজ্য চালান তার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করে পৃথিবীর সর্বত্র সে-রাজ্য বিস্তারকল্পে আপন আপন দেশে শক্ত দল গড়ে তোলা এবং তার আদর্শ হবে স্তালিনকে কেন্দ্র করে শ্রমিক-মজুরের বিশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। আর ক্যাপিটালিজম বলতে বোঝায়, আপন আপন দেশ নিজের পছন্দমত অর্থনীতি রাজনীতি চালিয়ে আপন আদর্শের দিকে চলবে।

কম্যুনিস্টরা বলে, 'দেশে দেশে তোমরা যে জাতীয়তাবোধকে উস্কানি দিচ্ছো তার ফল কি হয় ১৯১৪-১৮ এবং ১৯৩৯-৪৫-এও কি তা দেখতে পেলে না? আর লড়াইয়েই যদি সব দুঃখ শেষ হয়ে যেত তা হলেও কোনো ভাবনা ছিল না—কিন্তু আসল মারটা তো আসে লড়াই শেষ হয়ে যাওয়ার পর। তখন আরম্ভ হয় অভাব-অনটন, বেকার-সমস্যা, রোগ-শোক, মহামারী। প্রত্যেক দেশ তখন চেষ্টা করে নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য, সর্বপ্রকারের সহযোগিতা তখন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এক দেশে মন মন ধান নষ্ট হয় খাওয়ার লোক নেই বলে, আরেক দেশে লক্ষ

লক্ষ লোক মরে খাবার চাল নেই বলে।'

ক্যাপিটালিস্টরা উত্তরে বলে, 'তোমাদের 'ভূস্বর্গ' রুশিয়াতে কি অভাব-অনটন নেই ? রোগ-শোক-মহামারী কি সেখান থেকে লোপ পেয়েছে ? বরঞ্চ শুনতে পাই, তোমাদের 'ভূস্বর্গ' রুশিয়াতে গত ত্রিশ বৎসরে যত লোক না খেতে পেয়ে মরেছে তার অর্ধেক লোকও আর কোথাও না খেতে পেয়ে মরেনি। কিন্তু এহো বাহ্য। আসল কথা হচ্ছে এই, তোমরা কেন ধরে নিচ্ছ যে তোমাদের পন্থা ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় সহযোগিতা সম্ভবপর নয়। তোমরা কেন ধরে নিচ্ছ, আমাদের ভিতর চিরকালই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, খুনোখুনি, মারামারি চলবে ?'

এইখানটায় এসে কম্যুনিস্টরা একটু বিপদে পড়েন। কম্যুনিস্টদের আপ্তবাক্য, তাদের বেদ-বাইবেল-পুরাণ হল মার্কস সায়েবের কেতাব। তাতে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, 'ক্যাপিটালিজমের আসল ধর্ম হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মাৎস্যন্যায়। যত দিন যাবে মারামারি খুনোখুনি করবে তারা ততো বেশী। একে অন্যকে বিনাশ করে শেষটায় তারা সকলেই সমূলে বিনষ্ট হবে—অর্থাৎ ক্যাপিটালিজম তখন শিব হয়ে গেল। সেই শ্মশানে তখন ফুটে উঠবে কম্যুনিজমের রসমঞ্জরী।' কিন্তু গত লড়াইয়ের সময় দেখা গেল, ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলো দিব্য একজন আরেকজনের সহযোগিতা করল, শুধু তাই নয়, শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে দ্বন্দ্ব শান্তির সময় উগ্র হতে উগ্রতর হতে চলছিল সেই দ্বন্দ্ব লড়াইয়ের সময় উগ্রতম না হয়ে সব শ্রেণী এক অদ্ভুত সহযোগিতার পরিচয় দিল। ক্যাপিটালিস্টের বড় গোসাঁই চার্চিলের ডাকে ইংলণ্ডের চাষা-মজুর যে স্বতঃপ্রবৃত্ত সাড়া দিল, সে রকম ধারা সাড়া স্তালিনকেও আপন দেশে দেখাতে বেগ পেতে হবে।

প্রমাণ হয়ে গেল, অন্ততঃ এই ব্যাপারে মার্কস সায়েবের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল (আরেক ব্যাপারে যে তিনি ভুল বলেছিলেন সেটা হচ্ছে, রুশিয়াতে সর্বপ্রথম মজুর-রাজ বসতে পারে তার তিনি কল্পনাও করতে পারেননি—কিন্তু সে প্রস্তাব এখানে অবান্তর), এবং এই প্রমাণটি অতি প্রাঞ্জল ভাষায়, আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সপ্রমাণ করে দিলেন রুশিয়ার সব চেয়ে বড় অর্থনৈতিক পণ্ডিত 'ভাগা'-সায়েব ! মস্কোর বুকের উপর বসে রুশিয়ার সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক জ্ঞানকেন্দ্রের সভাপতি হিসাবে তিনি যখন এই মার্কসদ্রোহী 'কাফির' ফতোয়াখানা ছাড়লেন তখন স্বয়ং স্তালিন দিশেহারা হয়ে গেলেন। ভাগাকে ডিসমিস করা হল। অর্থাৎ তাঁকে পেন্সন দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হল।

বেদনাটা এইখানেই। কম্যুনিস্টরা কখনো আঁচতে পারেনি যে, ক্যাপিটা-লিস্টদের ভিতরে এখনো এতটা প্রাণশক্তি রয়েছে যে, তারা এখনো বাঁচতে জানে,

অর্থাৎ বিপদ সামনে দেখলে তারা আর দিশেহারা হয়ে মারামারি করে লাইফ-বোটটাকে ভেঙে তো ফেলেই না, এমন কি প্রাণ বিসর্জন দিয়ে, সহযোগিতা করে, আসল জাহাজখানাকেই ফের চালু করে তোলে। তারাও প্ল্যান-মাফিক কাজ করতে শিখে গিয়েছে। এই প্ল্যানের নামই মার্শাল-প্ল্যান।

দৈনিক বসুমতী

আরব্য-রজনীর অরুণোদয়

আরব্য উপন্যাসের কৃপায় বিশ্বজন খলীফা হারুন অর্‌-রশীদের বাগদাদ চেনে। মীর মুশরফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' একদা বাঙালী মাত্রেই পড়তো এবং সেই সূত্রে ফুরং (ইউফ্রেটিস), কারবালা এবং কুফা নগরী, বাগদাদ শহরের সঙ্গে সুপরিচিত ছিল। ইদানীং মোটরগাড়ী চালু হওয়ার ফলে অনেকেই পেট্রোলের খবর রাখেন এবং ইরানের মুসাদ্দিক যখন আপন পেট্রোল আপন ঘরে তুলতে চাইলেন, তখন সেই সূত্রে অনেকেই ইরাকের তেলের খবরও পেলেন। বাস্তিল পতনের দিন বাগদাদে যে রাষ্ট্র-বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে, তার পিছনে রয়েছে এই 'স্নেহ' বা তেলের উৎস—যদিও সেটা এখন রণ-দামামার অট্টরবের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছে।

আরবভূমি (জজীরাতু ল্‌-অরবীয়া) ইরাক (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মেসো-পটোমিয়া নামে পরিচিত), সীরিয়া (অশ্‌-শাম্‌ বা শাম্‌—শামী কাবাব যেখান থেকে এসেছে), লেবানন (লুব্‌নান). ট্রান্স-জর্ডন বা শুধু জর্ডন (উরদুন), সউদী আরব (মক্কা-মদীনা নিয়ে হিজ্‌জাজ এবং মধ্য আরবের নেজ্‌দ্‌ নিয়ে এ রাষ্ট্র গঠিত), ইয়েমেন (ইয়েমেন শব্দের অর্থ আরবীতে দক্ষিণ ও শাম্‌ অর্থ উত্তর—অর্থাৎ আরবভূমির দক্ষিণ এবং উত্তর সীমানা) ও প্যালেস্টাইন নিয়ে সম্পূর্ণ আরব ভূখণ্ড। এ-ছাড়া আদস বন্দর অঞ্চলের এডেন প্রটেকটরেট-হাদ্রামুত, ওমন, কুয়েৎ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে এবং এসব জায়গায় ইংরেজের প্রাধান্য!

(আদনের ঠিক সামনেই সোকোত্রা দ্বীপ। একদা এ দ্বীপ ভারতবর্ষের অধিকারে ছিল। সোকোত্রা নাকি সংস্কৃত 'সুখাধার' শব্দ থেকে এসেছে।)

আরবভূমির ৯৫ থেকে ৯৮ জন লোক মুসলমান এবং এদের ভাষা আরবী। কিন্তু লেবাননের শতকরা ৫৩% লোক খৃষ্টান এবং বিপদে পড়লেই পশ্চিমের খৃষ্টানদের কাছে সাহায্য চায়। অবশ্য এদের ভিতরও বেশ কিছু জাতীয়তাবাদী আছে, যারা দেশের ঝগড়াঝাঁটির ভিতর বিদেশীর আগমন পছন্দ করে না। খৃষ্টানদের মাতৃ-ভাষাও আরবী। রাষ্ট্রের নেতা সাধারণতঃ খৃষ্টানই হয়ে থাকেন ও প্রধানমন্ত্রী মুসলমান।

১৯১৪ সাল অবধি প্যালেস্টাইনের শতকরা নব্বুই থেকে পঁচানব্বুই জন

অধিবাসী ছিল মুসলমান, বাদবাকী খৃষ্টান এবং ইহুদী। এখন অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে।

এই দুই অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাদ দিলে তাবৎ আরবভূমি ইসলামের অনুপ্রেরণায় চলে। কিন্তু খৃষ্টান আরবদের জাতীয়তা আন্দোলনে আকর্ষণ করার জন্য অনেক সময় ধর্মনিরপেক্ষ প্রপাগাণ্ডা চালানো হয়। ইদানীং সীরিয়া ও বাগদাদে কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রচারিত হওয়ার ফলে এই ধর্মনিরপেক্ষতা আরো জোর পেয়েছে। সোমবার রাত্রে বাগদাদ বেতার কেন্দ্র যে আনন্দোল্লাস করছিল, তাতে ঘন ঘন 'আল্লাহ আকবর' (আল্লা সর্বমহান) ধ্বনি হুঙ্কারিত হলেও সমগ্র আরবভূমির ইসলামী ঐক্য সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করা হয়নি। বলা বাহুল্য, বাগদাদ কাইরোর আরব খৃষ্টানরাও দৈনন্দিন জীবনে ভগবানের নাম স্মরণ করার সময় 'আল্লাহু আকবর' বলে থাকে।

আফ্রিকার মিশরকে যদিও আরবভূমি বলা যায় না, তবু স্মরণ রাখা ভালো যে সেখানকার শতকরা নব্বুইজন লোকের ধর্ম ইসলাম ও শতকরা ৯৮ জন (খৃষ্টান কপট্‌দের নিয়ে) আরবী বলে থাকে। এবং এই মিশরই আরবভূমির নব জাগরণের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে—প্রধানতঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা। তাই মিশরকে বাদ দিয়ে জজীরাতুন অরবীয়া সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করা যায় না।

ইরাকের বর্তমান রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরিপূর্ণ ইতিহাস দিতে হলে হজরৎ মুহম্মদ সাহেবকে দিয়ে আরম্ভ করতে হয়, এবং তার সরল অর্থ সৈয়দ আমির আলী কৃত 'হিস্ট্রী অব্ দি সেরাসীন্‌স' পুস্তকখানা সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি করে আরো একটি নূতন ভল্যুম তার সঙ্গে জুড়তে হয়। সংবাদপত্র তার জন্য প্রশস্ত নয়, অতএব যেটুকু না বললেই নয় সেটুকু সংক্ষেপে সমাধান করি।

মহাপুরুষ মুহম্মদ ও তাঁর শিষ্যগণের সময় মদীনা ছিল আরব-ভুবনের কেন্দ্রভূমি। পরবর্তী যুগে দামাস্কস্ (দিমিশ্‌ক—শামের রাজধানী), তারপর বাগদাদ এবং সর্বশেষে ইস্তাম্বুল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর (এ-দেশে যখন খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ হয়) খলীফার সঙ্গে মুস্‌লিম জগতের কেন্দ্রভূমি লোপ পায়। এরপর রাজা ইবনে সউদ মক্কাকে কেন্দ্রভূমি করার চেষ্টা করে নিষ্ফল হন এবং অধুনা নজীব-নাসির কাইরোকে মুসলিম-জহান না হোক আরব-ভুবনের কেন্দ্রভূমি করার চেষ্টা করছেন। সউদী আরব অবশ্য এ-চেষ্টা এখনো ছাড়েনি, কারণ হাজার হোক এখনো প্রতি বৎসর পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মুসলমান নরনারী হজ করতে মক্কা যায়—এবং কুরান শরীফে মক্কাকেই ইসলামের কেন্দ্রভূমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নাসির আর যা-খুশী তাই করতে পারেন, কিন্তু নামাজ পড়ার সময় তাকে মক্কার দিকেই মুখ করতে হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মধ্যপ্রাচ্যে যে তুমুল হট্টগোল লেগেছে, যার পানে পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবৎ রাষ্ট্র—যায় মার্কিন রুশ—এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে, সে সম্বন্ধে সউদী আরব কোনো উচ্চবাচ্য করছে না। হয়তো সে ভাবে মার্কিনের সঙ্গে লড়াই করে এরা সব নিঃশেষ হয়ে যাক্—বিশেষ করে নাসির—তাহলে তারপর আমি আরব-মিশরের উপর রাজত্ব করবো। এ অভিলাষ যে ভ্রমাত্মক সে কথা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। কারণ মার্কিন যদি নাসির-মতবাদকে ধ্বংস করে তবে তাকেও একদিন ঐ একই বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। সে-কথা পরে হবে।

* * *

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তাবৎ আরবভূমি তুর্কীর খলীফার হুকুমে চলতো। এমন কি মক্কার শরীফ (পবিত্র কৃষ্ণ প্রস্তর কাবার রক্ষাকর্তা) হজরৎ মুহম্মদের কুরেশ বংশধর হাশিমী-প্রধানকেও (এই হাসিমী বংশেরই দুই প্রধান যথাক্রমে বর্তমান ইরাক ও জর্ডনের রাজা) তুর্কী খলীফার হুকুমমতো চলতে হত। যুদ্ধ লাগার পর ইনি ইংরেজের সাহায্যে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। এটাকে কিন্তু বিদেশী তুর্কের আধিপত্য থেকে আরবের মুক্তি প্রয়াসের ন্যাশনালিজম নাম দিলে ভুল করা হবে, যদিও এই জিগির তুলেই শরীফ হুসেন আরবদের কিছুটা সমর্থন পেয়েছিলেন। আসলে এটা ডাইনেস্টিক বা রাজবংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা। মূলত অবশ্য এর পিছনে ছিল ইংরেজ। যারা লরেন্সের 'সেভ্ন্ পিলারজ অব উইজ্‌ডম্' পড়েছেন বাকি কাহিনী তাঁদের আর বলতে হবে না। এই শরীফগোষ্ঠী এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ ইংরেজের সাহায্যে তুর্কীর প্রচুর ক্ষতি করতে পেরেছিল বটে, কিন্তু তুর্কীর যুদ্ধে পরাজয় যে প্রধানতঃ ঐ কারণেই হয়েছিল এ-কথা আজও কেউ বলেনি।

আরব জয়চন্দ্র এই যে খাল কেটে ঘরে কুমীর আনলেন, তারই খেসারতী সম্পূর্ণ আরবভূমিকে আজো চোখের জলে নাকের জলে দিতে হচ্ছে। লাভের মধ্যে তাঁর এক বংশধর এখন জর্ডনের টলটলায়মান সিংহাসনে বসে তাঁরই প্রপিতামহের স্মরণে ইংরেজকে ডাকছেন এবং অন্যজন নাকি এ সবের অতীত হয়ে অন্য লোকে চলে গিয়েছেন। কিন্তু এ-সব পরের কথা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হাশিমীগোষ্ঠী অবাক হয়ে দেখে, 'সেল্ফ্-ডিটারমিনেশন্ অব্ দি পিপলস', 'জনগণের স্বরাজলাভ' ইত্যাদি জিগির তুলে যে পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ হাশিমী তথা আরবদের কিয়দংশ তুর্কীর বিরুদ্ধে তাতিয়েছিল, তারাই তাবৎ আরবভূমি গ্রাস করে বসে আছে! এমন কি মক্কার শরীফ হুসেনকেও

নাকি বলতে হবে, তিনি এখন আর তুর্কীর খলীফার মনোনীত প্রতিনিধি নন, এখন তিনি ইংলেণ্ডের (খৃষ্টান !) রাজার প্রতিনিধি হয়ে মুসলমানের পুণ্যভূমি মক্কা-মদীনার তদারকী করবেন ! অর্থাৎ ইস্তেক কাবা পর্যন্ত খৃষ্টানের তাঁবেতে চলে গেল ! মহাপুরুষ মুহম্মদের পরে এ দুর্দৈব ঘটলো এই প্রথম। বিশ্ব মুসলিমের জিগরে তাতে কতখানি চোট লেগেছিল, সে কথা আর বর্ণনা দিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। এ-দেশে পর্যন্ত তার ঢেউ এসে যে খেলাফতী আন্দোলনের উচ্ছ্বাস জাগিয়ে তুলেছিল সে-কথা বয়স্কদের স্মরণে থাকার কথা।

কিন্তু ইংরেজ কবলো ব্যাকরণে সামান্য একটি ভুল। আরবভূমি ভাগাভাগি করার সময় সে ফ্রান্সকে দিল শিকার করা হরিণের ল্যাজটুকু অর্থাৎ সীরিয়া। ফ্রান্স গেল ভয়ঙ্কর রেগে। কিন্তু ঐ নিয়ে তো আব আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ বাধানো যায় না। ফ্রান্স লেগে গেল দাদের সন্ধানে।

ইতিমধ্যে মুস্তফা কামাল পাশা তুর্কী থেকে ইংরেজ আধিপত্য সরাবার জন্য লাগালেন লড়াই। ফ্রান্স বিষমোল্লাসে, অবশ্য গোপনে, সীরিয়ায় সঞ্চিত তার অস্ত্রশস্ত্র দিল মুস্তাফা কামালেব হাতে তুলে। লয়েড জর্জ তুর্কীর ইংরেজ সৈন্যদের বাঁচাবার জন্য বিশ্ব-খৃষ্টানকে আহ্বান করলেন। ফ্রান্স তো গোপনে কামালকে সাহায্য করছেই—আমেরিকা ও ততদিনে কেটে পড়েছে—কেউ সাহায্য করলো না। ইংরেজ সৈন্য তুর্কী ছেড়ে পালালো। কামাল নয়ী তুর্কী গড়ে তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে সীরিয়াও পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে গেল।

ইংরেজ তখন প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের এনে সেখানে সাম্রাজ্যবাদীর ঘাঁটি নির্মাণে তৎপর হল।

* * * *

এই তাবৎ ঘাত-প্রতিঘাতেব ভিতর মধ্য আরবিস্তানের ঊষর মরুভূমি নেজ্‌দের ওয়াহ্‌হাবী (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে বাংলা দেশের স্বাধীনতাকামী বীর দুদু মিয়া ও তীতু মীর দুজনাই ওয়াহ্‌হাবী ছিলেন) রাজা ইবনে সঊদ তাঁব সুযোগেব প্রহর গুণছিলেন। এই সঊদী বংশ শরীফের হাশিমী বংশের জন্মশত্রু। মক্কার শরীফ যখন ইংরেজের তাঁবুতে চলে যাওয়ায় মক্কাও কার্যতঃ খৃষ্টানের হাতে চলে গেল তখন 'কাবা ইন্ ডেনজার' এই মর্মভেদী বাণী প্রচার করে তিনি আরব বেদুইনদের এক ঝাণ্ডার নিচে জমায়েৎ কবে চললেন মক্কাব উদ্দেশে। শরীফ প্রমাদ গুণে তারস্বরে ইংরেজের সাহায্য চাইলেন। ইংরেজের তখন দুহাত ভর্তি। সে কোনো সাহায্য করতে পারলো না। স্বাধীন রাজা ইবনে সঊদ মক্কা-মদীনার রাজা হলেন। বিশ্ব মুসলিম আশ্বস্ত হল।

সমস্ত আরবভূমি যায় যায় দেখে ইংরেজ তখন জর্ডন ও ইরাকে দুই হাশিমী রাজা বসালো। আবদুল্লাকে জর্ডনে ও ফৈসলকে ইরাকে। ইরাকের শেষ রাজা এই ফৈসলের পৌত্র।

(২)

মিশর দেশ যদিও আফ্রিকায় অবস্থিত ও সেখানকার আরব ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে দেশীয় রক্তের প্রচুর সংমিশ্রণ হয়েছে তবু সেখানকার ভাষা আরবী, জনসাধারণ প্রধানত মুসলমান এবং সবচেয়ে বড় কথা কাইরোর অল-অজ্‌হর বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র। ইরাক, লেবানন, সিরিয়া এমন কি ইসলামের জন্মভূমি মক্কা-মদীনার ছাত্ররাও উচ্চশিক্ষার জন্য অজ্‌হরেই যায়। ভারতীয় ছাত্রদের জন্যও সেখানে বিশেষ হোস্টেল আছে। মক্কাতে যে রকম হজের সময় বিশ্ব-মুসলিম নানা রকমের রাজনৈতিক মতবাদে তালিম পায়, কাইরোতে ঠিক সেই রকম সম্বৎসরই রাজনৈতিক চর্চা হয়। তদুপরি নাইল-প্লাবিতা মিশরভূমি অর্থশালিনীও বটেন।

কাজেই মিশরকে আরব ভূখণ্ডের অংশ বলেই ধরে নিতে হয়। এবং তা হলে উপস্থিত এ-ভূখণ্ডে চারিটি শক্তি বিরাজমান।

১। মিশর। এর জনসাধারণ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের তিক্ত আস্বাদ প্রচুর পেয়েছে। তবু তারা সহজে যে কোনো রাজনৈতিক দলে ভিড়ছে তা নয়, প্রায় বাধ্য হয়েই তাকে রাশার সঙ্গে কিঞ্চিৎ মিতালী করতে হয়েছে।

২। সউদী আরব। মিশরের সঙ্গে তার দৃশ্যমান কোন শত্রুতা না থাকলেও সউদী আরবও বিশ্ব-মুসলিমের কেন্দ্রভূমি হতে চায় ও সে-স্থলে মিশরের সঙ্গে তার শত্রুতা না থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রগতির দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে এ ভূমি সবচেয়ে পশ্চাৎপদ। আমেরিকাকে তেল বিক্রি করে এরা প্রচুর পয়সা কামায় বলে এরা কিছুটা মার্কিন-ঘেঁষা। কিন্তু সুযোগ পেলে মার্কিনকে ঝেড়ে ফেলে নিজের তেল নিজেই বিক্রি করার চেষ্টা করলেও করতে পারে। এদের বংশগত শত্রুতা কিন্তু হাশিমীদের সঙ্গে—অর্থাৎ জর্ডন ও ইরাকের রাজপরিবারের সঙ্গে।

৩। হাশিমী পরিবার। এঁদের একজন এখনো জর্ডনের রাজা। অন্য জনের রাজত্ব গেছে এবং বাগদাদ বেতার কেন্দ্র আজকাল অতি গর্বের সঙ্গে 'জম্‌হুরীয়াতুল ইরাকীয়া' অর্থাৎ 'ইরাক রিপাবলিক' বলে আত্মপরিচয় অভিজ্ঞান বাণী প্রচার করে ও সমস্ত রাত ধরে 'রব্বুল-আম' অর্থাৎ 'জনগণ অধিনায়কে'র

প্রশস্তি গায়। এই 'রব্ব্ল-আম' সমাসটি আমি ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। সাধারণত আল্লার প্রশস্তি গাওয়ার সময় বলা হয়, 'রব্ব্ল্ আলিমীন' (দুই ভুবনের দৃশ্য ও অদৃশ্য—অধিনায়ক), কিম্বা 'রব্ব্ল্ মুসলিমীন' (মুসলিমদের অধিনায়ক) কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু একটা।

৪। সীরিয়ার গণতন্ত্র। খাস আরব ভূখণ্ডে একা বলে (লেবানন যদিও রিপাব্লিক তবু সেখানকার খৃষ্টান-প্রাধান্য দুই গণতন্ত্রের সৌহার্দ্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল) সে মিশরের সঙ্গে মিলে গিয়ে যুক্তগণরাষ্ট্র নির্মাণ করেছিল। সীরিয়াতে রুশ-প্রাধান্য বেশ কিছুটা আছে এবং পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে সুয়েজ-সঙ্কটের সময় সীরিয়া রাশাকে তার দেশে জঙ্গী বিমান অবতরণ করতে দেয়। বর্তমানে ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সীরিযার শক্তি বৃদ্ধি হল।

রাষ্ট্র হিসাবে লেবানন এদের থেকে একটু আলাদা থাকে। লেবাননের খৃষ্টান প্রাধান্য তার অন্যতম কারণ। আধুনিক ইয়োরোপীয় শিক্ষাদীক্ষায় কিন্তু ইসরাইলের পরেই তার স্থান। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকানরা এখানে একটি কলেজ খোলে ও পরে সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এদের প্রকাশিত বহু আরবী পুস্তক প্রাচ্যপ্রতীচ্যে যশ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জেসুইট্‌রাও আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলে। এসব সত্ত্বেও লেবাননে রাজনৈতিক ঐক্যসাধন করা কঠিন। খ্রীষ্টান ও মুসলমানের সংখ্যা যদিও প্রায় সমান তবু খ্রীষ্টানরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, মুসলমানরাও প্রায় সমান সমান শীয়া সুন্নীতে বিভক্ত এবং তার উপর ড্রুজ মুসলমানরাও রয়েছে। আমেরিকানরা যখন বলে, তাদের লেবাননে নামার অন্যতম উদ্দেশ্য সে দেশের খৃষ্টানদের রক্ষা করা তখন সেটা নিছক মিথ্যা নয়। যদিও ধর্মের জন্য ব্যাপক খুনোখুনী সেখানে হয়েছে বলে জানি নে। বরঞ্চ ড্রুজ মুসলিমদের উপর সুন্নী মুসলমানদের প্রচুর আক্রোশ বহু যুগ ধরে বর্তমান।

আরবরা ইসরাইলকে আরব ভূখণ্ডের অংশ বলেই ধরে এবং সুযোগ পেলে ইহুদিদের যে সমূলে বিনাশ করবে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বলতে গেলে ইসরাইলই এখন আরবভূমির সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। ইসরাইল তার প্রাণের মায়ায় মার্কিন-ইংরেজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং এক লেবানন ছাড়া আর সকলেই তার জানের দুশমন্।

তুর্কী আরব ভূখণ্ডের অংশ নয়, এবং তুর্কীর মাতৃভাষা ওস্‌মানলী-তুর্কী ভাষা কিন্তু যেহেতু তুর্করা মুসলমান এবং বহু যুগ ধরে আরব ও মিশরের উপর রাজত্ব করেছে তাই আরবের ভবিষ্যতের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎও বিজড়িত। অবশ্য তুর্কীর সবচেয়ে কঠিন শিরঃপীড়া রুশকে নিয়ে। রুশের ভয়ে শেষ পর্যন্ত সে মার্কিনের

শরণ নিয়েছে। রুশ কৃষ্ণসাগরে নৌ-বাহিনীর মোহড়া দেবে এ খবর বৃহস্পতিবার দিনে রাষ্ট্র হয়। মার্কিন সৈন্যও ঐ সময়ে তুর্কীতে নামে।

তাহলে মোটামুটি দাঁড়ালো এই ;—

জর্ডন, ইসরাইল ও তুর্কী মনেপ্রাণে মার্কিন সাহায্য চায়। ইসরাইলের সবাই চায়, জর্ডনের জনগণ খুব সম্ভব চায় না কিন্তু রাজা চান, লেবাননের কর্তৃপক্ষ চান কিন্তু বিদ্রোহীরা অবশ্যই চায় না, তুর্কীর অধিকাংশ লোক অনিচ্ছায় চায়। সিরীয়া, ইরাক ও মিশর মার্কিন-ইংরেজকে তাড়াতে চায়। রুশের সাহায্য কতখানি প্রত্যাশা করে বলা কঠিন। জীবনমরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ালে যে রুশকে আমন্ত্রণ জানাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিম্বা রুশ নিজের থেকেই নামতে পারে। বিশ্ব-কম্যুনিস্ট রুশের দিকে তাকিয়ে আছে সে গণতান্ত্রিক এবং স্বাধীনতাকামীদের সাহায্য করে কিনা, কাজেই শেষ পর্যন্ত হয়তো তাকে অনিচ্ছায়ই নামতে হবে। 'অনিচ্ছায়' এই কারণে বললুম যে যুদ্ধ-বিশারদ পণ্ডিত ক্লাউজেভিস্ বলেছেন, 'সংগ্রামে নামবে তোমার সুবিধামত পছন্দ-মাফিক সময়ে—শত্রুর আহ্বানে নয়।' আমেরিকা হয়তো স্থির করেছে, রুশের আর শক্তিবৃদ্ধি হতে দেওয়া নয়, এইবারেই লড়ে নেওয়া ভালো। রুশ হয়তো ভাবছে, 'এখনো আমার সময় হয়নি।'

প্রত্যক্ষত তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সঙ্কটের পাত্র উপচে পড়লো ইরাক নিয়ে। সেখানে ইংরেজের তেলের স্বার্থ কিন্তু এ-সম্পর্কে ইংরেজের রাজনৈতিক বুদ্ধির তারিফ না করে থাকা যায় না। সুয়েজ কানালের ব্যাপারে ইংরেজ তো আমেরিকাকে নামাতেই পারলো না, বরঞ্চ বিশ্বজনের নির্মম কটু-কাটব্য শুনতে হল, পরাজয়ও মানতে হল। এবারে ইংরেজ প্রথমে নামালো মার্কিনকে, নিজে নামলো পরে। তবে ভয় হয়, ভালোয় ভালোয় সব কিছু মিটে যাবার পর হয়তো মার্কিনরা ইরাকের তেলের বখরা চেয়ে বসবে। বাংলায় বলি, 'ফেলো কড়ি মাখো তেল।' এ-ক্ষেত্রে হবে 'ফেলো তেল, পাবে না কড়ি।'

বাগদাদের এ-বিপ্লব অনেকদিন আগেই হওয়া উচিত ছিল। নূরী অস্-সঈদ ('সৈয়দ' নয়) ত্রিশ বৎসর ধরে যে রাজনীতি চালিয়েছেন তার মধ্যে তার ইংরেজ-প্রীতিই যে সবচেয়ে নিন্দনীয় ছিল তা নয়। কিন্তু সভ্যতার যে প্যাটার্নের তিনি ইচ্ছা-অনিচ্ছায় প্রতিভূ ছিলেন সেটা সামন্তবাদ প্যাটার্ন। ইংরেজের কাছে তেল বিক্রী করে যে পয়সা আসতো সেটা সামন্তবাদের খপ্পরেই চলে যেত। ওদিকে ভিতরে ভিতরে জনসাধারণ নূরী এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নেতাদের চেয়ে প্রগতি চিন্তায় অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছিল। তবু নূরী হয়তো সামলে নিতে পারতেন

যদি না তিনি 'ছোটা ডিকটেটরি' স্টাইলে শুধু রাজার সাহায্যে দেশ না চালাতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর জনসাধারণ কতখানি এগিয়ে গিয়েছে তিনি বুঝতে পারেন নি। এ প্যাটার্নটা মিশরের সঙ্গে মিলে যায়। ওয়াফদ্ দলের নেতা এবং রাজা ফারুকও বুঝতে পারেননি মিশরীয় ফল্লাহ (চাষা) কতখানি এগিয়ে গিয়েছে। ফলে রাজা সিংহাসন হারালেন, ওয়াফদের অস্তিত্ব লোপ পেল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় মিশর এবং ইরাকে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব করলো আর্মি-অফিসাররা। প্রকৃত গণ-আন্দোলনে দেশের সেনানীও যোগ দেবে এ তো ন্যায্য কথা কিন্তু আর্মি-অফিসারদের নেতৃত্বে এবং মোল্লা-পুরুতের নেতৃত্বে কোনো তফাৎ নেই। এদের কেউই সত্যকার গণতন্ত্র চায় না। 'ডিসিপ্লিন', 'শাস্ত্রাধিকারের' দোহাই কেড়ে এরা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক মর্যাদা ও অধিকার পদে পদে খণ্ডন করতে চায়।

আমরা শান্তিকামী, এবং পণ্ডিতজী বাগদাদ সম্পর্কে যা বলেছেন তা যে বাগদাদের চিত্ত জয় করতে সক্ষম হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কাল রাত্রে বাগদাদ বেতার পণ্ডিতজীর সম্পূর্ণ উক্তিটি একাধিকবার প্রচার করেছে— শ্রদ্ধার সঙ্গে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

মরূদ্যান না মরীচিকা ?

১৪ই জুলাই ইরাকে যে রাষ্ট্রবিপ্লব হল তাই দিয়ে ব্যাপারটার আরম্ভ নয়। এর কিছুদিন পূর্বেই লেবাননের প্রেসিডেণ্ট রাষ্ট্রপুঞ্জকে জানান যে, তাঁর দেশে যে অল্প-স্বল্প বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তার পিছনে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিরিয়ার প্ররোচনা এবং অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য রয়েছে। ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জ লেবাননে কয়েকজন 'পরিদর্শক' পাঠান এবং এঁরা যখন তদারকিতে ব্যস্ত এমন সময় ফাটল ইরাকী বোমা! প্রেসিডেণ্ট শামুন তখন রীতিমত ভয় পেলেন, কারণ ইরাক যে সিরিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে লেবাননকে আরও বিপদে ফেলবে, সে সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন দ্বিধা ছিল না। বস্ত্রাকর্ষিতা দ্রৌপদীর ন্যায় তিনি তখন গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। অন্তত তাই করলে ভাল হত। তিনি স্মরণ করলেন মার্কিনিংরেজকে। ফলে মার্কিন সৈন্য নামল লেবাননে এবং ইংরেজ গেল তারই দোসর জর্ডনে।

সঙ্গে সঙ্গে রুশ উদ্ধত এবং অকুণ্ঠ ভাষায় বললে, কর্মটি সর্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ। রাষ্ট্রপুঞ্জ যখন তার পরিদর্শক মারফতে লেবাননের তদারকিতে লিপ্ত তখন রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্ত

কোন সদস্যকে কিছুমাত্র না জানিয়ে এরকম সৈন্য নামানো বিশ্বশান্তি নষ্ট করা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

বিশ্বের পরম সৌভাগ্য যে, তখন রুশ উত্তপ্ত দুর্যোধনের ন্যায় 'সূচ্যগ্রেণ—' রব ছেড়ে সিরিয়া কিংবা ইরাকী সীমান্তে সৈন্য পাঠায়নি, ভান করেছিল মাত্র। আসলে সে তার সুবুদ্ধির পরিচয় দিল বিশ্বের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট করে এবং তাই নিয়ে আলোচনার বৈঠক ডাকবার জন্য।

তখন রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ জরুরী সাধারণ সম্মেলন বসল। একাশিজন সদস্যের সবাই, কিংবা প্রায় সবাই সেখানে উপস্থিত। পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ বেতার-প্রতিষ্ঠান-গুলো নিজেদের প্রোগ্রাম বন্ধ করে রাষ্ট্রপুঞ্জের আলোচনা সর্ববিশ্বে প্রসার করার জন্য এগিয়ে এল। ক্রিকেটের ভাষায় বলতে গেলে যার নাম 'বল্ টু বল্ কমেণ্টারি'। সেই একাশিজন সদস্যের কেউ যে মৌনব্রত অবলম্বন করবেন সে আশা বা দুরাশা কোন সুস্থ শ্রোতাই করেননি। পনর মিনিট থেকে কে ক' ঘণ্টা বলবেন তারও কিছু ঠিক-ঠিকানা ছিল না। সেই তাবৎ বক্তৃতা কণামাত্র কাট-ছাঁট না করে পুরোপুরি বেতারিত হল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজি, ফরাসী, স্প্যানিশ ও রুশে অনুবাদ। আমাদের বিশ্বাস, বৈঠকের সভাপতি ছাড়া আর কেউই সব বক্তৃতা শোনেননি। তবে প্রতি বৈঠকের শেষে রাষ্ট্রপুঞ্জের বেতার-টীকাকার প্রতি বক্তৃতার সারাংশ শ্রোতাদের শুনিয়ে দেন।

বক্তৃতাগুলো যে শোনবার মত ছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের শ্রীযুত আর্থার লালও উত্তম বক্তৃতা দেন। সংযত কণ্ঠে, উত্তম উচ্চারণে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতি পরিপূর্ণ সম্ভ্রম দেখিয়ে। তবে এ সম্বন্ধে শ্রীযুত আলভা যা বলেছেন সেটাও সম্পূর্ণ ভুল নয়। যেখানে স্বয়ং আইসেনহাওয়ার এবং বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী তথা পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপন আপন দেশের হয়ে কথা বলেন, সেখানে শ্রীযুত লালের পদমর্যাদা কিঞ্চিৎ অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হওয়া বিচিত্র নয়। সোজা বাংলায়, অনেক সময় ধারের চেয়ে ভারেই কাটে বেশী।

'কূটনৈতিকরা সর্বক্ষণ কুটিল কথা বলেন,' বক্তৃতা শুনে এ বিশ্বাস আমার ভাঙল। বস্তুত এঁদের ভিতর অনেকেই ছিলেন গভীর দার্শনিক। ইরাক-জর্ডন-লেবাননের খেই ধরে এঁরা বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত চিন্তা করেছেন এবং বার বার সেই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হবার চেষ্টা করছিলেন যে, শান্তির জন্য কীভাবে জনমত দৃঢ়তর করা যায়, কোন্ নীতি অবলম্বন করলে আজ-এখানে কাল-সেখানে অশান্তিবহ্নি প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে না। বিশ্বজন যে এঁদের আলোচনা উদ্গ্রীব হয়ে শুনছে এ সম্বন্ধে তাঁরা বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন। বস্তুত একদিন বৈঠক বসতে ১১ মিনিট

দেরি হওয়ায় সভাপতি বলেন, বিশ্বজন যখন আমাদের আচরণের প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, তখন আমাদের আরও সাবধান হওয়া উচিত।

আইসেনহাওয়ার কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেননি। তিনি অনেকটা 'আসামী'র মত সাফাই গাইলেন, আমরা লেবানন ত্যাগ করতে সর্বদাই প্রস্তুত—যদি লেবানন সে ইচ্ছা জানায় কিংবা অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যায়।

তাই রাষ্ট্রপুঞ্জের রইল দুটি প্রস্তাব—

১। রুশের পক্ষ থেকে : কালবিলম্ব না করে মার্কিনিংরেজ মধ্য-প্রাচ্য থেকে সরে পড়ুক।

২। নরওয়ে এবং অন্য কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রস্তাব : সমস্ত ব্যাপারটা রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি-জেনারেল মিঃ ডাক্ হামারশ্যেল্‌টের হাতে ছেড়ে দেওয়া হক। সৈন্য সরানোর কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করবেন তিনি।

এ প্রস্তাবে সৈন্য সরানোর পুরো ভরসা নেই, তবে প্রস্তাবকরা বললেন, যেহেতু আইসেনহাওয়াব বিশেষ শর্ত প্রতিপালিত হলে সৈন্যাপসারণে প্রস্তুত তখন সেক্রেটারি-জেনারেলের কার্যকলাপ ঐ দৃষ্টিবিন্দু থেকেই পরিচালিত হবে। সৈন্য অপসারণের খানিকটে ভরসা এতে পাওয়া গেলেও কবে সেই শুভ কর্মটি সমাধান হবে, এ সম্বন্ধে কোন হদিস মূল প্রস্তাব কিংবা তার টীকাতে পাওয়া গেল না। স্পষ্ট বোঝা গেল, এ প্রস্তাবের পশ্চাতে রয়েছেন মার্কিনিংরেজ এবং তাদের খয়েরখাঁরা।

এ দুই প্রস্তাব নিয়ে যখন পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা হচ্ছে তখন শোনা গেল, এশিয়ো-আফ্রিকী রাষ্ট্রগুলি একটি তৃতীয় আপোসী প্রস্তাব সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। তার মূল উদ্দেশ্য হবে, সৈন্য সরানো হোক—অ্যাট এন্ আর্লি ডেট, কূটনৈতিক ভাষায় কি বোঝায় তা জানেন শুধু ভাবগ্রাহী জনার্দন। কারণ কথিত আছে, কোন ডিপ্লোমেট যখন বলেন 'নো', তার সোজা অর্থ 'পারহ্যাপস্'; যখন তিনি বলেন 'পারহ্যাপস্', তখন তার সোজা অর্থ 'হ্যাঁ'; এবং তিনি যদি কখনও বলেন 'হ্যাঁ', তা হলে বুঝতে হবে তিনি ডিপ্লোমেট নন।

তখন দেড় দিনে গোটা পাঁচেক বৈঠক হয়েছে মাত্র, এমন সময় মধ্যপ্রাচ্যের তাবৎ আরব রাষ্ট্র একজোট হয়ে সভার মাঝখানে ফাটাল এক বিরাট বম্। সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে তাঁরা নাকি সবাই একটি প্রস্তাবে সম্মত আছেন—এবং জর্ডন ও লেবাননও নাকি তাতে আছেন! প্রস্তাবটি নাকি ইতিমধ্যে গিয়েছে আরবদের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের আপন আপন রাজধানীতে। তাদের প্রধানমন্ত্রীরা সম্মতি জানালেই প্রস্তাবটি রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠকে পেশ করা হবে।

বৈঠকে তখন লেগে গেল ধুন্দুমার! যাদের নিয়ে এত শিরঃপীড়া তারাই যদি

একমত হয়ে কোন প্রস্তাব পেশ করে তবে অন্যদের আর ফপরদালালি করবার রইল কী ? উৎকট সঙ্কটটা দেখা দিয়েছে লেবানন আর জর্দন বাইরের সাহায্য চাইল বলে ; তারা যদি 'শক্র'র সঙ্গে যোগ দিয়ে বলে তারা নিশ্চিন্ত, তখন মার্কিনিংরেজেরই বা বলবার রইল কী, রুশের হুঙ্কারও তো অর্থহীন।

এ প্রস্তাবের সম্মতি মধ্যপ্রাচ্যের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র থেকে না আসা পর্যন্ত সভা মুলতুবি করে দিলেই হত, কারণ ওটা এলে যে সর্বজনগ্রাহ্য হবে সে-সম্বন্ধে কারও মনে কোন দ্বিধা ছিল না। তবু বক্তৃতা চলল। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল, বক্তৃতাতে আর কোন ঝাঁজ নেই। উকীল যদি জানতে পারে হাকিম মোকদ্দমার রায় আগেভাগেই লিখে ড্রয়ারে রেখে দিয়েছেন, তখন তার বক্তৃতা আর জমে না।

উত্তর আসতে বোধ হয় ত্রিশ-চল্লিশ ঘণ্টা লেগেছিল। মাঝখানে একটা রাত কেটে গেল। বৃহস্পতিবার রাত্রে সাড়ে বারটায় (নিউ ইয়র্কে বেলা দুটো) যখন দিনের দ্বিতীয় বৈঠক বসবার কথা তখনও খবর আসেনি। সভা নির্ধারিত সময়ে বসল না। টীকাকার 'ক্যানড্ মিউজিক' অর্থাৎ রেকর্ডসঙ্গীত বাজাতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত সুসংবাদ এল। দশটি আরব রাষ্ট্র, যথাক্রমে লেবানন, জর্দন, তুনিসিয়া, মরক্কো, লিবিয়া, মিশর, ইরাক, সউদী আরব, ইয়েমেন, সিরিয়া, একমত হয়ে একে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন না বলে সম্মত হয়েছেন ; কাজেই বিদেশী সৈন্য সরানো হক—অ্যাট অ্যান আর্লি ডেট। এবারে অবশ্য, 'আর্লি ডেটে' ভয় পাবার কিছু নেই।

সভাজন একবাক্যে 'সাধু সাধু' রব ছাড়লেন। জাতিপুঞ্জের এটি স্মরণীয় দিবস। এরকম 'ভিটো-হীন' সভা পূর্বে হয়েছে বলে স্মরণে আসছে না। 'জয়তু আরব ন্যাশনালিজম !'

* * *

সবাই উল্লসিত হয়েছেন আরব ঐক্য দেখতে পেয়ে, আরব ন্যাশনালিজম জাগ্রত হয়েছে দেখে। আমরাও হয়েছি।

কিন্তু চিন্তা করে দেখা যাক এতে লাভ হল কার ? যদি বলি মার্কিনিংরেজের, তবে যেন কেউ আশ্চর্য না হন। মার্কিনিংরেজের বাসনা, লেবানন ও জর্দন রাষ্ট্রদ্বয় যেন অক্ষত থাকে। তাই তারা জায়গা দুটিতে সৈন্য নামিয়েছিল। এখন তো মিশর, ইরাক, সিরিয়া অর্থাৎ অন্যান্য 'দুশমন' আরব রাষ্ট্রগুলিই সে ভার আপন আপন কাঁধে তুলে নিল ! মার্কিনিংরেজ সৈন্যাপসরণের পর যদি জর্দনে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন স্বতঃস্ফূর্ত গণতন্ত্রের আন্দোলন আরম্ভ হয়, তবে তো

গণতান্ত্রিক মিশর, ইরাক, সিরিয়াকে যে শুধু হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে তাই নয়, যেহেতু তাঁরা মৈত্রীসূত্রে বদ্ধ হয়েছেন, অতএব জর্দনের রাজা তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য কামনা করতে পারেন। সাহায্য করুন আর নাই করুন—সর্বসম্মত প্রস্তাবে হয়ত অতদূর যাওয়া হয়নি—জর্দন থেকে কোন রাজদ্রোহী ইরাকে পালিয়ে এলে তাকে তো জর্দনের হাতে ফেরত দিতে হবে।

আর কিছু না হক, মিশর ইরাক প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে এখন বসে বসে দেখতে হবে, জর্দন এবং লেবাননের প্রগতিশীল নেতারা কিভাবে ইংরেজ এবং মার্কিনের খয়েরখাঁ বাদশা হুসেন এবং তাদের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর হাতে লাঞ্ছিত হন। অন্তরে অন্তরে এদের কল্যাণ কামনা করলেও প্রকাশ্যে জয়ধ্বনি করতে হবে রাজা হুসেনের। মার্কিনিংরেজ সৈন্য অপসারণের পরও অদৃশ্য সৈন্যসঙ্কুল মার্কিনিংরেজ ঘাঁটি হয়ে রইল জর্দন লেবানন!

প্রতিক্রিয়াশীলরা আরব ভুবনে নূতন পাট্টা (লীস্) পেল!

এত দাম দিয়ে ঐক্য!

দেহলি প্রান্তে

১

ভারতের আর সর্বত্র যে প্রকারে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে, দিল্লীতেও প্রায় সেই রকমই; তবে কি না দিল্লী রাজধানী, এখানে ভারতের বড় কর্তারা বসবাস করেন, নানা দেশের রাজদূতরা নানা প্রকারের বেশভূষা পরে আমাদের পালা-পরবে আসেন, ভারতের সব প্রদেশের লোক দিল্লীতে বড় বড় আসন নিয়ে বসেছেন, তাই এখানকার পালা-পরব যতই আমাদের নিজস্ব হোক না কেন, তার চেহারা শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক হয়ে যাবেই যাবে।

তবে কি না দিল্লীর লোক কলকাতা কিম্বা বোম্বায়ের তুলনায় গরীব বলে কলকাতা বা বোম্বায়ের লোক যখন পার্টি দেন, তখন তার জৌলুস-রওশন, শান-শওকত হয় অনেক বেশী। এখানকার অধিকাংশ বড় লোক চাকরি করেন, চাকরিতে পয়সা কোথায়? পয়সা তো বোম্বাই-কলকাতার ব্যবসায়ীদের হাতে। আমাদের পার্টিতে চা আর মোমফলী; কলকাতার পার্টির কথা স্মরণ করে আর মন খারাপ করব না।

তা হোকগে। পালা-পরবে কে কত পয়সা খরচ করল সেইটেই আসল কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে শহরের পাঁচজন এদিনে আনন্দিত হয়েছে কিনা, এবং সে

আনন্দ—তা সে যে কোনো পন্থাতেই হোক—প্রকাশ করবার সুযোগ পেল কি না?

* * *

তা হয়ত পেয়েছিল। অন্ততঃ আমি যে পাঁজরাপোলে থাকি, সেখানেও নৃত্য-বাদ্য এবং উত্তম আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাইরের লোককেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের বেশীর ভাগই আসতে পারেননি। সকলের বাড়ীতেই পরব—গ্রামসুদ্ধ লোকের বড় ছেলের বিয়ে যদি একই দিনে হয়, তবে কে যাবে কার বাড়ী?

কাজেই আমরা আপোষে আনন্দ করলুম। 'বন্দে মাতরম' থেকে আরম্ভ করে খাস দিল্লীর গজল, কসীদা বিস্তর গাওয়া হল। লাউড-স্পীকার দিয়ে সেসব গান রবাহূতদের শোনানো হল এবং সর্বশেষে কোর্মা-পোলাওয়ের ভূরিভোজন হল।

আমরা যখন পত্রপুষ্প, বেলুন-ঝালর ভর্তি বিরাট ঘরে বসে গান শুনতে, একে অন্যের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতে ব্যস্ত ছিলুম, তখন আমাদের চাকরবাকরের ছেলেমেয়েরা আমাদের আনন্দোৎসব উঁকি মেরে মেরে দেখছিল। আমার গায়ে গণ্ডারের চামড়া—আমার অস্বস্তি বোধ হয়নি, কিন্তু আমার দু'একটি সহৃদয়, স্পর্শকাতর বন্ধু আমার দৃষ্টি সে-দিকে আকর্ষণ করে বললেন, তাঁদের আনন্দ সর্বাঙ্গসুন্দর হচ্ছে না।

আমি বললুম, 'সে-সব দিন গেছে। আগের আমলে পালা-পরবের মানেই ছিল কাঙালী-ভোজন। গরীব দুঃখীরা খেয়ে খুশী হত, কর্তারা খাইয়ে খুশী হতেন আর পাড়ার জোয়ান মদ্দেরা পরিবেশন করে সুখ পেত। ঐ ছিল তখনকার দিনের 'ম্যাস্ কনটাকট্'। এখন আমরা 'ম্যাস্ কনটাক্ট্' করি খবরের কাগজে আর মিটিঙে—সেসব মিটিঙে আবার 'ম্যাস্' আসেও না।

* * *

আমার আরেক লক্ষ্মী-ট্যারা ঠোঁটকাটা বন্ধু আছেন। তিনি কখনই কোনো বস্তু সোজা দেখতে পান না। আমাকে বললেন, 'আজ আর এমন কি দিন যে 'মোচ্ছব' করতে হবে?'

আমরা সবাই তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকালুম।

বললেন, '২৬শে জানুয়ারী আমাদের সত্যকার স্বাধীনতা দিবস। ১৫ই আগস্টে তো আমরা স্বাধীনতা পাইনি—পেয়েছি ডমিনিয়নত্ব।'

সুশীল পাঠক, আপনারা একটু বিবেচনা করে দেখবেন।

* * *

স্বাধীনতা দিবসেই আমি পিছন পানে তাকাই। ভাবি, এই এক বৎসরে দেশ

কতখানি এগলো ?

বিত্তসম্পদের দিক দিয়ে কতখানি এগিয়েছি বা পিছিয়েছি, তার হিসেব আমার পক্ষে করা সুকঠিন, সুকঠিন কেন অসম্ভব। চিন্তা এবং ভাবের জগতের উন্নতি-অবনতির সম্বন্ধে যে বুক ঠুকে কিছু বলব, সে শাস্ত্রাধিকারও আমার নেই। তবু যখন ঐ জগতেরই 'দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী', তখন রবাহূতরূপে গুণিজনের আলোচনায় কিছু কিছু বুঝতে পেরে যেসব সমস্যার সামনে এসে পড়েছি, সেগুলো নিবেদন করি।

পণ্ডিতজী সব সময়েই বলেন, সাম্প্রদায়িকতা এবং হিংসাবৃত্তি (ভায়োলেন্স) ত্যাগ না করলে ভারতের উদ্ধার নেই। হিংসাবৃত্তি কাদের, কেন তারা হিংস্র, সে-কথা আমি ভালো করে জানিনে, কারণ রাজনীতি আমি বুঝিনে এবং যাঁরা হিংস্র, তাঁরা বোধ হয় রাজনৈতিক মতবাদবশতঃই হিংস্র হয়েছেন, তাই তাঁদের নিয়ে আমার কিছু বলার নেই।

সাম্প্রদায়িকতা যেখানে ঐতিহ্য এবং বৈদগ্ধ্যগত (ট্র্যাডিশনাল এবং কালচারেল) সেখানে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

আমাদের দেশের প্রত্যেক সম্প্রদায় কোনো না কোনো ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এদেশে হিন্দু সম্প্রদায়, মুসলমান সম্প্রদায়, খৃষ্টান সম্প্রদায় ইত্যাদি (এদের ভিতরে আবার উপসম্প্রদায় আছেন, কিন্তু সেগুলো নেশন বা জাতির সামনে এখনো আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি)। অধিকাংশ হিন্দু বিশ্বাস করে, হিন্দু ধর্ম সর্বোত্তম ধর্ম, অধিকাংশ মুসলমানেরও বিশ্বাস ইসলাম পৃথিবীর শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ বিশ্বাস থেকে এদের টলানো উপস্থিত কিম্বা অদূরভবিষ্যতে অসম্ভব। এবং তার প্রয়োজনও নেই, কারণ যতক্ষণ অবধি এ বিশ্বাস আমাদের জাতীয় (নেশনাল) জীবনে কোনো তোলপাড় সৃষ্টি না করে ততক্ষণ আমাদের কোনো ভাবনা নেই। আমার মা দুনিয়ার সব মায়ের চেয়ে ভালো রাঁধতে পারতেন। এ বিশ্বাস অধিকাংশ পুত্রই আপন মা সম্বন্ধে পোষণ করে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি কেউ বলে, মুসোলিনী হিটলার সেটা বলতে পারতেন যে, বাদবাকী দেশকে তাঁর মায়ের রান্নাই খেতে হবে, তা হলেই চিত্তির।

হিন্দুরা ১৯৫২ সালে এ আশা করেন না যে, মুসলমানরা হিন্দু হয়ে যাবে কিম্বা মুসলমানরাও অনুরূপ প্রত্যাশা করেন না। মনে হচ্ছে একে অন্যের ধর্ম মেনে নিয়েছেন, তাই এখন দাঁড়িয়েছে বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি-কৃষ্টির প্রশ্ন।

সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বৈদগ্ধ্য দেশের বৈদগ্ধ্য নিরূপণ করে। ইতিহাসও তাই বলে। কিন্তু বৈদগ্ধ্য আর ধর্ম এক জিনিস নয়, সেটা বিবেচনা করে দেখতে হবে।

অন্তকার ইংরেজ, গ্রীক এবং রোমান বৈদগ্ধ্য স্বীকার করে নিয়েছে, এখনো প্রতিদিন সে তার সাহিত্য, নাট্য, অলঙ্কার ইত্যাদি গ্রীক এবং লাতিন বৈদগ্ধ্য থেকে চেয়ে নিয়ে আপন বৈদগ্ধ্য সমৃদ্ধ করে—কিন্তু সে গ্রীক এবং রোমান দেব-দেবীর পূজো করে না, অর্থাৎ গ্রীক এবং রোমান ধর্ম স্বীকার করে না। আমরা মোন্-জোদড়োর সভ্যতা নিয়ে গর্ব করি, কিন্তু আজ যদি সপ্রমাণও হয় যে, মোন্-জোদড়োবাসী ইঁদুরের পূজো করতো, কিম্বা নরবলি দিত, তাই বলে আমরা এসব কর্মে লিপ্ত হব না।

এইখানেই আমাদের সমাধান। হিন্দুধর্ম ধর্ম—ধর্ম-হিসেবে সম্মানিত হবে, বহু হিন্দু তাঁদের জীবনের চরম মোক্ষ বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ পদ্ধতিতে পাবেন (কোনো কোনো অহিন্দুও পাবেন—যেমন মনে করুন, জর্মন শোপেনহাওয়ার উপনিষদকেই আপন জীবনমরণের কাণ্ডারী বলে ধরে নিয়েছিলেন) কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে আমরা দেখব বেদ থেকে রবীন্দ্রনাথ (এমন কি নজরুল ইসলাম) পর্যন্ত আমাদের বৈদগ্ধ্য-ভাণ্ডারে কে কি কি সম্পদ দিয়ে গিয়েছেন?

এই সুদীর্ঘ চার হাজার বৎসরের ইতিহাসে বহু অ-হিন্দু আমাদের বৈদগ্ধ্যে অনেক কিছু দিয়ে গিয়েছেন, আমরা গ্রীক (যবন—আয়োনিয়ান) ইরানির কাছ থেকে জ্যোতিষ এবং ভাস্কর্যের (গান্ধার-কলা) অনেক কিছু শিখেছি এবং যুগ যুগ ধরে বহু মানবের কাছ থেকে নিয়েছি ও দিয়েছি। এই দিয়ে আমাদের বৈদগ্ধ্য গড়া হয়েছে (সুবোধ ঘোষের আনন্দবাজারের স্বাধীনতা সংখ্যায় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

ধর্মের এই বৈদগ্ধ্যগত মূল্য সম্যকরূপে বোঝার জন্য প্রয়োজন শাস্ত্রপাঠ এবং শাস্ত্রের অনুপ্রাণিত অন্য সব পুস্তক অধ্যয়ন। তা না, আজ যে রকম বহু স্থলে হচ্ছে—এবং পণ্ডিতজী এই জিনিস থেকে আমাদের সাবধান করছেন—বহু বিবেকহীন লোক ধর্মের নামে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সবাইকে ওস্‌কাবে।

তাই আজ একবাক্যমনে ভারত ভাগ্যবিধাতাকে নমস্কার করি, যিনি পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাত-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খৃষ্টানীকে সম্মিলিত করেছেন—সেই দেবের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা পুনরায় ভারতের সর্ব ধর্মবিশ্বাসীকে আহ্বান করি—

মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে—
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বার্ষিকী মহানগরী দিল্লীতে সাড়ম্বরে সুমাধান হল। বিস্তর ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী, তরো-বেতরো কামান, বন্দুক, রাজপুত মারাঠা গুর্খা শিখ সৈন্যবাহিনী, নৌবহরের অফিসার-মাল্লা-খালাসী, রেডক্রস-নার্সিংও ইত্যাদির বহুসহস্র লোক বহুতর ব্যাণ্ডবাদ্যি বাজিয়ে রাষ্ট্রপতিকে সম্মান জানানোর পর এক দীর্ঘ মিছিল বানিয়ে শহরবাসীকে তাক লাগিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন ঝাঁক জঙ্গী বিমান বিকট শব্দ করে বিদ্যুৎগতিতে মাথার উপর দিয়ে আকাশের বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে উড়ে গেল।

প্রাচীন যুগের লোক—কাণ্ডকারখানা দেখে আমার তো পিলে চমকে গেল। বাপরে বাপ—শান্তির সময়ই যখন এদের এরকম চেহারা তখন লড়াইয়ের সময় না জানি এরা কি রকম মারমুখো হয়ে ওঠে।

আমাদের কর্তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে। আমার মত আরো পাঁচটা লোক যে এরকম ঘাবড়ে যাবে সে-কথা তাঁরা আঁচতে পেরে তাপ দাওয়াইয়ের ব্যবস্থাও করেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যের প্রতীক সম্বলিত একখানি মোলায়েম মিছিলের ব্যবস্থাও তাঁরা করেছিলেন।

কোন প্রদেশে আপন সংস্কৃতির কি প্রতীক বেছে নিয়েছিলেন তার সবিস্তর বর্ণনা খবরের কাগজে বেরিয়েছে—আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন। ছবিও বেরিয়েছে, কাজেই ভালোমন্দ বিচার করতে কোন অসুবিধে হবে না।

আমি কূপমণ্ডুক বাঙালী, বাঙলা দেশ নিয়েই আমার কারবার।

বাঙলাদেশের প্রতীকরূপে সরস্বতী পূজোর নক্সা এই মিছিলে দেখানো হয়েছিল। দিল্লীর খবরের কাগজগুলোতেও আগের থেকে বলা হয়েছিল, বাঙলা দেশ বাণীর সাধক, তাই বাঙলা দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার সরস্বতী পূজা।

মনে বড়ই গর্ব হয়েছিল। কারণ বাঙলা দেশ সম্বন্ধে রায় পিথৌরা এখনও যেটুকু আশ্বাস মনের কোণে পোষণ করে সেটুকু তার বিদ্যাচর্চা নিয়ে। যেদিন এইটুকুও যাবে সেদিন বাজার শেষ।

বাঙালীর বেশীর ভাগ বেকার, চাকরিতেও সে অন্য প্রদেশের কাছে মার খায়, বাঙলার মোটা মোটা ব্যবসা কে করে, সেকথা তুলে নিরর্থক প্রাদেশিক বিদ্বেষ জানাতে চাইনে, দিল্লীতে বাঙালী কল্কে পায় না, সুভাষের পর বাঙলা দেশে নেতা জন্মাননি, কত লক্ষ বাঙালী উদ্বাস্তু হয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় আছে তার হিসেব নিতে মন বিমুখ। 'তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা বরদান। দুধে-ভাতে থাকিবেক তোমার

সন্তান ॥' পোড় খেয়ে খেয়ে নাস্তিক মন এ বাক্যে আর বিশ্বাস করে না, কিন্তু একটি সত্যে এখনো আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, বাঙলা দেশ এখনো বিদ্যার সম্মান করে।

রায় পিথৌরা গর্দিশের ফেরে দিল্লীতে বাস করেন। যে কালাপানির নামে বাঙালী একদিন ভিরমি যেত সেই কালাপানিতেই যখন আজ বাঙালী পেটের ধান্দায় মাথা কোটে তখন দিল্লী বাস তো স্বর্গবাস। তবু বলি, ওয়ারী বালিগঞ্জে মিলে যদি একদিন আন্দামানকে দ্বিতীয় বাঙলা বানাতে পারে তবে আমি দিল্লী ত্যাগ করে সেই কালাপানিই যাব।

দিল্লীকে নমস্কার। এখানে সব কিছু আছে অস্বীকার করিনে—ইস্তেক বাঙালী-বল্লভ ইলিশ মাছও পাওয়া যায়। এখানে পারমিট পাওয়া যায়, এম্বেসি-লিগেশনে ঘোরাঘুরি করলে দাওয়াত পাওয়া যায়, চোখ-কান খোলা রাখলে 'ফরেন' যাবার মোকাও মেলে, শুবো-সাম মিটিঙ-মাটিঙ যখন লেগেই আছে তখন একটুখানি তত্ত্বতাবাশ করলে সভাপতি হয়ে কাগজে ছবি তোলানো কঠিন কর্ম নয়, আরো কত কী আছে সেসব কথা ফাঁস করে দিয়ে আমি খামোখা কম্পিটিটর বাড়াতে চাইনে।

কিন্তু বিদ্যাচর্চা—রামচন্দ্র!

বিদ্যার বাহন বই। গুণীরা তাই আজীবন বই জমান। এখানকার গুণীরাও বই জমান—তবে সে বই চেক বই।

দিল্লীতে বিদ্বান নেই, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু দিল্লীতে বই নেই। এখানকার বিদ্বানরা তাই, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দারের দল।

এক হিসেবে ভালোই। এখানে এন্তার বিদ্যাচর্চা থাকলে মূর্খ রায় পিথৌরা দুমুঠো অন্ন কামাতো কি করে? এ্যাদ্দিনে তার সব 'পাণ্ডিত্য' ফাঁস হয়ে যেত আর কুলোর বাতাস খেতে খেতে কহাঁ কহাঁ চলে যেতে হত।

কি বলতে গিয়ে কোথায় এসে পড়েছি।

বাঙলা দেশ বাণীর সেবা করে সে কথা তো মানলুম—তা সে না হয় আজকের দিনে নোটবুক মুখস্থ করেই হোক।

কিন্তু প্রজাতন্ত্র দিবসে আমার মনে হল, এই প্রজাতন্ত্র সফল করার জন্য বাঙালী যে কতটা আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে জ্বলেছে তার খবর বোধ হয় অবাঙালীদের একটুখানি জানানো উচিত।

বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, অরবিন্দ. রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র এরকম মহাত্মা বাঙলার বাহিরে বোধ হয় বিস্তর জন্মাননি। কি কৌশলে এঁদের নিয়ে দ্রষ্টব্য রসবস্তু নির্মাণ করা যেত বাঙালী শিল্পীরা সে কথাটি এই বেলা ভেবে রাখলে ভাল হয়।

আসছে বছরও তো এই পরব হবে।

* * *

লাহোর রাওলপিণ্ডিতে নাকি গুটিকয় 'চিরকুমার সভা' অর্থাৎ 'ব্যাচেলরস্ ক্লাবের' গোড়াপত্তন করা হয়েছে। সদস্যদের আদর্শ আমরণ অবিবাহিত থাকা; কেউ যদি কোনো কুহকিনীর পাল্লায় পড়ে সন্মার্গভ্রষ্ট হওয়ার উপক্রম করে তবে আর পাঁচ ভাইয়ের কর্ম হবে তখন তাঁকে সে রমণীর কেশ-পাশ নাগ-পাশ থেকে আজাদ করা।

বিবাহ-প্রস্তাবকে যখন সর্বোত্তম প্রস্তাব বলা হয় তখন এ প্রস্তাবটিকে আমরা অত্যুত্তম প্রস্তাব বলে মেনে নিচ্ছি। বিশেষতঃ যখন হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের সব মহাজনরাই জানেন যে, পশ্চিম পাঞ্জাবে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি। চিরকুমার অনেককে এমনিতে থাকতে হত—ক্লাব বানিয়ে চেল্লাচিল্লি করে যদি 'নেসেসিটি'কে 'ভার্চু' বানানো যায়, বাঙলায় যাকে বলি—'উড়ো-খই গোবিন্দায় নমঃ' তা হলে হাটের মধ্যিখানে হাঁড়ি ভেঙে কার কি ফয়দা?

উঁহু, সেটি হচ্ছে না। একদল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি উল্টো ক্লাবের পত্তন করেছেন ছোকরাদের বাউণ্ডুলোমি থেকে খারিজ করে 'কবুল', 'কবুল', 'কবুল' বলাবার জন্য— এ ক্লাবে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা আছেন কিনা সে খবর এখনো আমরা পাইনি।

এঁদের বক্তব্য, "ইসলাম চিরকৌমার্য সখ্‌ৎ না-পসন্দ করে; বিয়ে না করলে মুসলমান মুসলমানই নয়, এসব অনৈসলামিক কায়দা-কেতা—পাকিস্তানকে না পাক করে ফেলবে।"

শুনে তাজ্জব মানলুম।

বিয়ে করতে চাইলে সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশ কুরান-শরীফে আছে; কিন্তু কেউ বিয়ে না করতে চাইলে কুরান তো তার উপর কোনো অভিসম্পাত দেননি। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া, পরকীয়া, আল্লাকে অস্বীকার করা এসব অপকর্ম যে 'গুনাহ' সে কথা কুরানে স্পষ্ট লেখা আছে, এমন কি এসব কর্ম করলে ইহলোকে এবং পরলোকে তার কি সাজা সে কথাও সবিস্তর বয়ান করা হয়েছে কিন্তু শাদী না করা গুনাহ (পাপ) এ কথা তো কুরানের কোথাও নেই। তাহলে যে লাহোরের মুরব্বিরা বললেন, বিয়ে না করা অনৈসলামিক সেটা তাঁরা পেলেন কোন্ বগল-নামা থেকে?

মুরুব্বিরা হয়ত বলবেন, "আরে বাপু, কুরানেই কি সব কথা লেখা আছে? এই যে নিত্যি নিত্যি পাঁচ বকৎ নেমাজ পড়ছো সে কথাই কি আর কুরানে পষ্টা-পষ্টি লেখা আছে?—আছে 'হদিসে'। কুরানের পরে রয়েছেন 'হদিস'— 'হদিস' ভী মানতে হয়।" শ্রুতির পর যে রকম স্মৃতি, কুরানের পর তেমনি

হদিস—না মেনে উপায় নেই।

বুখারী (আমাদের যে রকম মনু) সাহেব যে হদিস সঞ্চয়ন করেছেন তাতে মহাপুরুষ মুহম্মদ কখন কাকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন তার উত্তম বর্ণনা রয়েছে। আরো অনেকেই করেছেন, কিন্তু বুখারী সাহেবকেই এ বাবদে সবচেয়ে বেশী মান্ত করা হয়—কি লাহোর, কি দিল্লী, কি কাইরো, কি মরক্কো, সর্বত্রই।

বুখারী সাহেব বয়ান করেছেন, "একদা এক দীন মুসলিম মহাপুরুষ (মুহম্মদ) সমীপে আগমন করতঃ নিবেদন করল, 'হে আল্লার প্রেরিত পুরুষ, এই অধম অতিশয় অর্থহীন। স্ত্রীধন প্রদান করিয়া বিবাহ কবিবার ক্ষমতা আমার নাই—অথচ আমি কামাগ্নিতে অহরহ দগ্ধ হইতেছি। অনুমতি করুন, আমি অস্ত্রোপচার করতঃ ক্লৈব্যাবস্থা প্রাপ্ত হই।' মহাপুরুষ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'না। তুমি উপবাস করো এবং আল্লাসমীপে অহরহ প্রার্থনা করো যেন তিনি তোমার মুসকিল আসান (সরল) করিয়া দেন।' "

পূর্বেই নিবেদন করেছি, লাহোর পিণ্ডিতে মেয়েছেলে পুরুষের তুলনায় কম। চিরকুমাররা অবশ্য বলেছেন, তাঁদের অর্থাভাব বিয়ে না করার অন্যতম কারণ। এঁদের যুক্তি ও যে ব্যক্তি মহাপুরুষের কাছে গিয়েছিল তাঁর যুক্তি একই। সর্বাব্যবস্থাতে বিয়ে করা যদি চরম কাম্য হত তবে মহাপুরুষ নিশ্চয়ই তাকে বিয়ে করতে আদেশ দিয়ে বলতেন (মুরুব্বিরা সচরাচর যে রকম বলে থাকেন), "রুটি দেনে-ওলার মালিক খুদা, তিনিই পেট দিয়েছেন, তিনিই রুটি দেবেন। তুমি বিয়ে করো।"

অর্থাভাব থাকলে চুরিচামারি করে বিয়ে করা অনুচিত সে কথা মহাপুরুষ মেনে নিয়েছিলেন—লাহোরের মুরুব্বিরা মানছেন না। তাই বোধহয় শাস্ত্রে বলে ধর্মের গতি সূক্ষ্ম।

আর যদি বলা হয়,

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন" ইত্যাদি—তা হলে নিবেদন, যে খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়া সম্বন্ধ গত সপ্তাহে নিবেদন করেছিলুম, তিনি এবং অধিকাংশ সুফীই চিরকৌমার্যব্রত অবলম্বন করে মহবুব-ই-ইলাহি (ব্রহ্মবান্ধব) উপাধি লাভ করেছিলেন।

৩

বোম্বায়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, এদেশের সব চেয়ে বড় কর্তব্য আপামর জনসাধারণের ভিতর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা এবং বেকার সমস্তার

নিরঙ্কুশ সমাধন করা।

এ অতি সত্য কথা—এমন কি পৃথিবীর বর্বরতম দেশও এ তত্ত্ব মেনে নেবে। কিন্তু প্রশ্ন, শিক্ষার বিস্তার এবং প্রসার করা যায় কি প্রকারে? পূর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ আছে,

'যত টাকা জমাইছিলাম
শুঁটকি মাছ খাইয়া
সকল টাকা লইয়া গেল
গুলবদনীর মাইয়া!'

যত রকমের খাজনা হতে পারে, যত প্রকারের ন্যায্য অন্যায্য ট্যাক্স হতে পারে, সবই তো চাঁদপানা মুখ করে দিচ্ছি। সরকারের হাতে সে টাকা জমা হচ্ছে—এবং তার বেবাক খরচ হয়ে যাচ্ছে এ-খাতে ও-খাতে সে-খাতে, অর্থাৎ গুলবদনীর মাইয়াই সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার শতাংশের এক অংশও উদ্‌বৃত্ত থাকছে না।

কাজেই গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলি কি করে, পুরনোগুলোই বা চালু রাখি কোন্ কৌশলে?

* * *

কিন্তু আমার মনে হয় পুরনো স্কুল চালু রাখা আর নূতন স্কুল খোলাই শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রধান কর্ম নয়। খুলে বলি;—

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, কোন বিশেষ গ্রামে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে একটি ভালো পাঠশালা উত্তমরূপে চালু আছে, প্রতি বৎসর দশ-বারোটি ছেলে শেষ পরীক্ষা পাশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ বৃত্তিও পাচ্ছে, কিন্তু তবু যে কোনো সময় আপনি সে গ্রামে গিয়ে যদি হিসেব নেন, কটি ছেলে লিখতে পড়তে পারে, তবে দেখবেন দশ বারোটির বেশী না, বাদবাকি আর সবাই লেখাপড়া ভুলে গিয়েছে এবং যে দশ-বারোটি এখনো কেঁদে কুকিয়ে পড়তে পারে তারাও শীঘ্রই সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়ে যাবে। অবশ্য আমি এস্থলে সাধারণ চাষা-মজুরের কথাই ভাবছি—মধ্যবিত্ত কিম্বা বিত্তশালী পরিবারের কথা উঠছে না।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন—আমরা চাষার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে দিয়ে ভাবি, আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু একথা ভাবিনে, তারা পরীক্ষায় পাশ করার পর পড়বে কি? এরা যে পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায়, তার একমাত্র কারণ তাদের কাছে পড়বার মত কিছু থাকে না।

ইয়োরোপের চাষা মজুর আমাদের মত গরীব নয়। তারা যে নিরক্ষর হয়ে

যায় না তার একমাত্র কারণ তারা খবরের কাগজ পড়ে এবং মেয়েরা ক্যাথলিক হইলে প্রেয়ার বুক আর প্রটেস্টাণ্ট হলে বাইবেল পড়ে। অবরে সবরে হয়ত একখানা নভেল কিম্বা ভ্রমণকাহিনী পড়ে, চাষা বাড়ীতে না থাকলে হয়ত তার হয়ে চিঠি-চাপাটিও লেখে, কিন্তু এগুলো আসল কারণ নয়—আসল কারণ খবরের কাগজ, প্রেয়ার বুক এবং বাইবেল।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চাষা খেতে পায় না, সে খবরের কাগজ কেনবার পয়সা পাবে কোথায়?

তাই দেখতে পাবেন, যে চাষা কোনোগতিকে তার ছেলেকে পাঠশালা পাশের সময় একখানা রামায়ণ কিম্বা মহাভারত কিনে দিতে পেরেছিল তার বাড়ীতে তবু কিছুটা সাক্ষরতা বেঁচে থাকে। এই আংশিক বাঁচাওতাটা কিন্তু প্রধানতঃ বাঙ্গলাদেশে। হিন্দী ভাষীদের তুলসীরামায়ণ পড়ে সে লাভ হয় না, কারণ তুলসীর ভাষা আর আধুনিক হিন্দীতে প্রচুর তফাৎ। তুলসীব ভাষা দিয়ে আজকের দিনে চিঠি লেখা যায় না—কাশীরাম কিম্বা কৃত্তিবাসেব ভাষার সঙ্গে কিন্তু আধুনিক বাঙ্গলার খুব বেশী পার্থক্য নেই।

তাই দেখতে পাবেন, মুসলমান চাষা পাঠশালা পাশের পর খুব শীঘ্রই নিবক্ষর হয়ে যায় কারণ সে রামায়ণ-মহাভাবত পড়ে না এবং বাঙ্গলা ভাষায় এ রকম ধবণের সহজ সবল মুসলমানী ধর্ম্মপুস্তক নেই। ভাবতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতিটা কি রকম তার খবব আমার জানা নেই, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করলে আমরা শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিস্তব হদীস পাবো।

তাহলে ওষুধ কি?

যে উত্তর সকলের প্রথম মনে আসবে সে হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেবী বসানো। কিন্তু অত টাকা যোগাবে কোন গৌরী সেন? সরকার তো দেউলে। তাহলে?

এইখানে এসে আমিও আটকা পড়ে যাই। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নূতন ইস্কুল খোলার চেয়েও বড় কাজ পড়ার জিনিস সাক্ষর ছেলেমেয়েদের হাতে দেওয়া—বিনি পয়সায় কিম্বা অতি অল্প দামে।

আমি বহু বৎসর ধরে এ সমস্যা নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করেছি, বহু গুণীর সঙ্গে আলোচনা করেছি, দেশ-বিদেশে উন্নত অনুন্নত সমাজে অনুসন্ধান করেছি—তারা এ সমস্যার সমাধান কি প্রকারে করে, কিন্তু কোনো ভালো ওষুধ এখনো খুঁজে পাইনি। আমার পাঠকেরা যদি এ সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত আমাকে জানান, তবে তার আলোচনা করলে আমরা লাভবান হব সন্দেহ নেই।

* * *

অন্য এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়দের কর্তব্য ছাত্রদের 'স্পিরিচুয়াল ডিরেকশন্' দেওয়া।

আমার মনে হয়, এই মাত্র আমরা যে সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়েছিলুম সেই সমস্যারই এ আরেকটা দিক।

'স্পিরিচুয়াল' বলতে শ্রীরাধাকৃষ্ণণ নিশ্চয়ই 'রিলিজিয়াস' বলতে চাননি—তাহলে হাঙ্গামা অনেকখানি কমে যেত—তাই মোটামুটিভাবে ধরা যেতে পারে, তিনি আত্মার প্রয়োজনের দিকটাতেই ইঙ্গিত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্ম ছাত্রকে তার দেশের বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা—এবং বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় বৈদগ্ধ্যে আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনের অধিক সুস্বাদ আহার্য রয়েছে। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে অধ্যাপকেরা যদি ছাত্রকে ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু করাতে পারেন, সে বৈদগ্ধ্যের উত্তম উত্তম বস্তুর রসাস্বাদ করাতে শেখান, তবে ছাত্র নিজের থেকেই তার প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ধন চিনে নিতে পারবে। সকলেরই কাজে লাগবে এমন মুষ্টিযোগ যখন মুষ্টিগত নয়, তখন ছাত্রের সামনে গন্ধমাদন রাখা ছাড়া উপায় নেই —যে যার বিশল্যকরণী বেছে নেবে।

কিন্তু সমস্যা তৎসত্ত্বেও গুরুতর। ছেলেদের পড়তে দেব কি? ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সংস্কৃত-পালিতে, তিন ভাগ ইংরাজিতে, আর মেরে-কেটে দু ভাগ বাঙ্গলায়। অথচ আজকের দিনে সব ছেলেকে তো আর জোর করে বি-এ অনার্স অবধি সংস্কৃত পড়াতে পারিনে। এবং তাতেই বা কি লাভ? ক'জন সংস্কৃতে অনার্স গ্র্যাজুয়েটকে অবসর সময়ে সংস্কৃত বইয়ের পাতা ওল্টাতে আপনি আমি দেখেছি। সংস্কৃত গড় গড করে পড়া শিখতে হলে টোল ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অতএব মাতৃভাষাতেই আমাদের বৈদগ্ধ্য-চর্চা করতে হবে।

এবং সেখানেই চিত্তির।

আজ যদি আপনি বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীত-শাস্ত্র অলঙ্কার বাঙ্গলা অনুবাদে পড়তে চান তবে একবার ঘুরে আসুন কলেজ স্কোয়ারে বইয়ের দোকানগুলোতে, যে সব বইয়ের বাঙ্গলা অনুবাদ হয়ে গিয়েছে সেগুলোই যোগাড করতে গিয়ে আপনাকে চোখের জলে নাকের জলে হতে হবে। আর কত শত সহস্র পুস্তক যে আপনার পড়তে ইচ্ছে হবে, অথচ অনুবাদ নেই—তার হিসেব করবে কে?

হিন্দীওলাদের তো আরো বিপদ। আমাদের চেয়ে ওদের অনুবাদ সাহিত্য

অনেক বেশী কম জোর। এই দিল্লীর কনট সার্কাসে আমি হিন্দী বইয়ের দোকানে সার্কাসের ঘোড়ার মতই চক্কর লাগাই—আজ পর্যন্ত কোনো সংস্কৃত বইয়ের উত্তম হিন্দী অনুবাদ চোখে পড়ল না যেটি বাড়ীতে এনে রসিয়ে রসিয়ে পড়ি।

মারাঠী ভাষায় তবু কিছু আছে, গুজরাতীতে তারো কম। আসামীতে তো প্রায় কিছুই নেই, ওড়িয়ার খবর জানিনে—তবে যেহেতু শিক্ষিত আসাম এবং উড়িষ্যা সন্তান মাত্রই বাঙ্গলা পড়তে পারেন তাই তাঁদের জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

মোদ্দা কথায় ফিরে যাই। রাধাকৃষ্ণণ তো দায় চাপিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর—অর্থাৎ অধ্যাপকদের উপর। কিন্তু হায়, তাঁদের তো দরদ নেই এ সব জিনিসের প্রতি। আর স্বয়ং রাধাকৃষ্ণণের যদি দরদ থাকতো তবে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয় ছেড়ে উপ-রাষ্ট্রপতি হতে গেলেন কেন?

কলকাতাতে বর্ষা বসন্ত আছে বটে, কিন্তু তাতে করে কলকাতাবাসীর জীবনযাত্রায় কোনো প্রকারের ফের-ফার হয় না। হৈ-হুল্লোড়, পার্টি-পরব, কেনা-কাটা, মারা-মারি একই ওজনে চলে। দিল্লীতে কিন্তু ভিন্ন ব্যবস্থা। এখানে দুই ঋতু—গ্রীষ্ম আর শীত। শীতকালে এন্তার দাওয়াত, নেমন্তন্ন, দিনে দশটা করে মিটিঙ, হপ্তায় দুটো করে আর্ট প্রদর্শনী, আজ ভরতনাট্যম, কাল কথাকলি, পরশু য়েহুদী মেন্নুহীন, আর এক গাদা সঙ্গীত সম্মেলেন, কবিসঙ্গম, মুশাইরা। গ্রীষ্মকালে এসব-কিছুতে মন্দা পড়ে যায়, শুধু যেসব দেশের বাৎসরিক পরব গরমে পড়েছে, সেসব দেশের রাজদূতেরা বাধ্য হয়ে "রিসেপশন" দেন, আর সবাই শার্ক স্কিন আর কালো বনাতের মধ্যিখানে প্রচুর পরিমাণে ঘামেন। পার্টিগুলোর জৌলুশেরও খোলতাই হয় না, কারণ ডাকসাইটে সুন্দরীরা পাহাড়-পর্বত ঘুরতে গেছেন—পার্টিতে যদি রঙ-বেরঙের শাড়ীর বাহারই না থাকলো তবে সে পার্টি অতি নিরামিষ (নিরম্বু তো বটেই, এ-সব পার্টিতে জল মানা) তাই পাঁচজন পার্টি থেকে ভদ্রতা রক্ষা করেই তাড়াতাড়ি কেটে পড়েন।

এসব হল নিউ-দিল্লীর কাহিনী।

পুরানী দিল্লীতে কিন্তু একটা জিনিসের অভাব কখনো হয় না। প্রায় প্রতি-দিনই কোনো না কোনো নাগরিককে অভিনন্দন করার জন্য কোনো না কোনো পার্কে তাঁবু আর শামিয়ানা খাটিয়ে, দিগধিরিঙে লাউড-স্পীকার ঝুলিয়ে যা চেল্লা-চেল্লি আরম্ভ হয়, তাতে পাড়ার লোক ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে—দরজা জানলা বন্ধ

না করে একে অন্তের সঙ্গে কথা পর্যন্ত কওয়া যায় না।

এ রকম একটা অভিনন্দন পার্টিতে আমি দিন কয়েক পূর্বে গিয়েছিলুম। যে দু'জনকে অভিনন্দন করা হল, আমি তাঁদের নাম শুনিনি, দিল্লীর ক'জন লোক তাঁদের নাম শুনেছে তাও বলতে পারবো না।

দুজনারই যে প্রশস্তি গাওয়া হল, তা শুনে আমার বিদ্যেসাগর মহাশয়ের একটি ছোট লেখার কথা মনে পড়ল। এ লেখাটি সচরাচর কেউ পড়েন না বলে উদ্ধৃতির প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলুম না।

'কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' এই ছদ্ম নামে বিদ্যেসাগর মহাশয় লিখছেন—

'আমি এ স্থলে —নাথ বিদ্যারত্নকে নদিয়ার চাঁদ বলিলাম। কিন্তু শ্রীমতী যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবী —মোহন বিদ্যারত্নকে নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়াছেন। উভয়েই বিদ্যারত্ন উপাধিধারী, উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য, বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ও উভয়ের একই ধরণের। সুতরাং উভয়েই নবদ্বীপ-চন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য পাত্র, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এ পর্যন্ত এক সময়ে দুই চাঁদ দেখা যায় নাই। সুতরাং একজন বই, দুই জনের নদিয়ার চাঁদ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন এক বারেই বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভালো দেখায় না ; এবং ঐ উপলক্ষে দুজনে হুড়া-হুড়ি ও গুঁতাগুঁতি করিয়া মরিবেন সেটাও ভালো দেখায় না। এ জন্য আমার বিবেচনায় সমাংশ করিয়া দুজনকেই এক এক অর্ধচন্দ্র দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করা উচিত। শ্রীমতী যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবী আমার এই পক্ষপাত-বিহীন ফয়তা* ঘাড় পাতিয়া লইলে আর কোনো গোলযোগ বা বিবাদ-বিসংবাদ থাকে না। এক্ষণে তার যে রূপ মরজি হয়।'

* * *

নিত্যি নিত্যি কারণে অকারণে হৈ-হুল্লোড় করার অভ্যাস দিল্লীবাসী বাঙালীর উপরও বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। আজ এখানে সাহিত্য সভা, কাল

* 'চলন্তিকা' 'ফয়তা এবং ফতোয়া' শব্দে পার্থক্য করে অর্থ দিয়েছেন ; "ফয়তা (আরবী ফাতিহং)—মুসলমান ধর্ম অনুসারে উপাসনা"—এবং "ফতোয়া (আরবী ফৎবা)—মুসলমান শাস্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা। কাজীর রায়।" বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু সর্বদাই 'ফয়তা' শব্দ ব্যবহার করেছেন ফতোয়া অর্থাৎ 'বিধান' 'রায়' অর্থে।

ওখানে বর্ষামঙ্গল প্রায়ই এসব 'পরব' হয়। এবং অনেক সময়ে মনে হয়েছে, এ সব পরবে সত্যকার কাজ যেন ঠিকমত হচ্ছে না।

তাই আমি চেষ্টা করেছি, ছোট গণ্ডীর ভিতর অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে প্রতি-সপ্তাহে কিম্বা প্রতিপক্ষে 'স্টাডি সার্কল' বসাবার, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ যাবৎ কৃতকার্য হতে পারিনি। আমার বয়স হয়েছে, তদুপরি আমি খ্যাতনামা সাহিত্যিক নই, কাজেই আমার দ্বারা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পত্তন সম্ভবপর নয় অথচ এর প্রয়োজন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

কেন্দ্র হিসাবে দিল্লীর মাহাত্ম্য ক্রমেই বাড়বে। কেন্দ্রের হাতে অর্থ আছে এবং সে অর্থের কিছুটা প্রাদেশিক সরকাররাও পান—সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সেবার্থে। বাঙলার প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে বাঙলা সাহিত্যের জন্য কত টাকা বাগাতে পারবেন, সে তাঁরা জানেন, কিন্তু আমরা যারা দিল্লীতে আছি এ বাবদে আমাদেরও যথেষ্ট কর্তব্য আছে।

আমরা যদি ছোট ছোট কর্মঠ সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি, তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের কর্মতৎপরতা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। আজ যে বাঙলা সাহিত্যের প্রতি আমাদের দরদের অভাব তার প্রধান কারণ আমরা সাহিত্যের সত্যকার চর্চা করিনে।

তার অন্যতম জাজ্বল্যমান উদাহরণ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো আমরা বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের জন্য কিছুই করে উঠতে পারিনি অথচ সেখানে রুশ ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।

* * *

দিল্লীতে ব্যাঙের ছাতার মত একটা জিনিস বড্ড বেশী গজাচ্ছে। এঁরা হচ্ছেন আর্ট ক্রিটিক সম্প্রদায়। এঁরা ছবি বোঝেন, মেনুহীন শোনেন, আবার আলাউদ্দীন সায়েবকেও হাততালি দেন, এঁরা ভরতনাট্যম আর মণিপুরী নিয়ে কাগজে কপচান চীনা সেরামিক এবং দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জ সম্বন্ধে এঁদের 'জ্ঞানের' অন্ত নেই।

এঁদের একজন তো সবজান্তা হিসেবে এক বিশেষ গণ্ডীতে রাজপুত্রের আদর পান, বিলক্ষণ দু'পয়সা তাঁর আয়ও হয়। তা হোক, আমার তাতে কণামাত্র আপত্তি নেই—পারলে আমিও ওঁর ব্যবসা ধরতুম।

কিন্তু আমার দুঃখ ভদ্রলোকটি বড়ই বাঙলা এবং বাঙালী বিদ্বেষী। অবনীন্দ্র-নাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং তাঁদের শিষ্য উপশিষ্যেরা যে 'বেঙ্গল স্কুল' গড়ে তুলেছেন, সেটাকে মোকা পেলেই এবং মাঝে মাঝে না পেলেও বেশ কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেন। তাঁর মতে যামিনী রায়, যামিনী রায় এবং আবার যামিনী

ন্নায়। বাঙলা দেশের আর সব মাল বরবাদ, রদ্দী। নিতান্ত 'প্রাদেশিক' বদনাম থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য।

ইনি যে সব 'আর্ট-সমালোচনা' প্রকাশ করেন, তার সুস্পষ্ট প্রতিবাদ হওয়া উচিত। যাঁরা এসব জিনিসের সত্য সমঝদার, তাঁদের উচিত বেরিয়ে এসে আপন দেশের সুসন্তানদের কীর্তি বার বার স্বীকার করা। 'ডেকাডেন্স' বা 'গোল্লায় যাওয়ার' অন্যতম লক্ষণ আপন দেশের মহাজনগণকে অস্বীকার করা বা খেলো করে দেখানো।

এ জাতীয় লেখাকে 'পোলেমিক' বলে—বাঙলায় 'মসীযুদ্ধ' বলতে পারি। এবং মসীযুদ্ধে বাঙালীর পর্বতপ্রমাণ ঐতিহ্য সম্পদ আছে। ভারতচন্দ্র পদ্যময় পোলেমিক, আর বাঙলা গদ্য তো আরম্ভ হল খাঁটি মসীযুদ্ধ দিয়ে। রামমোহন তো কলমের লড়াই লড়লেন, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সর্বসম্প্রদায়ের গোঁড়াদের সঙ্গে। তার পরের বাঘ বিদ্যেসাগর। তিনি যে পোলেমিক লিখেছেন, সে লেখা লিখতে পাবলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড আইনজীবী নিজকে ধন্য মনে করবেন—অধমের মতে পোলেমিকে বিদ্যেসাগর মশাই মিলটনেরও বাডা। আর মসীযুদ্ধে ব্যঙ্গ কি করে প্রয়োগ করতে হয় তার উদাহরণ তো আপনারা একটু আগে 'অর্ধচন্দ্র' দানে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তাবপর তিন নম্বরের মল্লবীর বঙ্কিম। তিনি হেষ্টি সাহেবের (নাম ঠিক মনে নেই) বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দু ধর্মের হয়ে যে লড়াই লড়লেন সে তো অতুলনীয়। বরঞ্চ বলবো, 'কৃষ্ণ চরিত্রের' চেয়েও বড ক্যানভাসে কাজ করেছেন বঙ্কিম এ মসীযুদ্ধে, এবং এ সত্যও আজ অস্বীকার করবো যে, আজ যদি কোনো হেষ্টি পুনরায় দেখা দেয় তবে তার সঙ্গে ওবকম পাণ্ডিত্য আর ইংরেজী জ্ঞান নিয়ে (এখানে সাহিত্যিক বঙ্কিমের কথা হচ্ছে না—সে সাহিত্যিক যে নেই সে কথা ইস্কুলের ছোঁডারা পর্যন্ত জানে) লডনেওলা আজ বাঙলা দেশে নেই।

তারপর রবীন্দ্রনাথ ; তিনিও তো কিছু কম লড়েননি। তবে তাঁর রুচিবোধ বিংশ শতাব্দীর ছিল বলে তাঁর লেখাতে ঝাঁঝ কম, কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে লেখা চিঠিতে কী তিক্ততা, কী ঘেন্না!

গল্প শুনেছি উর্দুর কবিসম্রাট গালিব সাহেব তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জওক্ সাহেবের একটি দোহা এক মুশাইরায় (কবি-সঙ্গমে) শুনে বার বার জওক্‌কে তসলীম করে বলেছিলেন, 'আপনি দয়া করে আপনার ঐ দুটি ছত্র আমায় দিয়ে দিন, আর তার বদলে আমি আমার সম্পূর্ণ কাব্য আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

রবীন্দ্রনাথের ঐ শেষ চিঠির পরিবর্তে পৃথিবীর যে কোনো পোলেমিস্ট্ তাঁর সব পোলেমিক দিতে সোল্লাসে প্রস্তুত হবেন।

শরৎচন্দ্র যদি তাঁর মসীযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে না করে সে যুগের আর যে কোনো লোকের সঙ্গে করতেন, তবে তিনিও মসীযোদ্ধা হিসেবে নাম কিনে যেতে পারতেন। আর কেনেনই নি বা কি করে বলব? তাঁর 'নারীর মূল্য' পোলেমিকের প্রথম চাল। বাঙলা দেশ এ পুস্তকের বিরুদ্ধে কলম ধরলে তিনি যে কী মাল ছাড়তেন, তার কল্পনা করতেও আমি ভয় পাই।

ধর্মে বিবেকানন্দ পোলেমিস্ট্, ব্যঙ্গ কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল।

* * *

এতখানি ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো বাঙালী এই সব ভুঁইফোড় 'আর্ট ক্রিটিক'দের জোরসে দুকথা শুনিয়ে দেন না কেন?

চীনের সহিত ভারতের লুপ্ত সাংস্কৃতিক যোগসূত্র পুনরায় স্থাপনা করিবার জন্য যে চৈনিক-বিদগ্ধমণ্ডলী ভারতে আগমন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত টিং সি-লিন ও শ্রীযুক্ত ফুঙ য়ু-লনকে ডক্টরেট উপাধি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয় স্বহস্তে উপাধি এবং প্রশস্তি প্রদান করেন। দিল্লী নগরীর তাবৎ গুণীজ্ঞানী সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুত সি-লিন বৈজ্ঞানিক। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় অর্বাচীন চীন বিজ্ঞান-চর্চায় কি প্রকারে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিমার্গে ধাবমান হইতেছে তাহার সবিস্তার বর্ণনা করেন এবং পুনঃ পুনঃ সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, চীনের সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা জনগণের মঙ্গলার্থে নিয়োজিত হইতেছে। শ্রীযুত সি-লিন স্পষ্ট বলেন নাই কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ভারত যদি এই উত্তম উদাহরণ অনুসরণ করে তবে 'জন-গণ-মন' অধিনায়কের শুধু মৌখিক নয়, আন্তরিক এবং সকল প্রশস্তি গীত হইবে।

শ্রীযুক্ত য়ু-লান দার্শনিক। বক্তৃতারম্ভেই তিনি বলেন, যে প্রদেশে তাঁহার জন্ম সেই প্রদেশেরই এক সজ্জন বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষে ত্রি-রত্নের সন্ধানে আসিয়াছিলেন। ভারত তখন তাঁহাকে প্রচুর সম্মান দেখাইয়াছিল এবং অদ্যকার সম্মানে শ্রীযুক্ত লান সেই সুবর্ণযুগের কথা স্মরণ করতঃ হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন যে এ সম্মান তাঁহাকে নয়, তাঁহার দেশবাসীকে প্রদর্শন করা হইতেছে।

তৎক্ষণাৎ আমার মন ফা-হিয়েন ও হিউয়েনৎ সাঙের স্মরণে দেশ-কাল-পাত্র ভুলিয়া প্রাচীন ভারতের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হইল। মুদ্রিত নয়নে দেখিতে

পাইলাম রাষ্ট্রপতি যেন শ্রীশ্রীরাজামহাধিরাজ হর্ষবর্ধনের বেশ ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান পরিব্রাজক হিউয়েনৎ সাঙ। কোথায় দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তনগৃহ যেখানে মাত্র পঞ্চশত নরনারী উপস্থিত? যে প্রয়াগ সম্মেলনে হিউয়েনৎ সাঙ উপস্থিত ছিলেন সেখানে পঞ্চলক্ষাধিক নরনারী উপস্থিত থাকিয়া মহাযানের গুণকীর্তন ও শ্রবণ করিয়াছিল। হায়, কোথায় অদ্যকার পঞ্চশত আর কোথায় সেদিনের পঞ্চলক্ষ!

এবং সেদিন ভারতে নিষ্ঠা ছিল, বেদ-চর্চা ছিল এবং ত্রিশরণ-প্রচলিত সত্য ধর্মের অনুসন্ধানে অগণিত নরনারী ধন-প্রাণ নিয়োজিত করিত। হিন্দু বৌদ্ধ, জৈনধর্ম এবং দর্শন তখন যে বিকাশ লাভ করিয়াছিল তাহা আজিও বিশ্বজনের বিস্ময়ের বস্তু। সিংহল, বর্মা, ইন্দোচীন, মালয় ও চীন হইতে অগণিত শ্রমণগণ ভারতে শাস্ত্রের অনুসন্ধানে আসিতেন। দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্ব স্ব ভাষায় শাস্ত্ররাজির অনুবাদ করিয়া জীবন ধন্য গণ্য করিতেন।

আর আজ বিরাট দিল্লী নগরীতে একটি মাত্র শিক্ষায়তন নাই যেখানে বৌদ্ধ-ধর্মের চর্চা হয়, পালি শিখিবার কোনো প্রকারের ব্যবস্থা এই মহা-নগরীতে নাই। অত্রস্থ মহাবোধি প্রতিষ্ঠান অনাদৃত।

* * *

চৈনিক বিদগ্ধমণ্ডলী এই দেশে আসিবার সময় বহুশত চিত্র ও অন্যান্য কলা-সামগ্রী সঙ্গে আনিয়াছেন। এক বিশেষ চিত্র-প্রদর্শনীতে সেই ছবিগুলি রাখা হইয়াছে এবং স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন।

ভারতবাসীর পক্ষে এই প্রদর্শনীতে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু তুন-হুয়াঙ গুহা চিত্রের প্রতিকৃতি। এই চিত্রগুলি অজন্তা বাঘ প্রভৃতি গুহাতে যে বিষয় ও শৈলীতে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাদের প্রভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। নিতান্ত অজ্ঞজনও এক দৃষ্টিতেই সে তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে। বিজ্ঞজন চিত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখিয়া যে কত শত নব নব তত্ত্ব এবং তথ্য উদ্ধার করিতে পারিবেন তাহা কিছুদিন পরে তাঁহাদের প্রবন্ধরাজিতে প্রকাশ পাইবে।

যে বিষয়-বস্তু আমার কাছে পরিচিত নহে, যে আদর্শের ঐতিহ্য আমার বৈদগ্ধ্যে নাই সেখানে বিদেশাগত, নবীন বিষয়-বস্তু তথ্য আদর্শ গ্রহণ করি কি প্রকারে এবং আপন কলাপ্রচেষ্টায় তাহাদিগকে অঙ্গীভূত করিই বা কি প্রকারে।

বুদ্ধের জীবন এবং অবদান চীনের কাছে অতিশয় বিস্ময়ের বস্তু-রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। চীনদেশের আপন মহাজন লাওৎ-সে ও কনফুসিয়ো যে মার্গ দেখাইয়া গিয়াছিলেন সে মার্গগুলি মহান কিন্তু বুদ্ধদেবের সর্বস্ব-ত্যাগের নিরঙ্কুশ

বৈরাগ্যবাদের সঙ্গে চৈনিক মহাপুরুষদের আদর্শবাদের কোনো সাদৃশ্য নাই। তদুপরি চীন বর্বরদেশ নয়। বহুশত বৎসরের তপস্যার ফলে চীন কলা-প্রচেষ্টায় নিজস্ব শৈলী বর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সে শৈলী বর্জন না করিয়া এই ভারতীয় শৈলী চীন গ্রহণ করে কি প্রকারে?

তাই আমরা এই চিত্রগুলির সম্মুখে বিস্ময়ে হতবাক হই। স্পষ্ট দেখিতেছি চিত্রগুলি চৈনিক অথচ যে কোনো বিশেষ অংশের বিশ্লেষণ করিলেই সেখানে অজন্তা দেখিতে পাই। ঐ তো সব বিষধর সর্প, ঐ তো করালদংষ্ট্রা রাক্ষসের দল, পশ্চাতে শাণিত তরবারি হস্তে পিশাচ না কবন্ধ, সম্মুখে লীলায়িত ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান তিলে তিলে নির্মিত মুনি মনহরণী তিলোত্তমা-শ্রেণী এবং মধ্যস্থলে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্ত-তথাগত।

এই চিত্র বাল্যকাল হইতে কত সহস্রবার দেখিয়াছি। এই প্রদর্শনীর কল্যাণে তাহাকে আবার 'অজানা-জনের সাজে' চিনিয়া মুগ্ধ হইলাম।

Let us remember the spirit of the Great Poet with *shraddha*, for the day of *shraddha* has come once again.

The world outside Bengal knows him as the Great Poet, eminent novelist, brilliant short story writer, guru of an educational renaissance, and prophet of international peace and goodwill, but the spirit behind the creative impulse which assimilated the best of the nineteenth century Bengal—the Bengal of Raja Rammohun Roy, Maharshi Devendranath Tagore, Keshab Chandra Sen—and then went forward in search of fresh adventures has never been revealed to the outside world. It is found in the very best poems and songs of the Poet and unfortunately have not been translated into English or Indian languages. Perhaps the translators, including the Poet himself, felt that Odes addressed to the Vedic deities and poems interpreting characters, symbols, situations and ideologies of Indian mythology will not find a sympathetic chord in the Christian heart, for it can hardly be denied that the devotional songs of Tagore which have actually been translated into English are popular in the Christian world on account of their resemblance with the Songs of David and his love songs often run parallel to the Songs of Solomon of the Old Testament.

It is true that the English reading public has a rough idea of Tagore's rcligious thought through some of his essays but they belong, to a period when he had reached only the end of the first stage of his spiritual development which consists chiefly of what he had received from his father, the Maharshi. He speaks of the Brahman as realised by the Upanishadic rishis and reinterprets their vision in his characteristic lyrical style. Being a poet and thus attached to the world and its creatures he rejects Shankara's position of regarding them as mere illusions : for him the seekers of *Vidya* only or *Avidya*

only, both go unto perdition, the Lord is rather to be sought everywhere, in the Fire, in Water, in the innermost recess of Creation (*Ye deva agnau yo apsau etc.*), and this vision has to be translated into aesthetic expression. Thus, when he remembers his departed beloved, he sees her everywhere—she is transformed into the greenness of the green vegetation, the azure of the blue sky (*shyamale shyamal tumi, nilimay nil*). Through English translations we know Tagore thus far, and no farther.

He then gives up composing devotional songs addressed to Brahman. One wonders why. The clue is to be found in his next great poem called *Tapobhanga*. It becomes clear to the reader in retrospect that the impersonal Brahman lacked the warmth and colour to appease the desire of the mundane heart which yearns to love, the hungry eyes which want to see God—if not the direct vision, at least in the mind, through forms they have already seen on the earth. To which God was Tagore to turn—*kasmai devaya havisha vidhema* ?

Bengali poetry is based on Vaishnava traditions. Chandidasa and Vidyyapati, the two great predecessors of Tagore had followed the footsteps of Jayadeva and countless poets after them have also sung the love of Radha and Krishna but nineteenth century Bengal had no great Vaīshnava figure like Shri Ramakrishna and Swami Vivekananda who as henotheists had Shakti to the most exalted eminence. Tagore turned to Shiva, for, is not Rudra also the Nataraja, and had not the Poet as a small boy learnt from his father to seek the benign face of Rudra for protection—*Rudra yat te dakshinam mukham tena ma'm pahi nityam* ?

Tapobhanga is a great poem. In it Tagore sees the Lord of Time deep in *tapas*. It is during these necessary and inevitable periods of *tapas* that the creation becomes dry and shrivels up in the heat (*tapas*), pain, suffering and all

the miseries of the world are nothing but the creation of Nataraja's dance and all these find their symbol in the resplendent sufferings of Uma in her seperation (*vichchheder dipta duhkhadahe*) caused by Shiva's having withdrawn himself into himself—for is he not the *Yogisha* also ? At this stage enters the Poet. He calls himself the emissary of the conspiring Heaven (*tapobhanga duta ami Mahendrer*). Shiva wakes up, the auspicious moment for the marriage of the celestial couple has come, smile blossoms forth on the cheeks of Uma in sweet bashfulness (*smita hasya sumadhur laj*). The Lord calls the Poet, and taking the flower garland and mangalyas, he joins the seven rishis in the marriage procession (*saptarshir dale, kavi sange chale*). This time it is not Madana, it is the Poet. And what an imagery ! Along with the *saptarshi*, on the high firmament, it is the Poet, for the whole universe to gaze at and admire. What a role for all poets of all ages to play !

And then Tagore composed the famous Nataraja Odes. "Oh, Nataraja, thy matted locks become loose when Thou commencest Thy *Pralaya-dance*", "Nataraja, break my slumber with Thy dance steps", (*nrityer tale tale supti bhangao*). They have the same *motif* as in the *Bharata-nritya* song, "Oh, Lord of Chidambaram, wilt Thou not stop Thy chariot at my cottage door for a moment ?" Tagore is indebted to South India for his Nataraja cycle. The God is practically unknown as Nataraja in the North.

Tagore passes through several tragic experiences before he reached the third and the final stage. The world knows how the Poet, shaking with age, and rage composed the epistles in defenee of India's national heroes, of the correspondence between the two poets, Tagore and Naguchi. It has an inkling also of the Poet's feeling when he saw the World War II shattering to bits the edifice of international peace and goodwill he had been building up but alas, it

knows nothing of the greatest tragedy of his life—the Indian nation had not come forward to receive his favourite child, the Vishvabharati. As the aged Poet proceeded along the dolorous path carrying his cross, no St. Veronica came to offer him the kerchief to wipe his perspiration and blood. The poet fell under the weight.

He fell seriously ill, and through unbearable physical pain and agony, he saw new visions. He translated them into semi-aesthetic, quasi-philosophical verses, loosely knit together and entirely lacking the usual Tagorian finish. He recovered and dictated some more of his recollections and these two collections are called 'Sick-bed' (*roga-shayya*), and 'Recovery' (*Arogya*). His last poems are called "Shesh-lekha".

The reader will remember how stoutly Tagore had maintained in his youth that deliverance was not for him through renunciation of his world (of *rupa-rasa-gandha-sparsha*) by means of any *yogic* practice. Now, for the first time, the world, including his body, became nothing but a continuous source of the most excruciating agony. He cried in despair, "Through pain and pain again, I have realised the world is not unreal".

Aghate aghate janilam
E jivan mithya nay.

What! Not beauty, not truth, but pain—the Buddhist point of departure—should be the *raison d'etre* of all existence!

There are many such wonders for the reader of the three collections mentioned above. Personally I feel certain, although I cannot prove it except by means of 'aesthetic logic', that Tagore had turned to concentration in the *raja-yoga* style at this last phase of his spiritual experience which alone can explain many of the visions, e. g. those describing his body and mind floating away while the soul watches on, the dumb creatures with masses of inert matter on the eve of

the first creation.

The last poem, composed half an hour before the fatal operation, absolves him once again, of the accusation that he was an escapist. "Thou has scattered on the path of Creation many a deceitful snare, O Deceitful one (*Chhalanamayi*), many a false hope (*mithya-vishvas*) !

This is the final recognition of Untruth, *per se* by the Poet. This brings him closer to the Sankhya system, nearer to Zarathustra who accepted both the Principle of Good and the principle of Evil as co-existing from Eternity. In the dynamic process of arriving at a harmony beyond the conflicting diversity of reality, the Poet has covered the entire gamut of all the Indo-Aryan and Indo-Iranian systems of philosophy in aesthetic realisations. This harmony, this *weltanschauung*, this *summum bonum* is known to us all in the simple word, 'shanti'.

A LETTER FROM INDIA

I am sure when you hear my English accent you will not believe me that I was ever in England, but it is Allah's truth that I spent several months there—'believe it or not' as the Americans say. But then I spent most of my time in the Reading Room of the British Museum where hailing each other across the tables and discussions on weather in general and the one prevailing in London in particular are not very highly appreciated. Indeed, I should say even in the House of Commons you get better opportunities to improve your conversational English than in the British Museum.

But that is not the point, any way. What I mean is that if it was possible for me to visit England, why should you not be able to come to this country next winter ? Now, do not suspect me as being the representative of a tourist

organization, hotel keeper or a guide. I am suggesting the trip for, I really believe, having seen many of the winter resorts of Europe that India is worth visiting in winter.

Naturally the first question you will ask is what we have here to offer you ?

Well, to begin with the weather. Right from the begining of October till, let us say, the middle of March you will have nothing but bright sunshine, a deep blue sky with a few white clouds once in a while, nice comfortable warm days and slightly chilly nights when all you need is a warm pull-over even for going out for a stroll by moon-light. It may rain for a day or two during this period which will be quite a pleasant change and you will have the experience of what is called warm rains in the East.

Are you interested in architecture ? Well, Delhi is the Mecca of architecture. There are at least five distinct architectural styles to be seen here which will take your breath away. The Kutb Minar is supposed to be the most graceful tower in the whole world and Fergusson considers it to be superior to Giotto's campanegla. The remains of the Quwwat al-Islam mosque just near the Kutb, built from the remains of ancient Hindu temples with its noble arches and delicate ornamentations on the stone walls, the spandrels with medallions of lotus-motif, the forts of the Tughlus with massive walls, sometimes as much as sixty feet deep, which loom large against glorious sunsets every evening, the noble but sweet Humayun's tomb built in red stone and white marble, the audience halls in the Red Fort and finally the Taj Mahal at Agra—only a hundred and twenty miles far from Delhi.

I assure you, it will not merely mean looking at a few beautiful buildings, it is much more than that. Let me explain.

You have all heard of the rich literatures of the East,

Sanskrit, Arabic, Persian and Chinese but where has the average European time or opportunity to learn one or more of these languages to enjoy them ?—The same as we have no time to learn Greek, Latin, French or German. Architecture and painting make up this loss to a considerable extent. As you go from building to building chronologically you see for yourself how the architects and their patrons conceived of beauty in their life and how they tried to transform into stone and morter through arches, domes and pillars, how one artist failed to solve a difficult aesthetic problem, and how after serveral attempts a more gifted artist finds the way out, how rebels suddenly appear in the field and violently reject everything of the past, and then, as it were, comes a fresh renaissance and finally masters who assimilate every achievement of the past and make a new anthology of the most beautiful pieces of architecture.

It is precisely as if you are following from the birth of a literature till its developed state.

And what strikes me as most important is the fact that you are not merely reading books, you are not merely seeing buildings but you are coming into the closest touch with the minds and hearts of a people, and then, you come to the grand discovery, how alike they are, all over the world. You, who are accustomed to a certain type of architecture in your country, will realize how, inspite of the difference in styles and execution, the aesthetic ideals are the same and how the artists all over the world have tried to come nearer to the supreme realisation of Beauty which is Truth.

I have been speaking of Delhi, a city which I love not only because of its architecture but for many more things.

For example I love the lazy, comfortable way our bazars are run. No one is in a hurry—the philosophy of our bazar people appears to be, 'why be in a hurry when life is so short, take it easy'. If you are a stranger the shopkeeper

may try to save some of your precious time but if you happen to be one of the 'regulars' Allah protect you ! He will ask you about the health of every single individual of your family—there is no question of your cutting him short—offer you tea which the boy will take ages to serve. In the meantime three customers have come and gone and you are nowhere near your purchases. At long last he produces the perfumes you want to buy for your son's wedding. He wraps up a little fine cotton on a tiny piece of wood and soaks it in the *attar*—scent—and says with a sigh that our last Emperor Bahadur Shah could not live for a day without it. Now you have not got the purse of the Emperor, so yon get worried as to what the price will be like. He sighs again and produces a second variety in the same process and reminds you that this was the favourite of Her Majesty, the Empress. "Alas", he adds, "who are the people now that care for such refined delights—you are one of the very few—, the market is flooded with cheap scents from all over the world. May Allah hasten my death, he prays so that I may disappear before the aristocratic *attars* vanish from this world".

Meanwhile, as far as prices are concerned, our aristocrat 'at business table' does not appear to be a great believer of 'vanity of Vanities, all is Vanity'. At the rate he is making profit, he need not die for another thousand years. Even if all attars disappear from the world he should be able to live happily on the profits he has already made,

It is the nose which enjoys the attar, no wonder you pay through your nose.

That reminds me, the heavy smell of oven-baked chickens had entered the same nose through all the powerfull age-old attars. What, you have not heard of oven-baked chickens, commonly known as tandori-murghi in Delhi ? Why, in that case you must positively undertake a pilgrimage to India. I am told, some of your great men went round the world to

prove that it was round—the discovery of an oven-baked chicken is most emphatically a million times more laudable task. You will go down in history as the first European who brought to England the delicate *chicken a la oriental, chicken des Hindous, poulet au Delhi n'importe quoi*, according to your knowledge of French or absence of it.

I shall not tell you how it is made. "Come to Swizerland and see Davos", they say ; I shall say, "come to India and see how a *poulet au Delhi* is made."

It is not a chicken, it is a dream. Forget the Taj Mahal and the Kutb Minar...you cannot eat them. The *poulet* will melt in your mouth like butter, its aroma will give you greater delight than the sweetscented tresses of your beloved and finally it will bring the same bliss, the same *summum bonum*, in our language *moksha and nirvana* which extremely complicated religious practices alone can bring.

That might remind you of death, for you might have heard that *nirvana* comes after death. That is not true, for one of our poets has said, "If I cannot get *nirvana*—salvation —in this life when I have command on actions what chances have I to get it after death ?"

And even if death overcomes you due to excesses in *poulet au Delhi*, never mind. I shall quote another scripture, this time in pure Sanskrit, to prove my thesis. I am afraid I shall have to twist it slightly, but then that is precisely what all scholars do ; it is the laymen, the uninitiated the rustic who goes by the literal meaning of scriptures.

The quartrain says,

"Parannam prapya, Durbuddhe,
Ma praneshu dayam kuru,
Parannam durlabham loke,
Pranah janmani janmani".

"Eat, eat, to they full, o, man of little knowledge,
And do not show any mercy for your life,

For you come across cheap exotic food rarely in life,
But life will be given to you by God free of cost
every time you are born.

Let me remind you that we Indians believe in rebirths. We believe that we come to this earth again and again till we have reached perfection.

So then, if you do not come to India, inspite of all the pleadings I have made on her behalf, this winter or in this life, I pray, you may be born in India in your next birth.

WHAT IS IN A NAME ?

There appears to be little doubt that India is going to be divided soon, but at the same time there appears to be a lot of confusion in the public mind about the name to be given to the Non-Pakistan area.

Some are in favour of 'India', others again are suggesting 'Hindustan' (or 'Hindusthan'). Some are indifferent like Shakespeare who thought that a name did not matter at all, others are keen on a proper choice and cite Tagore who considered it all important and pointed out that if Draupadi, the proud possessor of five heroes as husbands (panchavira-patigarvita), had been named Urmila, her resplendent kshatriya womanhood would have been hurt at every step by this soft and tender name.

We agree with Tagore not because we are thinking in aesthetic terms, but because in addition to his artistic argument there are a few philological and historical arguments which have to be considered before we arrive at a decision.

Philologists have pointed out that the ancient Iranians changed their 's' to 'h' at an early stage of their linguistic development with the result that our 'asura' became their 'ahura' which is the first part of Ahura-Mazda ; precisely in

the same manner the river 'Sindhu' became 'Hindu', 'Hindo', and 'Hind' to which was added the word 'stan', meaning 'land' which again is cognate with Sanskrit 'sthana'. (It will be remembered that like all other non-Indian Aryans, the Iranians lost their aspirates at an early stage—cf. 'ph' in 'philosophy' which is pronounced as a fracative 'f'—with the result that 'sthan' became 'stan' in the Iranian languages). Hindustan thus came to mean the 'Land of the Indus'.

The Arabs turned it into 'Hind' and used it as a general appellation for the whole of India. They still call all Indians, irrespective of the fact whether they are Hindus or Muslims, 'Hindi' of which the plural is 'Hunud', a term, which surprisingly enough, is occasionally used by Indian Muslims in referring contemptuously to the Hindus.

The Greeks had lost their aspirates by the time they learnt the word from the Iranians and consequently took it as 'Indos' (in modern Greek the 'd' is pronounced soft, almost wet, as 'th' in the English 'this') which gave birth to the English 'India', French 'L'Inde', German 'Indien', etc.

Columbus thought that he had discovered India and it caused considerable confusion which persists in the European languages to this day.

Thus the German, for example, calls our country 'Indien', the people 'Inder', but another word from the same root 'Indianer' is used to designate the Red Indians. During my stay in Germany, I had often great difficulty in explaining to elderly German gentlemen that I was an 'Inder' not an 'Indianer'. To them both names meant very much the same.

The French call India 'L'Inde', but the people, irrespective of the fact whether they are Hindus or Muslims, 'Hindou'. I have often been present in 'scenes' where the young Muslim from India was indignantly maintaining that he was not a Hindu but a Muslim and the Frenchman trying in vain to explain that he was not referring to his religion but his

nationality. Some Frenchmen coin a new word 'Brahminist' to designate the Hindu by religion. The word 'l'indien' applies to the Red Indian.

The American follows the Frenchmen. He calls our country 'India' all right but terms us all as 'Hindus'. Thus it happened, some years back, when American papers announced that "One Abdur Rahman, a Hindu, was arrested for having landed in the States without a passport." When this news item was reproduced in India we had a hearty laugh at the Yankee's ignorance but of course the American papers were not referring to the religion of Abdur Rahman but to his nationality.

Will it be wise to increase the confusion at this stage by giving the appellation Hindusthan to India? Already the wrong impression is gaining ground in Europe and America that Pakistan contains only Muslims : if we start calling the rest of India by the name Hindusthan we are bound to strengthen the impression that this new 'Hindusthan' contains only Hindus. Surely the Muslims, Sikhs, Parsis, Christians, Jains and even the Hindus—barring the Mahasabha, perhaps —have no such intention. *Vis-a-vis* Pakistan, which is going to be a theocratic state, the *raison d'etre* of the rest of India has got to be non-religious (areligious) and anti-communal,

But before recommending 'Hindusthan' to the rest of the world, let us consider the luck the word has had in India itself. Urdu uses only 'Hindustan',* very seldom 'Bharata'. Hindi, Gujerati and Marathi use both names in popular language but in their poetical flights on Sanskritic wings they shed 'Hindusthan'. Bengali and Assamese rarely use 'Hindusthan', and when they refer to a 'Hindusthani' they mean a person coming from Western India just as they use 'Madrasi' to cover all South Indians (!) And finally the South Indian languages have been using Bharatavarsha (-Bhumi, -Mata. -Khanda, -Desha) without paying any attention to

'Hindusthan' whatsoever.

It is strange indeed that whereas the word 'Hindu' which is Persian got entrance into all Indian languages and even hybrid *samasas* (composites) like 'Hindu-dharma' and 'Hindu-samaja' have become a part of the Indian languages, the composite 'Hidusthan' (where 'sthanam' is a purer Sanskrit word than 'Hindu') was given no passport by the Bharat Government. It is like Subhadranandana Abhimanyu entering the chakravyuha while respectable elders bearing the tail fail to penetrate !

What about Bharata, then ? Unfortunately the word is unknown in Sindhi, Baluchi, Poshto, Kashmiri and is very rarely used in Urdu. The rest of the world does not know it either. And surely the Congress has not given up all hopes for the return of the prodigal. 'Vande Bharatam' (!) does not work : 'mataram' has a better chance.

Netaji used 'Hind' for the simple reason that he had to deal mostly with the Puajabis—Hindus, Muslims and Sikhs—to whom the word is familiar, but it does not appeal to the rest of India.

I therefore feel that there is no alternative but to maintain the *status quo*. We shall continue to use 'India' when we write and speak English, and 'Bharatavarsha' and 'Hindusthan' according to the predilection and genius of the different Indian languages, as in the past. The man in the street would like to have one single word for India in all the Indian languages, but we must not forget the fact that India is a sub-continent and many people have many associations and many sentiments. Our attitude in this matter should be more Swiss than French. There are four languages in Switzerland : the French Swiss calls his country 'La Suisse' ; the German Swiss 'Die Schweitz' ; the Italian Swiss 'Svizzera'—I regret I have forgotten the Roumansh word. It is true that the Swiss have another common word for their land in all the

languages—'Helvetia', but it is used only on the postage stamp! It happens to be a Latin word too, and the Swiss have much less to do with dead Latin (Helvetia) than we have with the living English (India).

LOVE AND FRIENDSHIP

Only the other day a young friend of mine, a rising barrister, suddenly descended upon me and insisted that I should immediately accompany him to his house as his parents had suddenly arrived there from their native village and would like me to have dinner with them. I knew that this young man and his wife are very hospitable and although he took his glass of brandy it was in abundance for the guests, but he told me something in the car which upset me considerably. It appears that an astrologer had paid them a visit just a couple of hours back and had predicted that his mother would leave this world before his father.

Now I know that every Hindu woman (and in India by far, and large Muslim women also) always pray or to put in Bengali that she may be laid on the funeral pyre with the vermilion mark on the parting of the hair (sinthisindur) which is a sign that she is not a widow. That is to say she would rather die as an *akhandasaubhagyavati* rather than live for a hunderd years as a gangaswarupa (these terms are not familiar in Bengal and some other provinces but will be easily understood) but nevertheless it is a cruel *faux pas* to speak of the death of a wife before her husband.

But I was completely bowled over when I met the parents and heard the opinion of the mother regarding her predicted death as an *akhandasaubhagyavati.* "Oh no," "she said firmly but sweetly, "I would not dream of popping off (in Bengali "tensne jawa"—a humorous slang like say kicking the bucket) before him," while she looked at the thin emaciated and a

very silent gentleman with infinite tenderness in her eyes. "Oh, no," she continued, "If I should die earlier he will be as utterly helpless as an orphan of six months, He will just perish inspite of my three daughters-in-law who are extremely fond of him but cannot give him the company he is accustomed to." And I was thoroughly convinced that she was perfectly right.

Here then was a case of love turning into friendship in old age, which has been described by the Grand Maitre of tender scenes, Alphonse Daudet in, his famous short "Lex Vieux."

While staying in an abandoned mill in Provence he received a request from a Parsian friend to call on his grand-parents who lived a few miles away. Daudet goes and on seeing them says, "I was touched to find them so like each other ! With a fringe and some yellow ribbons he (the grandfather) might have been called Mamette (the grandmother)." Even in their infirmity they resembled. Daudet sitting between the two of them had to go on and on chattering away (Et, patati : et patata) on their dear and above all *brave* (in the French sense) grandson Maurice. 'The old man would draw closer to me to say 'Speak louder— She's a little hard of hearing—'

And she on her part would say :

'A little louder, pray...He does not hear very well...'

Through the communicating door Daudet saw two little beds and '"I could not keep my eyes off them. They were hardly bigger than cradles and I pictured them at break of day when they are still buried under their fringed curtains. Three O'clock strikes. This is the hour when all old people wake :

'Are you asleep, Mamette ?'

'No, my dear'."

Here I must draw the reader's attention to the very

important fact that in the French original it is not "mon cher" which would be "my dear" but "MON AMI" which strictly speaking is "MY FRIEND". And that is exactly what I have been driving at right from the begining. Love, passionate love, turns into friendship and it is impossible to say when and how the process begins. But when it is completed the husband and wife, at least acording to Daudet, resemble each other. It is therefore not quite wrong that in certain parts of the Persian-speaking countries a couplet is recited by the bridegroom, after the formal wedding ceremony is over :

"Man tu shudam, tu man shudi, man tan shudam, tu jan shudibad as in Ta kasi no guyad, man digaram, tu digari"

"I have become you, and you have become me, I have become the body and you have become the jan.

So that no one may say after this you are different and you are different".

We have the same in Sanskrit and I am told that just like the Persian couplet it is recited by the bridegroom and the bride in certain parts of India :

"Yadet hrdayam mama tadastu hrdayam tava
Yadet hrdayam taba tadastu hrdayammama."
"Let this heart of mine become thy heart
Let this heart of thine become my heart".

If two hearts melt into one, it is but natural that in course of years, as Daudet points out, they should resemble one another bodily also. Indeed there is a couplet in mixed Bengali which says :

"Sunori sunori tehar nam
Sundari Radhe hoilo Shyam"

Ordinarily it is translated as "Recalling his (Krisna's) name over and over again the beautiful Radha became dark (Shyam, dark, Krisna)" but other pundits maintain that she actually looked like Krisna. But as they were not married to

one another and did not live for any length of time together actual friendship did not grow up between them. Had Lord Shrikrisna returned to Vrindavan again it might have been different. Some say he did visit again when Shriradha was a full hundred years old ! Well, I presume that was rather late in the day for either love or friendship.

A personal experience

"It can't hurt now" was Mr Sherlock Holmes's comment when for the tenth time in as many years I (Watson) asked his leave to reveal a delicate incident. In my case it is not *ten* hut close upon forty ! When I was a student in Bonn from 1930 to 1932 I fell deeply in love—not a calf-love—with a medical student who belonged to Stuttgart area. As I spoke precious little German when I met her for the first time and she spoke it perfectly well as also showed keen interest in India and Indian things (actually Tagore visited the Marburg university in summer 1930 and Mariana bought everything available by him and on him) we were drawn very close together. Well, in Germany Studentenliebe (love or/& friendship among univeristy students) is equated with Semesterliebe (love or/& friendship only for a Semester which is a university term of six months)...German students are passionately fond of shifting from one university to another at the end of a Semester till they settle down for good at some particular university to prepare their thesis but neither I nor Mariana dreamed of seperation. I got my doctorate in the beginning of 1932 and left Mariana and Bonn in tears. Shortly afterwards Mariana wrote to me to say that she just could not stand the sight of Bonn, the Rhine and above all the Venusberg where we used to go out for long walks and on Saturday nights often used to greet the rising sun. Bonn was a small university town forty years ago and practically everyone who had anything to do with the uni-

versity students knew that our love was "feste" (unshakeable) "solide" (solid, *pucca*) and when I left for India and Mariana for Munich it was palpable to our colleag, at Mensa (students' restaurant), the old woman at the newspaper kiosk, waiters, the few policemen on beat that Bonn could boast of and finally even my good old professor Carl Clemen who had international fame in Comparative Religion and knew that we were inseperable would raise his hat and bow profusely whenever he met her in the street that ours was not the notoriously proverbial Semesterliebe but of full five Semesters when circumstances seperated us.

Five years is a pretty long time, and when you are seperated by thousands of miles. Our correspondence became irregular, for we had nothing else to tell each other except the cruel pangs of seperation. Such depressing letters are not conducive to increase the tempo in correspondence, besides, I knew, that she, being the only child of an aristocratic family, was expected by her parents to marry and continue the name of the family, at least from the maternal side. Mariana's sense of *noblesse oblige* was one of the strongest traits of her character and although I am perfectly certain that her parents, to whom I was presented as a *de rigueur*, whenever they visited Bonn, never brought to bear any pressure on her to marry, much less a *marriage de convenance* which though not quite *a la mode* was quite commeil faut among the Swabian elite (I am deliberately using these French expressions to show the profound French influence on the German aristocracy).

Mariana married in, I believe, 1936. I went to Germany a number of times since then but just as her *noblesse oblige* made her get married my common sense—no *amour propre*——prevented me from getting in touch with her. It is just not done.

Last year, however, I somehow came to know that her husband had died thirteen years ago. I wrote to her and got

an immediate reply. She did not write in detail. She said she had two sons aged twenty four and nineteen. She concluded by saying that as a large number of Indians are visiting Germany since independence why should I not find a way to do the same. She finished her letter by "As long as I am alive you are most welcome to my house".

Alas for Mariana! She does not know the Sanskrit proverb "Vasundhara virabhogya" (the world belongs to the heroes viras) but today it is "Vasundhara tadbirbhogya", it belongs to those who are masters of tadbir, pulling the strings, buttering up the paladins of the imperial court or / and the various foreign missions. As I am fast approaching the other world destined for me (sadhonachitadham) I would rather employ whatever tadbir I am capable of for gaining a better seat, if not in Dante's paradise, at least in the purgatory.

But Allah's ways are inscrutable. Certain quite unexpected circumstances and a couple of friends created a situation which found me in an Air India plane bound for America over Europe. The service was excellent, the food delicious but as that particular plane did not stop anywhere in Germany I got down at Zurich and took a train to Luzern which I have visited at least four times and shall never be tired of saying "Gruess Gott" to her again.

The Meeting

I caught an evening plane and reached Stuttgart when the light was fading. But there could be no mistake that it was Mariana. As she came towards me from the parking place I could distinctly see the same gait, the same bearing, and I believe with a view to please me she had put on a Kost´u´m and even the same coiffeur she used to have forty years ago. As I approached her she smiled but I did not ask her whether she recognized me at the first glance—who knows what

disappointing answer I might get.

Of course she had grown old (I should say "elderly", according to a German who told me that there are no old ladies in Germany but elderly ladies). She had crow's feet at the corner of her eyes, lines on her forehead and upper lip and her eyes had lost some of their sparkle but inspite of all, the contour of her face and the body was the same. Her "figu" (face in French) had, as I have said, had lines but strange to tell, her figure (taken in the English sense) had not. I was glad to note that she needed no artificial teeth, for often enough they change entirely the contour of the face, and you feel, for good or bad, as if you are not looking at a familiar face. Or as Daudet puts it, looking at a friend through a fog.

"It is actually only forty miles to my village home as the crow flies," she said as she started to drive in a tiny but delightful car, "but it is a strain to drive through the crowded Stuttgart and in the country the lights dazzle my eyes. During the past years I have driven to Stuttgart only twice." I apologized profusely and remembering that Mariana had poor eyes even forty years ago said, "I could have taken an earlier plane, if I only knew. Besides, I could have come from Stuttgart to your home by train. I told you so in my letter." But I knew in the heart of my hearts that she knew, ever since we met for the first time that while travelling as good as an Eskimo in Berlin. But I believe that was not the main reason. She really wanted to do something for me symbolic at the very first moment of our meeting which will give us a good start in our new relationship for, after all, the Germans themselves define friendship as a relationship of mutual attraction between two persons based on sympathy, understanding, respect for each other, common interest and readiness to help one another. I felt that I had not made a mistake in seeking out Mariana after forty years. I was certain that she was not boasting of the trouble she had taken to

come to Stuttgart, for she replied immediately as she always did, "Dont be silly !" which came as naturally as her mentioning the difficulty of driving in the dusk.

Pea soup, Wiener Schnitzel (escalope de veau a la viennoise) and that famous Rhine wine, hoc, par excellence (Liebfraumilch or Liebfrauenmilch). Strange ! how she remembered my favourite dishes & wines which I love & could hardly afford in my student days. After dinner she told me important and occasionally very unimportant events of the past forty years of her life. Mariana's parents were Antinazis and her husband was dragged to the denazification court which caused his untimely death.

I wish I could write in greater detail of my stay at the huge zamindari home where Mariana lived lonely and all by herself ; the sons came only during the holidays but I presume, here, the "Moderns" expect "hot stuff" from me and I shall have to disappoint them. Our days flowed smoothly like oil from a bottle without any tempestuous entracts. Of course we were inseperable. Even while she cooked one by one all my favourite dishes I gave her company in the kitchen. During those days Herr Brandt and his Foreign Minister Herr Scheel were stoutly defending their Ostpolitik in the Parliament and although the whole of Germany was watching it on the television screen, we, having given only one chance to the two Herren, went back to our reminiscences.

But I left Mariana with a deep wound in my heart which will never heal. Amongst other things she said, as if it were of little consequence "You know, when it can be really very, very cold here and the whole locality is snowbound it is really cheerless and I feel extremely lonely. Well, I think it can't be helped". She changed the topic.

And this winter was particularly cruel in Europe just to spite me. Sitting in a warm temperature of seventy

degrees I read that it had snowed even in the south of Italy after many years. Mariana must have been buried in at least six feet of snow. She does need a friend.

Friendship

Nonetheless some great thinkers have maintained that true friendship can exist only between a man and a man and there is no doubt that there are classical examples which have been sung by great poets. The friendship between Achilles and Patroclus, Krisna (Parthasarathi) and Arjuna, the Prophet Muhammad and Abu Bakr, and in recent times German literature has been considerably enriched by the friendship between Goethe and Schiller, as English by Hallam and Tennyson.

Perhaps there is a lurking suspicion in the minds of those thinkers that the friendship between a youngman and a maiden must ultimately turn into love.

Bana, in his famous novel Kadambari, has introduced the *motif* of friendship between a young prince Chandrapida and the daughter of a king, taken captive by Chandrapida's father called Patralekha and brought up by the queen as her own daughter but much to our disappointment, does not elaborate the theme. Tagore has discussed it *in extenso* in his article "The Neglected in Poesy" (Kavye Upekshita) where he counts her along with Lakshman's wife Urmila, the two companions of Shakuntala—Priyambada & Anasuya.

According to Bana, when Chandrapida was sixteen, her mother sent through a chamberlain (kanchuki) a charming young girl, who had not reached her full youth (anatiyauvana), with the message that the prince should accept her as the "bearer of pan-supari" (tambulakarankavahini) that she should not be treated as a servant, but as disciple, a *Friend* (suhrid) so that she might become his parmanent companion.

Tagore comments, Patralekha is not a wife, not a beloved, not a servant ; she is the companion (sahachari) of a male. This curious friendship is like a sand beach between two seas. How can it escape destruction ? That puissant and perrennial attraction which exists between young folk in their early youth—why does it not attack the narrow dam and destroy it ?

"But alas ! the poet has made the poor orphan princess sit for all times on that narrow strip ; what could be a grosser negligence of the poet towards this ill-fated war prisoner ? Living as she did behind a thin curtain she never attained her normal status. She kept awake near the heart of a man but could never step into it".

But not even the thinnest muslin curtain seperated them when it was a matter of friendship. She accompanied him everywhere "like his own shadow" and there proximity was more than ordinary, or shall I any bizarre. While out on military conquests, Chandrapida would make her first sit on an elephant and then take his place behind her. While in the military camp, the prince would converse with his friend Vaishampayana deep into the night. *FRIEND* (sakhi) Patralekha would spread her blanket on the earth and sleep near the Prince.

This relationship is indeed very touchingly sweet but it rejects the full recognition of the right of womanhood. Bana has brought them as close as possible and yet he does not for a moment show any alarm, he does not appear even to be worried that the narrow strip of the sandy beach may be washed away and friendship turn into love. According to Tagore, here, Bana has shown his extreme indifference towards the woman in Patralekha. Had he but shown the least bit of concern with their intimacy—an intimacy which is utterly free from all bashfulness such as is enjoyed between two women only—it would have been some compliment paid

to Patralekha, a recognition of her womanhood, however small.

Finally, to crown it all, Chandrapida falls in love and marries Kadambari. But Patralekha occupies such a very insignificant place in Chandrapida's life that the poet does not bother to throw her out. Indeed Kadambari does not feel the least bit jealous of Patralekha either. Indeed the latter serves as a messenger between Kadambari and Chandrapida when the former is away and she stays with her for some time.

But, asks Tagore, was she not disturbed at all by the scenes of amour which were acted between the prince and her wife? Did not the heat of the prince's impetuous youth ever make the blood in her vein run faster? With supreme nonchalance Bana, according to Tagore, does not pay the least attention to this divine aspect of Chitralekha's life and does not touch even the fringe of the question.

But who knows? Perhaps Bana wanted to paint a new conceit unknown to Sanskrit Kavya and he was afraid to bring them closer lest the reader should expect the eternal triangle, the stock-in-trade of many a Sanskrit dramatist. Perhaps the character and even more the situation of Chitralekha is tragic but it is certainly unique.

Tolstoy firmly believed in the friendship between man and woman. In his criticism of the famous short story of Chekhov "Darling", he goes to the length of considering Mary Magdalene as a source of inspiration of Lord Jesus, and "the relations of friendship and sympathy between St. Clara and Francis were very close and there can be no doubt that she was one of the truest heirs of Franci's inmost spirit". (E. B) In Bengal we remember Sister Nivedita not only as a disciple of Swami Vivekananda (whose birthday is being celebrated as I write this) but as one of his closest friends, associate in all his activities and the most important inspirer in his

life. It is by far the best example of friendship I know of, for unlike Magdalene and St. Clara Nivedita had to go beyond her creed, country and kinsfolk.

Whether we believe it or not :

"Love is only chatter
Friends are all that matter."

There is no doubt whatsoever when the Persian says,

"Dushman chih kunad
agar mehrban bashad dost."

"What can enemies do, if a friend is mehrban."

রায় পিথৌরার কলমে

এই পর্যায়ের লেখাগুলি সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৫১-১৯৫২ সালে রায় পিথৌরা ছদ্মনামে আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখেন। সম্ভবতঃ লেখাগুলি এযাবৎ কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

—সম্পাদক

১

একদা হিন্দুকুশের উত্তরপ্রান্ত ও পারস্যের পূর্ব সীমান্তের বল্‌হিক ও কপিশা, গান্ধার (বর্তমান বল্‌খ্‌, কাবুল, জলালাবাদ) এই সব অঞ্চল ভারতের অংশরূপে গণ্য করা হইত এবং এই সব প্রদেশ হইতে বহু বিদ্যার্থী ভারতে আগমনপূর্বক বিদ্যাভ্যাস করিত। পরবর্তী যুগে নালন্দা তক্ষশিলায় দূরতর দেশ হইতে আগত বহু ছাত্র বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের চর্চা করিত, এ তথ্যও আমাদের অবিদিত নহে।

বৌদ্ধ ধর্মের পতনের পর মুসলমানেরা এই দেশের বড় বড় নগরে বিস্তর মক্তব-মাদ্রাসা স্থাপনা করেন। প্রাচীন পন্থানুযায়ী তুর্কীস্থান, বল্‌খ্‌, কাবুল, জলালাবাদ হইতে পূর্বেরই ন্যায় বহু মুসলমান ছাত্র এই দেশে জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য আগমন করিত। অদ্যাবধি বহু উজবেগ (বাঙলায় তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত 'উজবুক'), হাজারা, আফগান তুর্কমান ভারতের দেওবন্দ, রামপুর, রাঁদের মাদ্রাসায় আগমন করিয়া ন্যূনাধিক চতুর্দশ বৎসর যাপন করতঃ শেষ উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিত। ভারত বিভাগের পরও এ স্রোতধারা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ; কারণ পাকিস্তানে দেওবন্দ, রামপুরের মত উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যায়তন নাই।

ব্রিটিশ যুগে ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিল। ব্রিটিশ স্কুল-কলেজ যে শিক্ষা দিল, আমরা তাহা বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীরা এই শিক্ষা যে কতদূর পদার্থহীন, তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়া আপন সাধ্যমত স্বদেশে বিদ্যায়তন নির্মাণ করিতে যত্নবান হইল। এই ব্যবস্থা ইংরেজেরও মনঃপূত হইল। পৃথিবীর সহিত আমাদের যোগসূত্র যত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় ইংরেজের স্বার্থ ছিল সেই দিকে।

স্বরাজ লাভের পর আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি যে উন্নততর হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনা করার জন্য পুনরায় একটি ক্ষীণ স্রোত বাহিয়া অল্পবিস্তর বিদ্যার্থী এই দেশে আগমন করিতেছে।

বার্লিন, ভিয়েনা, প্যারিস, জিনিভা উদ্বাহু হইয়া বিদেশাগত ছাত্রকে অভ্যর্থনা করে, তাহাদের সুখ-সুবিধার জন্য বহু প্রকারের ব্যাপক ব্যবস্থা করে। এই দেশে সেই জাতীয় কোনো আন্দোলন অদ্যাবধি আরম্ভ হয় নাই।

তাই যখন দিল্লীর জনৈক প্রধান রাজকর্মচারী কয়েকদিন পূর্বে দিল্লীবাসী বিদেশী ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করিয়া আদর আপ্যায়ন করিলেন তখন আমার অবিমিশ্র উল্লাস হইল। নিমন্ত্রণাগত একটি ছাত্র বলিল যে, প্রায় দুইশত বিদেশী ছাত্র

দিল্লীতে অধ্যয়ন করিয়া থাকে এবং তাহাদের একটি আপন প্রতিষ্ঠানও আছে।

পূর্ব আফ্রিকাগত দুইটি নিগ্রো ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় হইল ও তাহাদিগের সঙ্গে আলাপ করিয়া হৃদয়ে বড়ই আনন্দ হইল। অতিশয় ভদ্র এবং নম্র স্বভাব এবং মনে হইল, এই দেশের প্রতি তাহারা ভক্তি পোষণ করে। আমাকে বিনয় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল—তাহা হইতে তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতাও অনুভব করিলাম। নিমন্ত্রণ হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে আমাকে তাহারা পূর্ব আফ্রিকায় সহৃদয় নিমন্ত্রণ জানাইল।

দিল্লীবাসীর কর্তব্য ইহাদিগের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করিয়া ইহাদিগকে আতিথেয়তা প্রদর্শন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে আপন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিধি প্রসার করা। রাষ্ট্রের কর্তব্য ইহাদিগের প্রবাসক্লেশ লাঘব করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

* * *

এই শীতে বঙ্গদেশ হইতে যাঁহারা দিল্লী আগমন করিবেন, তাঁহাদিগকে আরও সদুপদেশ দিবার বাসনা হইতেছে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিতে পাই বহু সদুপদেশ বহুতর অমঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছে—অতএব নিবেদন যাঁহারা সস্ত্রীক আসিবেন, এই উপদেশ তাঁহাদের জন্য নহে। কারণ আমার উপদেশ যদি গৃহিণীরা মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া পালন করেন, তবে দাম্পত্যকলহ শুরু হইবার সমূহ সম্ভাবনা এবং বঙ্গভূমে প্রত্যাবর্তন করিবার পাথেয় অবশিষ্ট না থাকিবার গুরুতর ভয়ও রহিয়াছে। সবিস্তর নিবেদন করি।

চাঁদনি চৌকে গৃহিণী কত বস্তু ক্রয় করিবেন, তাহার অল্পবিস্তর ধারণা আপনার হয়ত আছে, কিন্তু অধুনা ভারত সরকার দিল্লীতে যে কটেজ ইনডাস্ট্রিস এম্পোরিয়াম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতে গৃহিণী প্রবেশ করিলে আপনার কি দুরবস্থা হইবে, তাহার কল্পনা আমি করিতে অক্ষম। অমৃতসহর হইতে ডিব্রুগড়, কুমায়ুন হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যত প্রকারের কুটীর-শিল্প আছে, তাহার তাবৎ নিদর্শন সরকার এই গৃহে সঞ্চয় করিয়া এক বিরাট প্রদর্শনী খুলিয়াছেন।

তাহাতে কাহার আপত্তি, কিন্তু হায় সেইগুলি বিক্রয়ার্থে। যাদুঘরে গৃহিণীকে লইয়া যান পরমানন্দে, নির্ভয়ে। মনিব্যাগ, চেক বুক পকেটে বিরাজমান—কোনো ভয় নাই—গৃহিণী অশোকস্তম্ভ কিংবা যক্ষিণীর প্রতিমূর্তি ক্রয় করিতে চাহিলেও আপনাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতে হয় না, কিন্তু এই স্থলে যমুনার স্রোত পর্বতাভিমুখী। সরকার এই প্রতিষ্ঠানে যে সব তরুণীদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা বিক্রয় করার কলাকৌশল এমনি মোক্ষম আয়ত্ত করিয়াছে যে, আমার

গৃহিণীর মত কৃপণাও লোহিত-বর্তিকা প্রজ্বলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (এই বিষয়ে অত্যধিক বাক্যব্যয় করিব না, আমি আমার দাম্পত্য জীবনে শান্তি কামনা করি)।

যদিও বা আপনি এই কুম্ভীরের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়েন, তথাপি আপনার জন্ম দিল্লীতে আর একটি ব্যাঘ্র রহিয়াছে।

কাশ্মীর সরকারের নিজস্ব কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠান।

বড়ই মনোরম বিপণি। কত প্রকারের শাল-দুশালা, পট্টু-ধোসা, পাপিয়ের মাশের কলাসামগ্রী, ধাতুনির্মিত তৈজসপত্র—দেখিতে দেখিতে আপনার গৃহিণী চঞ্চল হইয়া উঠিবেন, তাঁহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকিবে, কল্পনার চক্ষে তিনি দেখিবেন কোন্ শাল ক্রয় করিলে তিনি ডলি মলি তাবৎ সুন্দরীদিগকে কলিকাতার সান্ধ্যক্লাবে নির্মমভাবে পরাজয় করিতে সক্ষম হইবেন আর আপনিও সঙ্গে সঙ্গে রক্তবর্তিকার যে বিভীষিকা দেখিতে পাইবেন, তাহার কল্পনা করিয়া আমার বিঘ্ন-সন্তোষী হৃদয় বিপুলানন্দ লাভ করিতেছে। আমার নিজস্ব নিদারুণ অভিজ্ঞতা এই স্থলে বর্ণন করিব না।

ধর্ম বলেন, আমার অনুচিত এই সব প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা, কিন্তু আমি নিরুপায়। দিল্লীতে বাস করি, এই দুইটি মনোরম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি সুপরিচিত। আমার কি কর্তব্যবোধ নাই যে, আপনাদিগকে সত্যসুন্দর মঙ্গলের সন্ধান দিব না? আমি কি এতই কাপুরুষ যে, সামান্যা অবলাদিগের ভয়ে সত্য গোপন করিব?

অবশ্য আমার সাহস সম্পূর্ণ অন্য কারণে। 'আনন্দবাজারে'র স্কন্ধ কর্তন করিলেও সেই মহাজনগণ আপনাকে আমার বাসস্থানের উদ্দেশ দিবেন না। তাঁহারা নরহত্যার ঘোরতর বিরোধী। আপনার মঙ্গলও তাঁহারা সর্বান্তঃকরণে কামনা করেন।

* * *

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দার্শনিকগণ দেহলিপ্রান্তে সমবেত হইয়া সপ্তাহাধিক্ কাল নানাপ্রকারের গবেষণা আলোচনা করিবেন। ইঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে কি প্রকারে উভয় ভূখণ্ডের জ্ঞানবিজ্ঞান একত্র করিয়া পৃথিবীতে সত্যশিবসুন্দরের শাশ্বত প্রতিষ্ঠা করা যায়।

ফ্রান্স, জর্মনি, সুইটজারল্যাণ্ড, ইতালী, ইংলণ্ড, জাপান, মিশর, তুর্কী, সিংহল, আমেরিকা ও ভারতের দর্শন-শার্দূলগণ ইতোমধ্যে স্ব স্ব সহানুভূতি ও সহযোগিতা জ্ঞাপন করিয়া পত্র বিনিময় করিয়াছেন।

দর্শনের সেবা করিবার সৌভাগ্য না ঘটিয়া থাকিলেও দার্শনিকদের সেবা করিয়াছি বলিয়া ইঁহাদের সকলেই আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত নহেন।

বিশেষতঃ জর্মনীর অধ্যাপক হেল্‌মুট্ ফন্ গ্লাজেনাপ্। সংস্কৃতে ইঁহার পাণ্ডিত্য গভীর এবং বর্তমান ভারতের সঙ্গেও তাঁহার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। ইঁহার অন্যতম পুস্তক 'বুদ্ধ হইতে গাঁধী' পুস্তক পাঠ করিয়া আমি পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ দিয়াছি। ইনি একাধারে দার্শনিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং আলঙ্কারিক। তাঁহার ভারত-প্রেম অতুলনীয়। ইনি জর্মনীর পক্ষ হইতে ভারত আগমন করিবেন।

তাঁহার পিতা জর্মন ব্যাঙ্কে বহুকাল একচ্ছত্রাধিপত্য করিয়াছেন। তিনিও ভারতীয় বহু বিদ্যায় সুপণ্ডিত। স্পষ্ট স্মরণ নাই, তবে বোধ হইত তিনি কবি ইকবালের সতীর্থ ছিলেন। তাঁহার কাব্যাংশ জর্মনে অনুবাদ করিয়া ইকবাল তাই লইয়া গৌরব অনুভব করিতেন।

পাঠক, দেহলী-প্রান্তের এই আসন্ন সভার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে তুমি লাভবান হইবে।

২

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সেক্রেটারী ডক্টর তারাচান্দ ভারতীয় রাজদূতরূপে ইরাণ যাইতেছেন।

ডক্টর তারাচান্দ যুক্তপ্রদেশ তথা দিল্লী অঞ্চলে সুপরিচিত। সংস্কৃত, ফার্সী আর উর্দু এই তিন ভাষাতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য বহু বিদ্বজ্জনের প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতে মুসলিম সংস্কৃতির অবদান সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে যে শুধু তাহার পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে,—চিত্র, সঙ্গীত, নাট্যকলায় তাঁহার সূক্ষ্ম রসানুভূতি তাঁহার পুস্তকরাজিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে সক্ষম হইয়াছে। দারাশীকুহ'র সম্বন্ধে তাঁহার প্রামাণিক প্রবন্ধ দেশবিদেশে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। পণ্ডিত তারাচান্দ শব্দ এবং ধ্বনিতত্ত্বে সুপণ্ডিত বলিয়া দারার যুগে সংস্কৃত উচ্চারণ কিরূপ ছিল তাহা তিনি দারাকৃত সংস্কৃত শব্দের ফার্সী লিখন পদ্ধতি হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তারাচান্দের সংস্কারবর্জিত মন হিন্দু-মুসলমান উভয় বৈদগ্ধ্যের সম্পূর্ণ সম্মান দিতে সক্ষম হইয়াছে।

ইরাণ এবং মিশরে এতদিন যাবৎ দুইজন মুসলমান ভারতীয় রাজদূত ছিলেন। কাজেই ঐ দেশবাসীদের মনে এই ভুল ধারণা হওয়া অসঙ্গত নয় যে, ভারতবর্ষের

হিন্দুরা বুঝি আরবী ফার্সীর চর্চা করেন না এবং মুসলমানেরাও বুঝি সংস্কৃত, হিন্দী তথা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন।

মৌলবী তারাচান্দ যখন উত্তম উচ্চারণ সহযোগে রুমী-সাদী, হাফিজ-আত্তারের বয়ত আওড়াইয়া ইরাণের মজলিস-মুশায়েরা সরগরম করিয়া তুলিবেন তখন যে তিনি অকুণ্ঠ প্রশস্তিকীর্তন শুনিতে পাইবেন তাহার কল্পনা করিয়াও আমরা উল্লাস বোধ করিতেছি।

ডক্টর তারাচান্দের যাত্রা জয়যুক্ত হউক।

* * *

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং ছাত্র, নেপাল যাদুঘরের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের চিত্রপ্রদর্শনী দিল্লীতে সুরসিকজনের প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

হিন্দুর যেমন শাক্ত বৈষ্ণব, মুসলমানের যেমন সীয়া সুন্নী, ইংরেজের যেমন লেবার কনসারভেটিভ, দিল্লীর তেমনি "অল ইণ্ডিয়া ফাইন্ আর্টস এ্যাণ্ড ক্রাফ্ট্স্ সোসাইটি" এবং "শিল্পীচক্র"। প্রথমটি আভিজাত্যাড়ম্বরে আমন্ত্রিত। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী—এবং অত্যন্ত অনটনের সময় অর্থমন্ত্রী—ইঁহারাই এই প্রতিষ্ঠানের শিল্পপ্রদর্শনী উপলক্ষে হোতা হইবার অধিকার ধারণ করেন। বিদেশাগত যাবতীয় রাজদূতমণ্ডলী, তাঁহাদের ভামিনীকামিনীগণ নগরশ্রেষ্ঠী, ধর্মাধিকারী এবং তাঁহাদের পুত্রকলত্র এই সব প্রদর্শনীতে যোগদান করিবার জন্য যে সব রথ আরোহণ করিয়া আগমন করেন একমাত্র সেইগুলিকেই পরিবেক্ষণ করিবার জন্য রবাহূত অনাহূতগণ যজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে দ্বিতীয় শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া ফেলে।

উত্তম উত্তম চিত্র প্রদর্শিত হয়। দৈনিক মাসিক সর্বত্র সাধুবাদ মুখরিত হইয়া উঠে। নিজেকে ধন্য মনে করি। সার্থক আমাদের দিল্লীবাস!

আর 'শিল্পীচক্র' নিতান্তই অব্রাহ্মণ শ্রেণীর জনপদ প্রচেষ্টা। ইহাতেও উত্তম উত্তম চিত্র প্রদর্শিত হয়। মন্ত্রিবর্গ সচরাচর এই স্থলে আগমন করিবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন না, তবে বিদেশাগত রাজদূতমণ্ডলীর সুরসিক দর্শকেরা 'শিল্পীচক্রকে' অপাংক্তেয় করিয়া রাখেন নাই। অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় সৌজন্যের সঙ্গে জীর্ণবাস শিল্পীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন। তাঁহাদের ললনাগণ উদার স্মিতহাস্যে শিল্পীকে আপ্যায়িত করেন।

দুইটি প্রতিষ্ঠানই দিল্লীনগরের জন্য প্রয়োজনীয়। উভয়েই আপন আপন আদর্শ পালন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

অর্থাভাবে 'শিল্পীচক্র' অনেক সময় আপন প্রদর্শনীগুলিকে অনাড়ম্বর এমন

কি জীর্ণ বেশে পরিবেশন করেন। রসিকজন তাহাতে দুঃখিত হন, কিন্তু বিচলিত হন না। কদলীপত্র অতিথি-সেবকের দৈন্যের পরিচয় দিতে পারে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কদলীপত্রে আতপান্ন ভক্ষণ বিস্বাদ প্রতীয়মান হয় না, কিন্তু সে দৈন্য রুচিহীনতার পরিচয় দেয় না। বিনোদবিহারীর চিত্র চিত্র-বিচিত্ররূপে পরিবেশিত হয় নাই। রসিকজন তাহাতে বিন্দুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার কলাপ্রচেষ্টা অনায়াসে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কিন্তু এই সংসারে কাণ্ডজ্ঞানহীনেরও অভাব নাই। রসবোধ তাহাদের নাই জানি কিন্তু কিঞ্চিৎ বুদ্ধি থাকিলে অরসিকজন আপন রসহীনতা প্রকাশ করে না। এস্থলে যে ব্যক্তি বিনোদবিহারীর নিন্দা করিয়াছেন তিনি রস হইতে বঞ্চিত সে তত্ত্ব আমরা বিলক্ষণ জানি, কিন্তু তিনি যদি ভাষণ না করিতেন, তবে হয়ত পণ্ডিত-রূপেই শোভাবর্ধন করিতেন। তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই; শুধু যে নগরে গুণিজনের অহেতুক নিন্দা হয় সে নগরের নাগরিকমাত্রই নিজেকে বিড়ম্বিত মনে করেন।

* * *

কলিকাতা মহানগরীতে ফুটবল খেলা দেখিবার মত ধৈর্য এবং শক্তি আমার আর নাই এবং দিল্লী শহরে দেখিবার মত প্রবৃত্তিও নাই।

এক বন্ধু বলিলেন, 'বিবেচনা করে এই রাজস্থান এবং পূর্ববঙ্গের মল্লযুদ্ধ যদি তুমি দেখিতে চাও তবে তোমাকে অন্ততপক্ষে তিনশটি রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করিয়া কলিকাতা গমনাগমন করিয়া তাহা দেখিতে হইবে। অপিচ, উভয় পক্ষের যুযুধান ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত। দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর বলিলে যেখানে সামান্যতম অতিশয়োক্তি হয় মাত্র সেই রাষ্ট্রপতি সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া ক্রীড়াজনিত ক্ষাত্র-ধর্মের উৎসাহ উদ্দীপনা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিবেন, সে স্থলে তুমি ন্যূনাধিক তিনটি রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছ? হা ধর্ম! ঘোর কলিকাল! ধিক্ তোমাকে।'

সবিনয় প্রশ্ন করিলাম, 'মূল্য-পত্রিকা ক্রয় করিবার জন্য কত প্রহর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের প্রধান তোরণে উপস্থিত হইতে হইবে?'

সবিস্ময়ে উত্তর করিলেন, 'এ কি বাতুলের প্রশ্ন? অর্ধঘণ্টাই প্রশস্ত।'

এই সুসংবাদ শুনিয়া চিত্তে পুলক সঞ্চারিত হইল না। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের পীঠস্থান কলিকাতা নগরে মল্লযুদ্ধ দেখিতে হইলে দ্বাদশপ্রহর পূর্বে ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন বন্ধুবান্ধবসখাসজ্জন লইয়া উপস্থিত হইতে হয়, আর এই মহানগরী ইন্দ্রপ্রস্থে মাত্র অর্ধঘণ্টা!

আমার দ্বিধা অমূলক নহে।

ইন্দ্রপ্রস্থের সজ্জনগণ মল্লক্রীড়া নিরীক্ষণ করিলেন, ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া করতালি দিলেন, যত্রতত্র অবান্তর সমালোচনা করিলেন, ভদ্রজনোচিত পদ্ধতিতে উভয় পক্ষের মঙ্গল কামনা করিলেন এবং ক্রীড়াশেষে দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা সুখে বিগতস্পৃহ মুনিজনের ন্যায় শান্তসমাহিত চিত্তে স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এইবার আমি বলিলাম, হা ধর্ম!

বিকট চিৎকার, ছত্রহস্তে লম্ফঝম্প, শ্রাবণের বারিধারার মত শোকাশ্রু আনন্দবারি বর্ষণ, মল্লবিশেষের নামোল্লেখ করিয়া তীব্রকণ্ঠে তাহার চতুর্দশ পুরুষকে অভিসম্পাত, পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিপক্ষানুরাগীকে নিদারুণ চপেটাঘাত, ফলস্বরূপ অনুরাগীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ, তস্য ফলস্বরূপ ছত্র ও পাদুকা ক্ষয়, রক্তপাত অঙ্গাঘাত, গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর জয়ী হইলে সন্দেশ বিতরণ, পরাজিত হইলে গৃহিণীকে কটু বাক্যবর্ষণ—

কিছুই না?

এবম্বিধ ক্রীড়া দর্শনে কালক্ষেপ করে কোন্ সুরসিক!

৩

একই সময়ে দিল্লী সহরে দুইটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে; প্রথমটিতে দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে মধ্য ইউরোপের চিত্রতারকাগণ যে কলা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন; দ্বিতীয়টিতে ইন্দোনেশিয়ার কলা সৃষ্টির সর্বাঙ্গসুন্দর সঞ্চয়ন।

এই দুইটি প্রদর্শনী দেখিয়া মনে পুনরায় প্রশ্ন জাগে, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য কি একই রসের অনুসন্ধান করিয়াছে এবং সেই রস যদি একই রস হয়, তবে তাহা উভয় ভূখণ্ডের ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবনে কতখানি প্রসার লাভ করিয়াছে?

কলের জিনিস সস্তায় তৈয়ারী হয় বলিয়া ইউরোপের বাড়িঘর, তৈজসপত্র, বেশ-ভূষা, এমনই এক সর্বজনীন রূপ গ্রহণ করিয়াছে যে, তাহাতে আর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তির রসানুভূতি প্রকাশ পায় না। স্বীকার করি, ইউরোপীয় রমণী পর্দা কিনিবার সময় আপন রুচির উপর নির্ভর করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ পর্দা অন্য লক্ষ লক্ষ পর্দার সঙ্গেই মিলিয়া যায়। পর্দার ক্ষেত্রে কোনো কোনো রমণী হয়ত নিজের হাতে তাহার উপর কিছু কিছু কারুকার্য করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আনয়ন করেন, কিন্তু টেবিল-চেয়ার, বাসন-কোসনের বেলা তাহার কিছুমাত্র অবকাশ থাকে না।

কল সব কিছু তৈয়ার করিয়া দিতেছে, সেখানে মানুষ রসসৃষ্টি করিবার অবকাশ পাইতেছে না—অথচ সে রকম মানুষ সব দেশেই আছে বিস্তর—তাহাদের তখন উপায় কি ?

তখন মানুষ নিত্য ব্যবহার্য তৈজসপত্রকে আর কারুকার্য বিভূষিত না করিয়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কলাসৃষ্টি আরম্ভ করে। ফলে চিত্র এবং ভাস্কর্য মানুষের রসসৃষ্টির মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয়। তাই কলের জিনিস যেখানে সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত—দৃষ্টান্ত-স্থলে মধ্য ইউরোপ—সেখানেই প্রচুর পরিমাণে চিত্র অঙ্কিত হয়, মূর্তি নির্মিত হয়। আমার বিশ্বাস প্যারিস বার্লিন দুই শহরে যে পরিমাণ চিত্র অঙ্কিত হয়, সমস্ত প্রাচ্য দেশে এত ছবি আঁকা হয় না।

আর একটি তত্ত্ব এস্থলে লক্ষণীয় ; নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের কোনো অভাব এই সব চিত্র পূরণ করে না বলিয়া তাহারা দশের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করে না এবং ক্রমে ক্রমে নিরতিশয় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হইয়া দাঁড়ায় এবং খুব বেশী হইলে মাত্র সেই গোষ্ঠীরই চিত্তবিনোদন করিবার চেষ্টা করে যাহারা রসের সংসারে সমগোত্রীয় এবং তাহার শেষ ফল এই হয় যে, এ-ধরণের চিত্র এবং ভাস্কর্য অতিশয় অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ ধারণ করে।

* * *

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই মধ্য-ইউরোপীয় চিত্রকলার এই পরিণতি ঘটিয়াছিল। প্যারিস যদিও বহু বৎসর যাবৎ এই আন্দোলন আলোড়নের কেন্দ্রভূমি ছিল, তথাপি বার্লিন যখন একবার এই আন্দোলন গ্রহণ করিল, তখন তাহার পরিণতি অদ্ভুত অদ্ভুত রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল !

দিল্লীর চিত্রপ্রদর্শনীতে আজ আমরা প্রধানতঃ সেই সব চিত্রের কিয়দংশ দেখিতে পাইতেছি।

ইহাতে ভালো চিত্র নাই, এই কথা আমার বলিবার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু মানুষের অধীর চিত্তকে যে শান্তি দেয়, তাহার সন্ধান এই প্রদর্শনীতে বড়ই কম। যেখানে সমস্তক্ষণ চিত্রকার নূতন ভাষা, নূতন শৈলী, নূতন আঙ্গিকের অনুসন্ধানে ব্যস্ত, সেখানে দর্শক শান্ত সমাহিত রসের সন্ধান করিলে নিরাশ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি ?

গুণের দিক দিয়া অতি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এই চিত্রগুলিতে প্রাণ আছে। প্রচেষ্টার ফল ভালো হউক, মন্দ হউক, প্রচেষ্টা মাত্রই দর্শকের চিত্তে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং সে চাঞ্চল্য গতানুগতিক কিম্বা মৃত কলা অপেক্ষা অতি অবশ্য সর্বথা কাম্য।

* * *

ইন্দোনেশিয়ার কলা সেই দেশের জনসাধারণের কলা। প্রদর্শনীতে যেসব বস্তু রাখা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এমন কি তৈজস এবং মূর্তিগুলি পর্যন্ত হয় গৃহসজ্জায় নয় পুতুলরূপে আনন্দদানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

এবং সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, কি বালির পুতুল, কি গরুড়ের মূর্তি, কি পরিধান বস্ত্রের নক্সা, কি বেতের ঝাঁপি, বারকোশ, কি বালা ব্রুচ আংটি, কি 'বাতিকের' কারুকার্য সর্বত্রই স্পষ্ট বোঝা যায় এখানে কোনো নূতন শৈলীর অনুসন্ধানে উন্মত্ত নৃত্য নাই। রস কি করিয়া প্রত্যেক বস্তুটির ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে হয় তাহার সন্ধান ইন্দোনেশীয়ার কলাকার বহু শতাব্দী পূর্বেই পাইয়াছিলেন এবং সেই সত্যপথ ধরিয়া তাঁহারা প্রতিদিন জীবনের নিত্য ব্যবহার্যের আর কোন্ বস্তুকে আরো সুন্দর করা যায় তাহার চেষ্টা করিয়াছেন। এককালে আমাদের দেশের শিল্পীরাও প্রত্যেকটি জিনিসকে রসরূপ দিবার চেষ্টা করিতেন; এখন তাঁহাদের পরাজয়ের পালা আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিদিন মিলের কাপড়, এলুমুনিয়মের বাসন আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। বিবেচনা করি, এমন দিনও আসিবে যখন দুর্গা প্রতিমা কলে তৈয়ারী হইয়া এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

এই প্রদর্শনীর বহু বস্তুর সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিয়াছি, এ জিনিসটির কি কোনো দোষ কোনো ত্রুটি নাই? স্পষ্ট ভাষায় বলি, এমন বহু জিনিস দেখিলাম যাহাতে সত্যই কোনো প্রকারের ত্রুটিবিচ্যুতি নাই। সর্বাঙ্গসুন্দর কলাসৃজনের এইরূপ অভিনব সঞ্চয়ন আমি আমার জীবনে আর কোথাও দেখি নাই।

রসবস্তু বিচারে কোনো প্রকারের ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা ভৌগোলিক ক্ষুদ্রতার স্থান নাই এই সত্য বারম্বার স্বীকার করিয়াও যদি নিবেদন করি, কোনো সুন্দরী রমণীর মুখে যদি আমি আমার মাতার সাদৃশ্য দেখিতে পাই তবে সেই সুন্দরী কি আমার কাছে প্রিয়তর মনে হন না?

মাতা, ভগ্নী সকলকেই বাল্যকাল হইতে দেখিয়াছি, ঢাকাই শাড়ি পরিতে। দাওয়ায় বসিয়া কত সহস্রবার দেখিয়াছি, বাঁশের বেড়ায় শাড়ি শুকাইতেছে এবং সেইসব পাড়ের নক্সাই তো আমাকে রসশাস্ত্রের প্রথম অ আ ক খ শিখাইয়াছে। জ্বরের ঘোরে যখন বালক তাহার দৃষ্টিশক্তির কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে তখন সে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে মাসীমার শাড়ির পাড়ের দিকে। চেতন অর্ধচেতন উভয় মনই বাল্যকাল হইতে আপন অজানাতে এই সব বস্তু দিয়াই তাহার 'শিল্পসূত্র' (ক্যাননস অব আর্ট) নির্মাণ করে।

অকস্মাৎ এই প্রদর্শনীতে দেখি, ঢাকাই পাড়ের নক্সা! দেহলি প্রান্তের রসযজ্ঞ-শালার প্রান্তভূমিতে ঢাকাই নক্সা অনাদৃতা। তাই অর্ধপরিচিত সমুদ্রপারে আদৃত (না হইলে এই নক্সা প্রদর্শনীতে স্থান পাইবে কেন) এই নক্সা দেখিয়া আমার চিত্ত অভিভূত হইয়া গেল।

প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা শ্রীযুত বিনোদ এবং মহরাজা উভয়ই ইন্দোনেশিয়ার কলাতে ভারতের প্রভাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। তদুপরি এই তথ্যও জানি ভারতের বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ অঞ্চলই ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সর্বাধিক বাণিজ্য করিয়াছে। আরো জানি ঢাকাই শাড়ির নক্সা উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচলিত নহে।

তাহা হইলে আমার সুপরিচিত ঢাকাই শাড়ির নক্সাই তো এই নক্সাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

তাহা হইলে আমারই অনাদৃত আমার দেশের তন্তুবায় একদা রসভূমিতে ইন্দোনেশিয়া জয় করিতে সক্ষম হইয়াছে। পাঠক আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আপনি পারেন না। আমিও পারি নাই।

* * *

কবিগুরু কর্তৃক রচিত বালি দ্বীপ কবিতাটির কয়েকটি ছত্র এই উপলক্ষ্যে উল্লেখ করি :—

"সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরিশিখর 'পরে,
    একেলা ছিলে ঘরে।
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতীমালা সাথে,
    কাঁকনদুটি ছিল দু'খানি হাতে।
চলিতে পথে বাজায়ে দিনু বাঁশি—
    'অতিথি আমি' কহিনু দ্বারে আসি।
তরাসভরে চকিত করে প্রদীপখানি জ্বেলে
    চাহিলে মুখে; কহিলে 'কেন এলে।'
কহিনু আমি, 'রেখো না ভয় মনে—
    তনুদেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।'
আধোচাঁদের কনকমালা দোলানু তব বুকে।
মকরচূড় মুকুটখানি করবী তব ঘিরে
    পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতনসাজ করিল ঝলমল।—"

৪

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহল সব দেশেই আছে, কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা যায় আজ পর্যন্ত কোন্ দেশ সবচেয়ে বেশী কৌতূহল দেখিয়েছে এবং সেই কৌতূহল পরিতৃপ্ত করার জন্য সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করেছে কে, তা হলে সকলের পয়লা নাম নিতে হয় জর্মনির।

আর কিছু না; শুধু যদি এই মাপকাঠিই নিই, ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, কাব্য, অলঙ্কার সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী বই লেখা হয়েছে কোন্ ভাষায় তা হলেই জর্মনি পয়লা প্রাইজ পেয়ে যাবে। এখানে অবশ্য এমন সব কেতাবের কথা উঠছে না যেগুলো শুদ্ধমাত্র ভারতবর্ষকে কব্জা রাখার জন্য ইংরেজ লিখেছে বা লিখিয়েছে, কিম্বা এমন সব কেতাবের কথাও উঠছে না যেগুলো পড়া থাকলে হাতী শিকারের সুবিধে হয় অথবা ক্রিকেট খেলার 'পিচ' বানাবার সময় কাজে লাগে। সোজা বাঙলায় যাকে বলে 'শাস্ত্র-চর্চা' আমি সেই শীল সেই অধ্যবসায়ের কথা ভাবছি।

* * *

জর্মনিতেও ভারতের চর্চা আরম্ভ হয় পঞ্চতন্ত্র নিয়ে। পঞ্চতন্ত্রের পেহলভী তর্জমার আরবী তর্জমার লাতিন তর্জমার জর্মন অনুবাদ হয় ট্যুবিঙ্গেন শহরে সেখানকার রাজার আদেশে। তারপর আঠারো আর উনিশ শতকে জর্মনি সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত আর অর্ধ-মাগধী শিখে ভারত সম্বন্ধে যে চর্চাটা করল তার সামনে দাঁড়িয়ে বার বার মাথা নিচু করতে হয়। এ চর্চাতে যে শুধু ভাষাবিদ পণ্ডিতেরাই যোগ দিলেন তা নয়, জর্মন দার্শনিক, সাহিত্যিক, কবিরা পর্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত হলেন।

* * *

প্লাতো, দেকার্ত আর তার পরেই কাণ্ট।

দার্শনিক কাণ্টও যে ভারত নিয়ে চর্চা করেছিলেন এ তত্ত্ব ক'জন লোক জানে?

কাণ্টের সময় ভারত সম্বন্ধে ইয়োরোপের জ্ঞান এত সামান্য ছিল যে কাণ্টের পক্ষে ভারতীয় দর্শন চর্চা করা সম্ভবপর হয়নি, কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলে যে সামান্য দু'একটি খবর তিনি জানতে পেরেছিলেন তারই জোরে বলে যান, "ক্রীশ্চান মিশনারীরা ভারতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখেন, ভারতীয় পণ্ডিতরা অত্যন্ত উৎসাহ এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে খৃষ্টধর্মের বাণী শোনেন; কিন্তু ভারতীয়রা আশ্চর্য হল এই দেখে যে ক্রীশ্চান মিশনারীদের হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল নেই।"

এ তত্ত্ব আজ আমরা সবাই জানি, কিন্তু আশ্চর্য সে যুগে কাণ্ট ওটা জানলেন কি করে? খৃষ্ট ধর্ম যে এদেশে প্রচার এবং প্রসার লাভ করল না সেই তো তার প্রধান কারণ। ভাবের জগতে তো 'ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক' অচল!

* * *

গ্যোটে 'শকুন্তলা'র প্রশস্তি গেয়েছিলেন—তারই খেই ধরে রবীন্দ্রনাথ একখানা উত্তম প্রবন্ধ লেখেন সে কথা আমরা সবাই জানি।

তারপর বিখ্যাত কবি হাইনরিশ হাইনে কল্পনার চোখে ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভারী চমৎকার কয়েকটি কবিতা লেখেন। জর্মন ছেলে বুড়ো কোনো ভারতীয়কে পেলেই সে সব কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে আনন্দ পায়। ভারতীয় গর্ব অনুভব করে—অবশ্য বলে রাখা ভালো নিছক কল্পনার উপর খাড়া বলে হাইনের কবিতাতে দু'একটি বর্ণনার ভুল থেকে গেছে। গঙ্গার জলে হাইনে পদ্ম ফুটিয়েছেন এবং সেই পদ্মর সামনে হাঁটু গেড়ে পূজো করছে ভারতীয় তরুণী।

তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ ওদিকে আবার বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কলহে হাইনে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের দ্বন্দ্ব দেখতে পেয়েছেন এবং জর্মনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

* * *

আসল কৃতিত্ব কিন্তু জর্মনরা দেখিয়েছে বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত পুরাণ গীতা, শ্রৌত সূত্র, গৃহ্য সূত্র, ষড়দর্শন, ভক্তিবাদ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র নিয়ে।

ঋগ্বেদের অনুবাদ উনিশ শতকে হয়; তারপর তুলনাত্মক ভাষা চর্চার ফলে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেকখানি বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেই পুরাতন অনুবাদই চালু থাকে। মাক্স্‌ম্যুলারের পর ঋগ্বেদ অনুবাদ করবার মত দুটো মাথা কটা লোকের ঘাড়ে আছে?

সেই সাহস দেখালেন আরেক জর্মন পণ্ডিত—মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেল্‌ড্‌নার।

গেল্‌ড্‌নারের ঋগ্বেদ-অনুবাদ আশ্চর্য বই। গ্রাসমান, লুডবিশ, মাক্স্‌ম্যুলারের যুগ থেকে ১৯২০ (মোটামুটি) পর্যন্ত ঋগ্বেদ সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ যত ভাষায় লেখা হয়েছে তার সামান্যতম মূল্যবান জিনিসও কোনো না কোনো উপলক্ষ্যে গেল্‌ড্‌-নারের অনুবাদে স্থান পেয়েছে। ফলে এই হয়েছে যে আজ ঋগ্বেদ সম্বন্ধে প্রামাণিক কোনো তথ্য অনুসন্ধান করার সময় বিশ্বভুবন খুঁজে বেড়াতে হয় না—গেল্‌ড্‌-নারের জর্মন অনুবাদখানাই যথেষ্ট।

* * *

কিন্তু এর শেষ কোথায়? ঋগ্বেদ সম্বন্ধে যা বলা হল তাও তো অতিশয় সংক্ষেপে। এখন যদি আর তিনখানা বেদ নিয়ে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করি, তাহলে লিখতে হবে আরেকখানা মহাভারত এবং সে মহাভারত ব্যোটলিঙ্ক-রোটের সংস্কৃত-জর্মন অভিধানের আকার ধারণ করবে।

ব্যোটলিঙ্ক-রোটের অভিধানখানি সার্থক বই। এ অভিধানকে হার মানাতে পারে এ রকম অভিধান পৃথিবীতে নেই।

এর পশ্চাতে একটুখানি ইতিহাস আছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি জর্মনরা বলল, 'ভালো অভিধান ছাড়া আর তো সংস্কৃত চর্চা করা অসম্ভব হয়ে উঠল। এর একটা কিছু ব্যবস্থা করা উচিত।'

ব্যোটলিঙ্ক-রোট দুই গুণী অভিধানখানা লিখতে রাজী হলেন। বিরাট সাত ভলুমে সে অভিধান শেষ হল, কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল এ অভিধান ছাপাতে যাবে কোনো প্রকাশক—এত রেস্ত আছে কোন্ গৌরী সেনের?

গৌরী সেন রাজা ছিলেন না—তাই তুলনাটা টায়-টায় মেলে না। কারণ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এ অভিধান ছাপাবার মত পয়সা আছে শুধু রাশিয়ার জারের।

তখন জর্মন পণ্ডিতরা পাকড়াও করলেন তাঁকে—জারটি ভালো মানুষ ছিলেন (রামচন্দ্র! কম্যুনিস্ট ভায়ারা না আবার চটে যান) এবং টাকাটা অকাতরে ঢেলে দিলেন।

শুধু এই অভিধানখানিকে ভালো করে কাজে লাগানোর জন্যই জর্মন ভাষা শেখা উচিত।

মনে পড়ছে, প্রথম যৌবনে 'ক্রন্দসী' শব্দের সামনে কাঁদ কাঁদ হয়ে মেলা অভিধান ঘাঁটার পর ব্যোটলিঙ্ক-রোটের অভিধান খুলে শব্দটার হদিস পাই। (স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহোদয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই—তিনি বাঙালীর গৌরবস্থল ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। তাই তাঁর সামান্য দোষ-ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করলে তাঁর আত্মা বিরক্ত হবেন না বলে আশা রাখি। তাই এই উপলক্ষ্যে নিবেদন করি, জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁর অভিধানে 'ক্রন্দসী' শব্দ উল্লেখ করে যে বলেছেন 'সংস্কৃত অভিধানে পাই নাই, কিন্তু রোদসী পাইয়াছি' পুনরায়, 'কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উদ্ভাবিত' এই দুটি বাক্যই খুব ঠিক নয়।)

* * *

বপ, ডয়সেন, অণ্ডেনবুর্গ, য়াকোবি, হিলেব্রাণ্ট, ড্যুটওয়া এঁদের সবাইকে বাদ

দিয়ে তাঁদের কথায়ই আসি না কেন যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ হয়েছে।

এই ধরুন ল্যুডার্স। গেলড্‌নারের পরেই চতুর্বেদে পণ্ডিত ছিলেন এই বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক।

মোন-জো-দড়ো নিয়ে যখন বিশ্বভুবন মাথা ফাটাফাটি করছে, এ কোন্ সভ্যতা, এর বয়স কত, একে গড়ে তুলল কে, তখন জর্মনি ল্যুডার্সকে অনুনয় করে বলল, 'চতুর্বেদে হেন বস্তু নেই যা আপনার অজানা। আপনি মোন-জো-দড়ো ঘুরে এসে বলুন, বেদে বর্ণিত কোনো কিছু কি মোন-জো-দড়োতে আছে যার থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে যে মোন-জো-দড়ো আর্য সভ্যতা।'

ল্যুডার্স ঘুরে গিয়ে বললেন, 'না, বেদের সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগ নেই।'

ব্যস্। সব মাথা-ঘামানো বন্ধ।

সব শাস্ত্রেই ল্যুডার্সের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। শেষ বয়সে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রটি অধ্যয়ন করে তার সঙ্গে গ্রীক অলঙ্কার শাস্ত্র মিলিয়ে যখন বক্তৃতা দিতেন তখন দেখেছি তাঁর শ্রোতারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনে যেতেন। এ রকম পণ্ডিত জর্মনিতে আবার জন্মাবেন কবে?

* * *

কিম্বা ধরুন কির্ফেল।

জৈন শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত যাকোবির (ইনি স্বাধীনভাবে হিসেব করে লোকমান্য টিলকের সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হন) শিষ্য কির্ফেলকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'উপস্থিত কোন বিষয় নিয়ে মগ্ন আছেন?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'পুরাণ নিয়েই তো জীবনটা কাটল। অন্য জিনিস ভালো করে পড়বার ফুর্সৎ পেলুম কই।'

জিজ্ঞাসা করি, পুরাণের দেশ ভারতবর্ষে কয়জন লোক পুরাণের জন্য প্রাণ দেয়? একজনকে জানি—বাঙালী মাত্রই তাঁকে জানে।

কিন্তু আজ এ শিবের গীত কেন?

এ সপ্তাহে দিল্লীতে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন জর্মন পণ্ডিত অধ্যাপক ডক্টর হেলমুট ফন্ গ্লাজেনাপ। বিষয় ছিল, জর্মনির উপর ভারতীয় প্রভাব। সে বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলুম।

শ্লেগেল থেকে আরম্ভ করে উইণ্টারনিৎস-ল্যুডার্স পর্যন্ত তিনি পণ্ডিতের ভারতীয় জ্ঞান চর্চার ইতিহাস দিলেন। বয়স হয়েছে, স্মরণশক্তির উপর আর নির্ভর করতে পারিনে, তবু টুকতে পারিনি।

তাই যেটুকু মনে ছিল তার সঙ্গে পিথৌরার অভিজ্ঞতা জুড়ে দিয়ে আপনাদের

সামনে নিবেদন করলুম।

প্ল্যাজেনাপ তার বক্তৃতা শেষ করেন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এবং তার উত্তর দিয়ে।

জর্মনি ভারতীয় শাস্ত্র নিয়ে এত চর্চা করে কেন?

উত্তরে বলেন, 'উভয় জাতিই উচ্চ চিন্তাতে আনন্দ পায়।'

আমরাও স্বীকার করি।

৫

ইংরেজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেবা করাতে, ফরাসী উত্তম ছবি আঁকতে, জর্মন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রচনা করাতে কৈবল্যানন্দ অনুভব করে আর বাঙালী 'বলেছিলুম, তখুনি বলেছিলুম' বলতে পারলে অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী করাতে সে সুপটু এ-কথা সপ্রমাণ করতে পারলে জীবনে তার আর কোনো বাসনা থাকে না।

তাই আমিও আজ সোল্লাসে বলছি, 'বলিনি, তখনি বলিনি শ্রীযুত মুখুয্যে মশাইকে লাটসাহেব বানিয়ে ভারত সরকার অতি উত্তম কর্ম করেছেন?' ভদ্রলোক মাইনে নেন নামমাত্র, আর আজ শুনতে পেলুম, তিনি নাকি বলেছেন, এত বড় বিরাট লাট-ভবনের তাঁর প্রয়োজন নেই, তিনি মাত্র দু'একখানি ঘর নিয়ে বাদ বাকি অন্য কাজের জন্য ছেড়ে দেবেন।

কিন্তু একটা জিনিসে মনে একটু খটকা লাগল। শুনলুম, লাটবাড়ির ফালতো ঘরগুলোতে নাকি আপিস বসবে।

* * *

আমার জনকয়েক গুণী বন্ধুবান্ধবের বিশ্বাস তার চেয়ে যদি ঐ ঘরগুলো দিয়ে কোনো প্রকারের বৈদগ্ধ্যগত প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা যায়, তবে লাটবাড়ির সম্মান বজায় থাকবে, বাঙালীরও উপকার হবে।

এই ধরুন না, রবীন্দ্রভবন। কলকাতার কবি রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা বাঙলা দেশের রাজধানীও বটে। তবু এই কলকাতা শহরেই যদি আপনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনো প্রামাণিক গ্রন্থ লিখতে চান, তবে আপনাকে একাধিক জায়গায় ছুটোছুটি করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত সব জিনিস পাবেন কিনা, সে বিষয়েও আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

লাটবাড়িতে এ ব্যবস্থাটা করলে হয় না?

কিম্বা মনে করুন, একখানা উত্তম চিত্রশালা খুললে হয় না?

আরো কত কিছু করা যেতে পারে। আমার পাঠকেরা গুণী লোক,—মাথা না

চুলকিয়েও গুম্‌ গুম্‌ করে পঁচিশখানা ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা বাৎলে দিতে পারবেন। আমার মনে হয়, গুণীদের এ বিষয়ে চুপ করে থাকা উচিত নয়। আমাকে যদি পত্রযোগে জানান, তবে আমি তাঁদের মোক্তার এবং মুহুরিরূপে পাঠক-ধর্মাবতারের এজলাসে পেশ করতে পারি।

কিন্তু আপিস, না স্যর, লাটবাড়িতে আপিস—ও কোনো কাজের কথা নয়। শালিগ্রাম দিয়ে মশারির পেরেক পোঁতা? (ক্ষিতিমোহনবাবুর কপিরাইট)।

* * *

দুই দোরে ডবল পর্দা, দরজায় হুড়কো, ভেন্টিলেটরে কালো কাগজ সাঁটা তবু দুপুর বেলা ঘরে বসেই আমেজ করতে পারলুম বাইরে কিছু একটা হচ্ছে—ভূতের নৃত্য কিম্বা পিশাচিনীর শ্রাদ্ধ।

অতি সন্তর্পণে দরজা ফাঁক করে দেখি—মারাত্মক কাণ্ড।

আসমানজমীন গাছপালা সব কিছুর যেন জণ্ডিস হয়েছে। অতি সূক্ষ্ম ধুলোর ঝড় বইছে—এখানে যাকে বলে আঁধি—আর সেই ধুলো আকাশে-বাতাসে এমনি ছড়িয়ে পড়েছে যে মনে হয়, যেন জণ্ডিসের কুয়াশায় সব কিছু আচ্ছন্ন।

মনে হল যেন, পরশুরামের সেই ছবি দেখছি। কুয়াশার ভিতর দিয়ে শোনা গেল "সব আছে, সব আছে হরিনাথ, সব আছে।"

নিজাম প্রাসাদে, জানিনে, কোন কাষ্ঠরসিক গুটিকয়েক ঝাউগাছ গজিয়েছেন। বিরাট বিরাট গাছ—এদের আসল জন্মভূমি পাহাড়ে। সমস্ত বৎসর এরা বিরস বিবর্ণ মুখে কাটায়, শুধু শীতকাল এলে দেশের হাওয়া পেয়ে যেন চঞ্চল নৃত্যে নেচে ওঠে।

গ্রীষ্মকালে গরমের তেজে এদের থোকা থোকা সবুজ নীডল (পাতা) ঝলসে গিয়ে একদম হলদে হয়ে যায়, আর যেন কোনো গতিকে গাছের গায়ে আঁকড়ে ধরে টিকে থাকে।

দেখি ঝড়ের হাওয়া ঠাস ঠাস করে ঝাউয়ের গায়ে থাবড়া মারছে আর খাবলা খাবলা নীডলের গুচ্ছো তুলোর মত এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে। মাটিতে পড়ে গিয়েও এদের নিষ্কৃতি নেই। আঁধির জল্লাদ খুন করে চলে গেল, এখন তারই মুর্দফরাস এদের ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—বাগানের এদিক থেকে ওদিক, আবার ওদিক থেকে এদিক।

তিনটে বাজল, চারটে বাজল—ঝড়ের বেগ—বেড়েই চলেছে। কি অলুক্ষণে কাণ্ড!

* * *

রাত তখন আটটা। শুনলুম, প্রধান মন্ত্রীর প্লেন অতি কষ্টে নাকি এ্যারোড্রোমে নামতে পেরেছে, আর তার আধঘণ্টাটাক পরেই মাদ্রাজের প্লেন মাটিতে নামতে না পেরে দুর্ঘটনায় খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গিয়েছে—একটি প্রাণীও বাঁচেনি।

আমি জানি, আপনারা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু সমস্ত দুপুর আমার মনে কেমন যেন একটা অজানা ভয় জেগে রয়েছিল, কিন্তু শেষটায় যে এতগুলো জীবন নষ্ট হবে, তার কল্পনাও মনে করতে পারিনি। আর কল্পনা করলেই বা কি করতে পারতুম?

পরদিন সুহৃদ ডাক্তার মজুমদার এবং লেডি ডাক্তার স্বরূপের সঙ্গে দেখা। এঁরা দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে অকুস্থানে যান। যে ক'জনের তখনো প্রাণ ছিল, তাদের হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না।

আমার মনে শুধু এইটুকু সান্ত্বনা যে, আমার বন্ধু মজুমদার এবং আমার শিষ্যা (ডাক্তারিতে না) শ্রীমতী স্বরূপ আর্তজনের সাহায্য করাতে কোনো ত্রুটি তো করেনই নি—স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁরা সফদরজঙ্গ হাসপাতালে কর্ম করেন—এ্যারোপ্লেন দুর্ঘটনা সম্পর্কে এঁদের কোনো সরকারী দায়িত্ব নেই। ভগবান এঁদের মঙ্গল করুন।

* * *

দিল্লীস্থ শান্তিনিকেতন-আশ্রমিক সঙ্ঘ এবং নিউদিল্লী বাঙালী ক্লাব যুগ্মভাবে সুসাহিত্যিক শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশীকে ২৫শে বৈশাখ উপলক্ষে দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করেছেন। শ্রীযুত প্রমথনাথের লেখার কদর কে কতটা দেন, তার বিচার রায় পিথৌরা করবেন না। কিন্তু এ-কথা ঠিক, বাঙলা সাহিত্যের সেবা আজকের দিনে যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুত বিশীই রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছিলেন সব চেয়ে বেশী। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রৌঢ়। তাঁর স্বাস্থ্য তখন অটুট, ওদিকে কবিত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি তখন পরিপূর্ণতায় পৌঁছে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন অক্লান্ত অধ্যাপনা করছেন ও সঙ্গে সঙ্গে কাব্যসৃষ্টিও চলছে। এবং সর্বশেষ কথা, প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের স্নেহ পেয়েছিলেন অকৃপণভাবে।

রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুত বিশীর কাব্য এবং সাহিত্য প্রচেষ্টার প্রশংসা করতেন আবার প্রয়োজন হলে কঠিন সমালোচনাও করতেন। নিতান্ত আত্মজন না হলে রবীন্দ্রনাথ কারো কঠোর সমালোচনা করতে চাইতেন না। (আর সাহিত্যের বাইরে তেল কিম্বা কালির জন্য তিনি যে-সব সার্টিফিকেট দিয়েছেন, সেগুলোর মূল্য কতটুকু সে তো সবাই জানেন) তাই শ্রীযুত বিশী সেদিক দিয়েও ভাগ্যবান।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, বাঙলা দেশ শ্রীযুত বিশীর সামর্থ্যের সম্পূর্ণ ফললাভ করতে পারেনি।

* * *

পূর্ব এবং মধ্য আফ্রিকায় বহু ভারতীয় বসবাস করেন। মহাত্মা গান্ধীর কর্ম-জীবন এঁদের নিয়েই আরম্ভ হয়।

এ সব জায়গায় বর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হচ্ছেন, খাস ইয়োরোপীয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন ভারতীয় তার পর বোধ করি আরব এবং সর্বশেষে দেশের মাটির ছেলে-মেয়েরা অর্থাৎ নিগ্রোরা।

ইংরেজ যে ভারতীয়দের ভালো চোখে দেখে না, সে তো জানা কথা কিন্তু সেখানকার ভারতীয়রা যখন নিগ্রোকে তাচ্ছিল্য করে, তখন আমার মনে বড় লাগে। 'অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান' রবীন্দ্রনাথ যে কতবড় এই বেদবাক্য বলে গিয়েছেন, সে কথা তাঁরা জানেন না (আমরাই জানি কি ?)।

পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রীযুক্ত আরাসাহেব পন্ত দিল্লী এসেছেন। তিনি বলেন, আফ্রিকা, ইংরেজ, ভারতীয়, আরব, নিগ্রো সবাইকে মিলিয়ে একটা অখণ্ড সমাজ যদি না গড়ে তোলা যায় তবে ভবিষ্যতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তাঁর বিশ্বাস এই অখণ্ড সমাজ গড়ে তুলতে পারে প্রধানতঃ তথাকার ভারতীয়রাই। তাই তিনি মনে করেন, এখানকার ভারতীয়েরা যেন পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয়দের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করেই সন্তুষ্ট না হন, তাঁরা যেন সেই অখণ্ড সমাজের দিকে দৃষ্টি রেখে আপন প্রচেষ্টা ধাবিত করেন।

মহাত্মাজীর সহকর্মী শ্রীযুত কাকাসাহেব কালেলকর পূর্ব আফ্রিকায় গিয়ে বহু সৎকর্ম করেছেন। আপন অভিজ্ঞতা একখানা উত্তম হিন্দী পুস্তকে প্রকাশ করেছেন—সে পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদও হচ্ছে।

আরেকটি গুণী লোক পণ্ডিত শ্রীঋষিরাম। ইনি উপস্থিত আফ্রিকাতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার করছেন। আমাকে প্রায়ই চিঠিপত্র লেখেন এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে সব ছবি পাঠান, সেগুলো দেখে ভগবানকে বলি, আসছে জন্মে যেন নিগ্রো হয়ে জন্মাই।

উঁহুঁ ; সেটি হবার জো নেই।

তন্দুরী, মুর্গী মাফিক দিল্লীর গ্রীষ্ম জাহান্নম তন্দুরী-আদমী বনে যাওয়ার পর তো।

পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস পালন করাতে দিল্লী যা উৎসাহ দেখায়, কলকাতার তুলনায় সে কিছু কম না। অবশ্য দিল্লী সহরে গণ্ডা গণ্ডায় সুসাহিত্যিক নেই; কাজেই রবীন্দ্রজীবনী এবং সাহিত্য সম্বন্ধে যতখানি বহুমুখী এবং বিস্তৃত আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন ঠিক ততখানি হয়ত হয়ে উঠে না।

এবারে কলকাতা থেকে এলেন শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী সেই অভাব খানিকটে পূরণ করতে। কালীবাড়ি ক্লাবে শ্রীযুত বিশী বিরাট জনতার সামনে বক্তৃতা দেন। শ্রীযুত বিশী সম্বন্ধে দিল্লীর নগণ্য নাগরিকরূপে রায় পিথৌরা কি ধারণা পোষণ করেন, সে সম্বন্ধে গত সপ্তাহে নিবেদন করেছি এবং এ সপ্তাহে সপ্রমাণ হয়ে গেল যে, তাঁর ধারণা ভুল নয়।

অন্যান্য স্থলে ভাষণ দেন শ্রীযুত হুমায়ুন কবীর এবং শ্রীযুত দেবেশ দাশ। একই দিনে প্রায় সব কটি পরব হয়েছিল বলে রায় পিথৌরা দু'একটির বেশী সামলে উঠতে পারেন নি। তবে এঁদের পাণ্ডিত্যের খবর রাখি বলে লোকমুখে যখন শুনলুম এঁদের বক্তৃতা সত্যই উপভোগ্য হয়েছিল তখন সে কথা অনায়াসেই বিশ্বাস করতে পারলুম।

'শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সঙ্ঘ' চিত্রাঙ্গদা গীতিনাট্যের প্রায় সব কটি গান গাওয়ার ব্যবস্থা করেন। শ্রীযুত নীলমাধব সিংহ নিষ্ঠার সঙ্গে গানগুলির পরিচালনা করেন এবং অনুষ্ঠানটি যে সফল হয়েছিল, তার প্রধান কারণ ছেলেমেয়েরা গানগুলো অতি সযত্নে বহু পরিশ্রম করে আয়ত্ত করেছিল। শ্রীমান কৌশিক ও শ্রীমতী নন্দিতা এবং আরো অনেকেই অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য সাহায্য করেন। রায় পিথৌরাও মাঝে মাঝে 'উপর চাল' মারার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে কেউ বড় একটা আমল দেয়নি।

*　　　*　　　*

অনেকেই বলেন, একই দিনে অনেকগুলো পরব না করে কোনো এক কেন্দ্রীয় স্থলে মাত্র একটি বিরাট সভা করা উচিত। আমি এ-মত পোষণ করিনে। দিল্লী বিরাট শহর এবং এক স্থল থেকে অন্য স্থল যাওয়ার যা কুব্যবস্থা তাতে করে সেই কেন্দ্রীয় সভায় দিল্লীর অধিকাংশ রবি-ভক্তরাই উপস্থিত হতে পারবেন না। তাই একই দিনে কালীবাড়ি, লেডী আরউইন স্কুল, লোদী কলনী এবং বিনয়নগরে যদি রবীন্দ্র-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তবে সেই ব্যবস্থাই ভালো।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় একটি সভা হলে আরো ভালো। গেল বৎসর 'টেগোর সোসাইটি' নিউদিল্লী এবং টাউন হলে তার আগের বৎসর দিল্লী বিশ্ব-

বিশ্বালয়ে বড় বড় সভার আয়োজন করেছিলেন। এ বছর কেন হল না বোঝা গেল না। তবে একটা কারণ এই যে, দিল্লীতে 'প্রফেশনাল' সাহিত্যিক কিম্বা সাহিত্যসেবী কেউ নেই—সকলকেই কোনো-না-কোনো দপ্তরে সুবো-শাম কলম পিষতে হয়, তাই সবাই প্রতি বৎসর সব কিছু করে উঠতে পারেন না।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব আরো কিছুদিন ধরে চলবে। এ জিনিস যত বেশী দিন ধরে চলে ততই ভালো।

* * *

খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীযুত কানহাইয়ালাল মুন্সী বিদায় নেবার সময় বলেন ভারতবর্ষের কোনো খাদ্য-মন্ত্রীই কিচ্ছুটি করতে পারবেন না, যদি তিনি বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রকে চাপরাসীরূপে না পান।

তাতেও কিছু হবে না। মন্ত্রীদের চাপরাসী মহাশয়গণের প্রধান কর্ম চেয়ারে বসে বেঞ্চিতে পা তুলে দিয়ে মেঘগর্জনে ঘুমনো। পর্জন্য যদি চাপরাসী হন তবে তিনি ঐ গর্জনই ছাড়বেন—ঐ একই পদ্ধতিতে—বৃষ্টি নামাবেন না।

দ্বিতীয়তঃ পর্জন্যকে চাপরাসী ইতঃপূর্বে একবার হয়ত হয়েছিল তবে কি না যার চাপরাসী তিনি হয়েছিলেন সে বেচারী খুন হয় এক মানুষেরই দ্বারা।

স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে, তবু আবছা মনে পড়ছে,—

ইন্দ্র যম আদি করে বাঁধা আছে যার ঘরে
ছয় ঋতু খাটে বার মাস
সমীরণ ভয়ে ভয়ে চলে মৃদু গতি হয়ে
দেব রক্ষ যক্ষ যার দাস।

সেই শ্রীমান রাবণ যখন বেঘোরে প্রাণ দিলেন, তখন ইন্দ্রকে পুনরায় চাপরাসী করতে যাবে! কে?

আমার মনে হয়, মুন্সীজী উত্তমরূপে বিবেচনা না করে এ প্রস্তাবটি করেছেন। যদি ধরেই নি, তিনি ইন্দ্রকে কব্জাতে এনে ফেলেছেন—তা হলে? তা হলে তো তাঁকে রাবণ বলে ডাকতে হবে। রাম, রাম!

* * *

কিন্তু আসল কথা সেইটে নয়।

ইন্দ্র কে, বৃষ্টিই বা কি?

শাস্ত্র বলেন, জল কারারুদ্ধ করে রাখে বৃত্র এবং সেই বৃত্রকে বধ করে ইন্দ্র জলকে মুক্তি দিয়ে মানুষের জন্য নাবিয়ে নিয়ে আসেন। কোনো মুনি বলেন, হিমালয়ের গিরিকন্দরে বৃত্র জলকে বরফে পরিণত করে দেয় বলে সে জল আর

জনপদভূমিতে নেমে আসতে পারে না। ইন্দ্র হচ্ছেন বসন্তের সূর্য। শীতের শেষে তাঁর রৌদ্রবাণ বরফকে খণ্ড খণ্ড করে দেয় আর গভীর গর্জনে জলধারা নেমে আসে গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র দিয়ে। অন্য মুনি বলেন, বৃত্র জলকে কারারুদ্ধ করে রাখে কালো মেঘে। ইন্দ্র তার উপর বজ্র হানেন, বিদ্যুৎ চমকায়, দামিনী ধমকায়, আর সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে বৃষ্টিধারা, নববরিষণ।

এই মুনিগণের মতবাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথও গেয়েছেন,—

দহনশয়নে তপ্তধরণী
পড়েছিল পিপাসার্তা।
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের
অমৃতবারির বার্তা।
মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ,
দিকে দিকে হল দীর্ণ
নব-অঙ্কুর জয়পতাকায়
ধরাতল সমাকীর্ণ
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর, হে গম্ভীর।

আমার মনে হয়, ইন্দ্রদেব তাঁর কর্ম এখনো করে যাচ্ছেন বৈদিক যুগে যে রকম করে গিয়েছিলেন। বেদের ঋষি সে যুগে তাঁর প্রশস্তি যে রকম ধারা গেয়েছিলেন, এ যুগে রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রশস্তি ঠিক সেই রকমই গেয়েছেন।

'বৃষ্টি হয়, বরফ গলে ও জল নামে, কিন্তু আমরা সেই জলের ব্যবহার করতে জানিনে।

মিশরে বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টি হয় সুদানে। কিন্তু মিশরীয়রা নাইল দিয়ে যে জল নেমে আসে, সেই জল নালা কেটে কেটে চতুর্দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে আপন জমি ভেজায়—মাঠে মাঠে ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ফসল ফলে ওঠে।

আমরা সেই কর্মটি করিনে। আমাদের নদী-নালা দিয়ে কি কিছু কম জল সাগরে গিয়ে পড়ে? আমরা কি সে জলের সদ্ব্যবহার করছি?

* * *

মুন্সীজী যে ব্যাকরণে ভুলটি করলেন, তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

তিনি সুসাহিত্যিক—গুজরাতিতে উত্তম উত্তম পুস্তক লিখেছেন, কিন্তু আমার বড় দুঃখ সেগুলো বাঙলাতে অনূদিত হয়নি।

ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস লেখাবার জন্যও মুন্সীজী ব্যাপক বন্দোবস্ত করেছেন।

আমার মনে হয়, মুন্সীজীর পক্ষে রাজনীতি বর্জন করাই ভালো।

সেক্সপীয়র বলিয়াছেন, "এই সত্য জানাইবার জন্য ভূতের কি প্রয়োজন ছিল, মহারাজ—" ডঃ শাখ্‌ট্ যে অতিশয় গুণী—লোককে সেকথা জানাইবার জন্য রায় পিথৌরারও প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আশ্চর্য হইলাম লোকটির অসাধারণ অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করিয়া উদয়াস্ত নানাপ্রকারের লোকের সঙ্গে নানাবিধ আলোচনার পর সামান্য মানুষ অপরাহ্নের দিকে তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় নির্জীব হইয়া পড়ে। তখন সে জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন শুনিতে পায় না, শুনিলেও বিষয়বস্তুটি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া সদুত্তর দিবার জন্য চেষ্টিত হয় না।

এবং আমরা যে কয়টি প্রাণী তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত হইয়াছিলাম, তাহাদিগের প্রত্যেককে অর্থনীতি ক্ষেত্রে অপোগণ্ড শিশু বলিলে কিছু মাত্র সত্যের অপলাপ হয় না। অথচ কী অদ্ভুত ধৈর্য ও মনোনিবেশ সহকারে আমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া লইয়া সোৎসাহে উত্তর দিতে লাগিলেন। কণ্ঠে বর্ণনামাত্র ক্লান্তি নাই, বচনভঙ্গীতে বিন্দুমাত্র ক্লৈব্য নাই।

এই বিশাল সংসারে অরসিক জনের অভাব নাই। তাঁহাদের একজন ডঃ শাখ্‌টের স্কন্ধে জর্মানির পুনরায় সশস্ত্রীকরণের দায়িত্ব চাপাইবার চেষ্টা করিলেন। ডাঃ শাখ্‌ট্ তাহার কি উত্তর দিলেন, সেই কথার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। যে বিরাট আট ভলুমে নুরেনবের্গ মোকদ্দমার দলিল দস্তাবেজ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই জ্ঞানী পাঠক সেই ব্যাপারের তাবৎ বর্ণনা পাইবেন।

আমার ইচ্ছা হইতেছিল হঠাৎ অট্টহাস্য করিবার। যে মার্কিন, করাসী, ইংরেজ রুশের প্রতিভূ শাণিত বুদ্ধি উকিলগণ শাখ্‌ট্‌কে নুরেনবের্গে কণামাত্র বিচলিত করিতে পারেন নাই, অবশ্যম্ভাবী আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ যুক্তি এবং অকাট্য প্রমাণ দ্বারা পদে পদে বিপক্ষকে নিদারুণ বিড়ম্বিত করিলেন, তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন, বামনের শশাঙ্ক-করতলকরণ ইত্যাদি যাবতীয় তুলনাকে হাস্যাস্পদ করিয়া ফেলে।

বুদ্ধিমানের সংখ্যা ইতরজনের তুলনায় কম হইলেও সেই সভাতে তাঁহাদের অনটন ছিল না। সহসা তাঁহারাই একজন উচ্চকণ্ঠে বলিলেন।

"শবব্যবচ্ছেদ কর্মে কি মোক্ষলাভ? ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ; তাহার সম্মুখে লক্ষ লক্ষ সমস্যা। বরঞ্চ যদি শাখ্‌ট্ মহাশয় সেই সব ব্যাপারে আমাদিগকে জ্ঞানদান করেন, তবেই আমাদের সার্থক উপকার হয়।"

সোল্লাসে সকলেই সম্মতি জানাইলাম।

পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল। শাখ্‌ট্‌ বলিলেন, "আমি পরিকল্পনাটি পড়িবার জন্য সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই। আগামীকল্য কাশ্মীরের পথে পাঠ করিবার বাসনা রাখি। কিন্তু কি প্রয়োজন এই সব বিশাল কলেবর পরিকল্পনা করিবার? তাহা হইতে অনেক শ্রেয়ঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ আরম্ভ করিয়া দিবার এবং আমার বিশ্বাস সেই সব কর্মই সর্বপ্রথম আরম্ভ করিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে বিপুল বিত্তের প্রয়োজন হয় না এবং যে স্থলে এক, দুই কিম্বা তিন বৎসরের ভিতরই ব্যয়িত অর্থ সুফল প্রদান করিয়া হস্তে পুনরাগমন করিতে থাকে। তাহাতে রাজকোষের অর্থ সঞ্চয় হইবে, সেই অর্থ তৎক্ষণাৎ অন্য কর্মে নিয়োজিত করিয়া দেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে। জনগণের মনে রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা দৃঢ়তর হইবে এবং এই পন্থাতেই আশু সুফল লাভের সম্ভাবনা।"

ভারতবর্ষে বহু বিত্ত সঞ্চিত আছে, সে কথা কাহারো অজ্ঞাত নয়। এই অর্থ প্রধানতঃ যুদ্ধের সময় উপার্জিত হয় ও বণিকগণ সে বিত্তের রাজকর বা ইন্‌কাম-ট্যাক্স দেন নাই বলিয়া এক্ষণে সে অর্থ কোনো প্রকারের পরিকল্পনায় নিয়োজিত করিতে পারিতেছেন না। রাষ্ট্র শ্যেন দৃষ্টিতে বিত্তশালীদের প্রতি কর্ম পর্যবেক্ষণ করিতেছে এবং আপন ন্যায্য রাজকর উদ্ধারের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়া বসিয়াছে এবং ধনিকগণও রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবার ভয়ে সেই অর্থ গোপন রাখিতেছেন।

ডঃ শাখ্‌টের বিশ্বাস, দেশের উন্নতির জন্য যখন এই অর্থের একান্ত প্রয়োজন এবং অন্য কোনো সূত্র হইতে কোনো প্রকারের অর্থ লাভের আশাও নাই, তখন অতীতে কে কোন্ উপায়ে বিত্তশালী হইয়াছে, তাহার আলোচনা না করিয়া এবং ধনিকগণকে লাভের প্রলোভন দেখাইয়া অর্থ বাহির করিয়া দেশ নির্মাণ কর্মে নিয়োজিত করাই ভারতের পক্ষে প্রশস্ততম পন্থা।

ডঃ শাখ্‌ট্‌ পুনঃ পুনঃ বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, যখন একথা স্থিরনিশ্চয় হইয়া গিয়াছে, যে দেশ নির্মাণ কর্ম আরম্ভ করিতেই হইবে, তখন আর এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর অর্থ কোথা হইতে আসিবে। যে কোনো কৌশলেই হউক অর্থ একত্র করিতে হইবে এবং কর্ম আরম্ভ করিয়া দিতেই হইবে।"

আমি ভাবিয়াছিলাম, ডঃ শাখ্‌ট্‌ অর্থনৈতিক পণ্ডিত; তাঁহার কণ্ঠে শুনিব শান্ত সমাহিত উপদেশ। বিস্মিত হইলাম যে, তিনি তাঁহার বক্তব্য অতিশয় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে প্রকাশ করিলেন এবং দেশ নির্মাণ সম্বন্ধে আপনার মতামত আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য শুধু যুক্তিতর্ক নয়, স্থির বিশ্বাসের গভীর অনুভূতিও নিয়োগ করিলেন। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম ভারতের প্রতি তাঁহার প্রেম

অকৃত্রিম ও তিনি আমাদের মঙ্গল কামনা করেন।

* * *

প্রায়ই দেখিতে পাই, ইংরেজ এবং মার্কিন এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমাদের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার বিজ্ঞাপন কিম্বা বরপক্ষের স্বগুণ কীর্তন লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা করুন, আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।

কিন্তু প্রশ্ন, তাঁহারা ভারতীয় বিজ্ঞাপনের দিকেই কটাক্ষ হানেন কেন?

সুইজারল্যাণ্ড হইতে জর্মন ভাষায় প্রকাশিত একখানি বিশ্ববিখ্যাত সাপ্তাহিকে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি পড়িলাম। আমার সঙ্কীর্ণ জ্ঞান এবং বুদ্ধি অনুযায়ী তাহার অনুবাদ নিবেদন করিলাম।

"আমি আমার এক ত্রিংশতি বর্ষীয়া সুন্দরী বান্ধবীর জন্য একজন জীবনসঙ্গী অনুসন্ধান করিতেছি। আমার আশা, সেই জীবনসঙ্গী যেন আমার বান্ধবীর পঞ্চ-বর্ষীয় পুত্রের স্নেহময় পিতার আসন গ্রহণ করেন। আমার বান্ধবী উত্তম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তন্বঙ্গী, ১৭৫ সেণ্টিমিটর দীর্ঘ (প্রায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি—অনুবাদক), ক্যাথলিক, গৃহকর্মে সুনিপুণা এবং বহু রমণীসুলভ মোহিনী গুণ ধরেন। উচ্চশিক্ষা ও দৃঢ় চরিত্রবল ছিল বলিয়া জীবনে বহু দুর্যোগ সত্ত্বেও তিনি তাঁহার রসবোধ হইতে বঞ্চিত হন নাই। পাঠক, তুমি যদি এই জাতীয় অমূল্য সম্পদের গুণগ্রাহী হও এবং প্রেমময়ী জীবনসঙ্গিনী আকাঙ্ক্ষা করো, তবে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত ফটোগ্রাফসহ নিম্নে উদ্ধৃত পোস্ট বক্সে পত্র লেখ। বিষয়টি গোপনীয়ভাবে আলোচিত হইবে বলিয়া উভয় পক্ষ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।"

বিস্তর মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়াও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলাম না, এই কাতর-রোদন এবং ভারতীয় অরক্ষণীয়ার মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য কোথায়? এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে, রমণী ভদ্রবংশোদ্ভবা, আমরা বলি মুখোপাধ্যায়, কুলীন, খড়দা মেল। এস্থলে বলা হইয়াছে, তিনি ক্যাথলিক, আমরা বলি তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কিম্বা কায়স্থ। গৃহকর্মে সুনিপুণার প্রতি লোভ হটেনটট্ হইতে প্যারিসের বিদগ্ধজন সকলেরই আছে এবং আমরা সুন্দরী বলিয়াই ক্ষান্ত দিই, এই স্থলে কিন্তু দৈর্ঘ্যের উল্লেখ পর্যন্ত রহিয়াছে। অবশ্য আমরা জীবনের ঝঞ্ঝাবার্তার বিষয় উল্লেখ করি না, কারণ আমাদের বিজ্ঞাপন সচরাচর বিধবা রমণীর জন্য নহে। সুতরাং পঞ্চবর্ষীয় পুত্রের উল্লেখও আমাদের পক্ষে অপ্রয়োজন।

শুধু তাই নয় বরপণ বস্তুটিও ইয়োরোপে অবিদিত নয়। নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখা যায়।—

"শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান যুবা বিবাহ ও বাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক। বিশ হাজার

ফ্রাঙ্কের প্রয়োজন।"

স্পষ্টই বুঝা গেল, এস্থলে অর্থ অনর্থ নয়। যে কুমারীকে যুবা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহার কুল-গোত্র রূপ-লাবণ্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক হইলেই হইল।

কিন্তু ইহাকেও পরাজিত করিতে পারে এমন বিজ্ঞাপনও দেখিয়াছি।—

"নিজস্ব বাড়ি আছে এমন রমণীকে একটি স্বাস্থ্যবান সুশিক্ষিত যুবক বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। বাড়ির ফটোগ্রাফ পাঠান।"

৮

বিবেচনা করি এই শীতকালেও বহু শত বাঙালী দিল্লী আসিবেন। যাঁহারা নিছক পারমিটের জন্য এখানে আসিবেন ভগবান তাঁহাদিগের মঙ্গল করুন। আমাদের সঙ্গে তাঁহাদিগের কোনো প্রকারের যোগাযোগের আশঙ্কা নাই।

কিন্তু যাঁহারা নিতান্ত মহানগরী দিল্লী দেখিবার জন্যই আগমন করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কদলী বিক্রয় করিবার দুষ্টবুদ্ধি যাঁহাদের নাই তাঁহাদের উদ্দেশ্যে দুই-একটি নিবেদন আছে।

প্রথমতঃ পাড়ার পাঁচজনের কাছে বড়াই করিবার জন্য অনর্থক পঞ্চাশটা কবর মসজিদ দুর্গ মন্দির দেখিয়া কোনো লাভ নাই। সবকিছু আখেরে ঘুলাইয়া যাইবে —লোদীদের বাগানে কুতুব মিনার চাপাইয়া বসিবেন, লালকিল্লার মাঝখানে শের শাহের মসজিদ দেখিয়া কি আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহার স্বপ্ন দেখিবেন, বিড়লা মন্দিরের সঙ্গে কুতুবের যোগমায়া মন্দির মিশাইয়া লইয়া অতিশয় অদ্ভুত স্থাপত্য নির্মাণ করিয়া বসিবেন। অতএব নিবেদন, অল্প দেখিবেন কিন্তু অতি উত্তমরূপে দেখিবেন। একটি ক্যামেরা—তা সে বক্স কিম্বা বেবিই হউক—সঙ্গে আনিবেন এবং যদিও ভালো ভালো দালান ইমারতের উত্তম উত্তম ফটো সর্বত্রই কিনিতে পাওয়া যায় তবুও আপন রুচি অনুযায়ী ছবি তোলাতে যে বিশেষ আনন্দ আছে, সেই তত্ত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

দ্বিতীয়তঃ ভারতের একখানা ইতিহাস সঙ্গে আনিবেন।

ভালো বায়োস্কোপ দেখিবার পর হৃদয়ে স্বতই বাসনা জাগে পুস্তকখানি পড়িবার। ঐতিহাসিক স্থাপত্য দর্শনের পর ঐ একই অভিলাষ জন্মে। যখন শুনিবেন, এই ত্রিপোলিয়া তোরণের উপরেই বাদশা ফররুখসিয়ার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জাহানদার শাহকে বন্দী করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন এবং আট বৎসর যাইতে না যাইতেই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সেই ফররুখসিয়ারকে অন্ধ করিয়া ঐ

ত্রিপোলিয়া তোরণের উপরেই বন্দী করেন ও পরে তাঁহাদের আদেশেই তিন নরপিশাচ তাঁহাকে ঠগীদের পদ্ধতিতে ফাঁসি লাগাইয়া খুন করে, তখন আপনার মনে কৌতূহলের সঞ্চার হইবে তাবৎ ইতিহাস আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন গাইড মাত্রই বিশুদ্ধ গল্পিকা না হউক কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জনের পক্ষপাতী। গাইড হিসাবে আমারও ন্যূনাধিক সে দুর্বলতা আছে; কিন্তু ইতিহাসের অত্যাচারে সেই দুর্বলতা সম্যক প্রস্ফুটিত হইবার অবকাশ পায় না।'

তৃতীয়তঃ স্থাপত্য দর্শন কর্ম আরম্ভ করার পূর্বেই স্মরণ রাখিবেন দিল্লীতে হিন্দু স্থাপত্যের বিশেষ কিছু নাই। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বিস্তর পরিশ্রম করিয়াও দিল্লীতে প্রাক. কুশান যুগের কোনো কিছু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। অতএব হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ জাতীয় কোনো বস্তু দেখিবার আশা পোষণ না করাই প্রশস্ততর।

একেবারে যে কিছুই নাই তাহাও নয়। কুতুবমিনারের কাছেই রাজা চন্দ্রের (এই চন্দ্রটি কে তাহা ঐতিহাসিকেরা এখনো বলিতে পারেন না) একটি মনোহর লৌহস্তম্ভ আছে; ফিরোজ তুগলুক নির্মিত ফিরোজ শাহ কোটলাতে একটি অশোক স্তম্ভ এবং উত্তর দিল্লীতে আর একটি; গিয়াসউদ্দীন তুগলুক নির্মিত তুগলুকাবাদের প্রায় ক্রোশ পরিমাণ দূরে সূর্যকুণ্ড (এই কুণ্ডটি সত্যই হিন্দু না মুসলমান সে বিষয়ে মুনিদের ভিতর এখনও মতভেদ আছে); এবং কুতুবমিনারের কাছে যে কুওওৎ উল-ইসলাম মসজিদ আছে তাহার স্তম্ভগুলি—এই স্তম্ভগুলি হিন্দু এবং বৌদ্ধ মন্দির হইতে নেওয়া হইয়াছিল এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* * *

সংবাদ শুনিলাম, যে স্থলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেই স্থলে রাষ্ট্রপতি বৌদ্ধ শাস্ত্র ও পালি ভাষার চর্চার নিমিত্ত এক প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে সেখানে নাকি তিব্বত, চীন, বর্মা, শ্যাম এবং সিংহলের ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইবে।

সংস্কৃতের কোনো উল্লেখ নাই!

হায়, আমি মূর্খ, আমার ধারণা ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বৌদ্ধ ধর্ম ও শাস্ত্র-চর্চা হইত তাহা মহাযান বৌদ্ধধর্মের এবং মহাযানের অধিকাংশ এবং হীনযানের বহুলাংশ শাস্ত্র পালিতে নয়, সংস্কৃতে লিখিত। আমি মূর্খ, আমি তো জানিতাম, হিউয়েং সাঙ এই মহাযান শাস্ত্রই সংস্কৃতের মাধ্যমে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আমি নিতান্ত জড়ভরত, আমি তো জানিতাম নালন্দাতে শিক্ষাদান প্রদানের মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। আমি অতিশয় নির্বোধ, আমার

কুসংস্কার ছিল সংস্কৃতের সাহায্য ভিন্ন বৌদ্ধধর্মের উচ্চতম বিকাশ, অর্থাৎ বৌদ্ধ-দর্শন ও তর্ক কণামাত্র আয়ত্ত করা যায় না।

কিন্তু সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। নবনির্মিত সংস্কৃত বিবর্জিত নালন্দার নব-বিদ্যায়তনের মোহমুদ্গর আমার মোহ চূর্ণ চূর্ণ করল, সদ্‌গুরুর ন্যায় অজ্ঞান তিমির অন্ধকারে জ্ঞানাঞ্জন শলাকার ন্যায় চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিল।

এখন শুনিব, গ্রীক ভাষা শিখা থাকিলেই ইয়োরোপীয়ন দর্শন করায়ত্ত হয়। ফরাসী জর্মন (কিম্বা কেবল মাত্র ইংরিজির মাধ্যমে) শিখিয়া দেকার্ত, কাণ্ট, হেগেল পড়িবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। প্লাতো, এরিসতেতেল অধ্যয়ন করা থাকিলেই তাবৎ ইয়োরোপীয় দর্শন হস্তলগত।

* * *

কোন রাজাকে নাকি এক বুদ্ধিমান বিশেষ একপ্রস্থ "পোশাক" নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল। সে পোশাক নাকি অসাধু জনের চক্ষুগোচর হইত না। রাজা একদিন সেই "পোশাক পরিধান" করিয়া শোভাযাত্রায় বাহির হইলে পাত্র অমাত্য অসাধুরূপে সন্দিহান হইবার ভয়ে করতালি ধ্বনি করতঃ "পোশাকের" ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

হঠাৎ একটি ক্ষুদ্র বালক চিৎকার করিয়া বলিল, "কিন্তু পোশাক কোথায়, মহারাজ তো কিছুই পরেন নাই।"

চীন হইতে প্রত্যাগত ভারতীয় অমাত্য ও অন্যান্য গুণীজন বারম্বার চিৎকার করিয়া বলিতেছেন চীন দেশ কম্যুনিস্ট নয়। ইঁহাদের কোনো অসাধু অভিসন্ধি নাই সে সম্বন্ধে আমি স্থিরনিশ্চয়, কিন্তু আমি প্রত্যাশা করিতেছি সেই বালকের। কখন না চিৎকার করিয়া বলে, "চীন তো কম্যুনিস্ট" এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হয়।

* * *

আমি এই তত্ত্বটি এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলাম না। ইংরেজ যখন বলে "জানো, লোকটি ভারতীয়, কিন্তু একদম আমাদের মত ; ভারতীয়দের সঙ্গে তাহার কোনো সামঞ্জস্য নাই" কিম্বা যখন কোনো বাঙালী বলে "জানো, লোকটা আসলে ছাতুখোর কিন্তু আচার ব্যবহারে ঠিক বাঙালীর মত," তখন আমি আশ্চর্য হই। "ছাতুখোর" ছাতুখোর থাকিয়াও কি বাঙালীর প্রশংসা অর্জন করিতে পারে না ?

অর্থাৎ চীনকে কম্যুনিস্টরূপে স্বীকার করিয়াও কি তাহার প্রশংসা করা যায় না কিম্বা তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় না ? তারস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতে হইবে

"চীন কম্যুনিস্ট নয়, সে আমাদেরই মত" তবেই বন্ধুত্ব সম্ভবে? এবং চীন কি আমাদের এই চিৎকার শুনিয়া উল্লসিত হইবে?

ইংরেজ যখন বলে "এই ভারতীয় মোটেই ভারতীয়ের মত নয়, একদম আমাদের মত" তখন কি আমরা উল্লাস বোধ করি?

*   *   *

মনু-নিষিদ্ধ পক্ষী ভক্ষণ করতঃ হিন্দু-সন্তান ইহলোক পরলোক নষ্ট করুক এ অভিসন্ধি আমি কিছুতেই করিতে পারি না; তৎপূর্বে যেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয়।

কিন্তু আমার বহু "পারসিক, মুসলমান, খৃষ্টানী" বন্ধু আছেন, তাঁহাদের কল্যাণার্থে নিবেদন করি তাঁহারা যদি কখনো দিল্লী আসেন তবে যেন একবার আফগানী নান (তন্দুরপক্ক রুটি বিশেষ) এবং "তন্দুরী মুর্গী" ভক্ষণ করিয়া 'দেহলী' বাস সার্থক করেন।

এই দুই বস্তু বস্তুতঃ গান্ধার দেশীয়—অর্থাৎ পেশাওয়ার হইতে কাবুল পর্যন্ত এই দুই বস্তু সানন্দে ভক্ষণ করা হয়। কিন্তু বিচলিত হইবেন না, ইহাদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্য পাঠান দন্ত কিম্বা উদরের প্রয়োজন নাই। ঈষৎ অবান্তর, তবুও নিবেদন করি পাঠানের দন্ত বাঙালী অপেক্ষা বহু নিকৃষ্ট। বড়ই কোমল জিনিস এবং তন্দুরের অভ্যন্তরে সুপক করা হয় বলিয়া সর্বাঙ্গসুন্দর মাধুর্য ধারণ করে। গান্ধার দেশে লঙ্কার প্রচলন সঙ্কীর্ণ বলিয়া তন্দুরীতে কোনো প্রকারের তীব্র আস্বাদ নাই।

একদা এই দুই বস্তু দেহলী প্রান্তে প্রচলিত ছিল না। দেশ বিভক্তির ফলে এক পেশাওয়ারী শিখ মহোদয় এই দুই মহাশয়কে দিল্লীতে প্রচলন করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন।

কিন্তু সাধু ভক্ষক, সাবধান। মস্তক কর্তন করিবার ভীতি প্রদর্শন করিলেও তন্দুরী ছুরি কাঁটা দিয়া খাইবে না। উভয় হস্ত সঞ্চালন দ্বারা তন্দুরীকে খণ্ড বিখণ্ড করতঃ সোল্লাসে সশব্দে হোটেল রেস্তরাঁ সচকিত করিয়া নির্লজ্জভাবে 'কড়কড়ায়েত মড়মড়ায়েত' করিবে। যদি সাহস না থাকে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়ো।

*   *   *

স্বর্গীয় পরিমল রায়ের শোকসন্তপ্ত বন্ধুবর্গ এই সংবাদ শুনিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইবেন।

ইউ এন ও রায়ের বিধবাকে সারাজীবনের জন্য মাসিক চারি শত টাকার ভাতা এবং তদুপরি রায়ের পুত্র ও কন্যার শিক্ষাব্যয় আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন!

ইউ. এন. ও'র জয় হউক।

এক ইংরেজ সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে বাষ্পাকুলকণ্ঠে অশ্রুমোচন করিয়া বলিল, 'হায়, হায়, কোটিপতি স্মিথ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।'

সখা সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তিনি কি আপনার নিকট-আত্মীয় ছিলেন ?'

প্রথম ইংরেজ বলিল, 'না, আমার দুঃখ তো সেই জন্যই।'

ডক্টর মুখোপাধ্যায় বাঙলা দেশের ছোট লাট হওয়াতে আমার শোক বহুলাংশে সেই জাতীয়ই। বরঞ্চ বলিব, অনেক বেশি; কারণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি বিলক্ষণ চিনিতাম কিন্তু হায়, তখন কি জানিতাম যে তিনি একদিন লাট সাহেবের গদিতে আরোহণ করিবেন! এই সরল শান্ত অমায়িক লোককে কি কখনো রাজ্যপালরূপে কল্পনা করিতে পারিয়াছি? তাহা হইলে কি তাঁহাকে এইরকম অবহেলা করিতাম? তিনি যখন সাদর আমন্ত্রণ করিয়া বলিতেন, 'আসুন, আসুন: বঙ্গদেশ হইতে কতিপয় সুপক্ক আম্র আগমন করিয়াছে; ভক্ষণ করিয়া আপনি তৃপ্ত হউন, আমিও আনন্দ লাভ করি', হায়, তখন জানিলে কি আমি ক্ষিপ্রগতিতে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতাম না, অতিশয় সবিনয় তাঁহার কুশল সন্দেশ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার চিত্তজয় করিবার জন্য সচেষ্ট হইতাম না? হায়, কী মূর্খ আমি, ধিক আমাকে!

কিন্তু প্রলাপ বকিতেছি। রে রসনে, তুমি সংযত হও।

আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। মুখোপাধ্যায় অসাধারণ সজ্জন ব্যক্তি। যদিস্যাৎ সাক্ষাৎ হয় তবে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে রসাল ভক্ষণে পুনরপি সাদর আমন্ত্রণ জানাইবেন।

সত্যই বলিতেছি, আমি ও আমার প্রতিবেশিগণ সকলেই মুখোপাধ্যায়ের রাজ্যপালত্ব প্রাপ্তিতে অবিমিশ্র উল্লাস উপভোগ করিয়াছি। একে অন্যকে আনন্দ অভিনন্দন জানাইয়াছি এবং বলিয়াছি, 'কলিকাতায় আর বাসস্থানের দুর্ভাবনা রহিল না।'

মুখোপাধ্যায় মহাশয় আজীবন আর্তসেবা, জ্ঞানসঞ্চার এবং সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন। ভগবানের সাহায্য ও গুরুজনের আশীর্বাদ তাঁহার উপরে নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু দৃষ্টতঃ সর্বপ্রকার সৎকর্ম তিনি স্বীয় পুরুষকারের দ্বারাই সম্পন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি যে পদমর্যাদা ও তৎসংযুক্ত রাজদণ্ড হস্তে পাইলেন তাহার সাহায্যে প্রচুরতর সৎকর্ম সাধন করিতে পারিবেন এমত আশা নিশ্চয়ই

দুরাশা নয়। আর যদি না করিতে পারেন তবে বুঝিব ফিরিঙ্গি-প্রবর্তিত এ পদ এখনও 'স্বদেশী' হয় নাই। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও যদি এ পদের রূপ পরিবর্তন না করিতে পারেন তবে আর কেহই পারিবে না।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিষ্ঠাবান খৃষ্টান, অগণিত মুসলমান তাঁহাকে অন্নদাতা বস্ত্রদাতা রূপে ভক্তি করে আর হিন্দু সমাজের তিনি স্বজন ছিলেন তো বটেই। তিন সম্প্রদায়ই মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সানন্দ অভিনন্দন জানাইবে।

মুখোপাধ্যায় দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ দেশের দশের মঙ্গল সাধন করুন।

শতং জীব, সহস্রং জীব।

* * *

শ্রীযুত কাটজুর বঙ্গত্যাগে বহু লোক তাঁহার অভাব অনুভব করিবেন। তিনি অমায়িক, নিরহঙ্কারী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ধীরে ধীরে বঙ্গভূমির প্রতি বিলক্ষণ অনুরক্তও হইয়াছিলেন।

দিল্লীবাসী বাঙালীরা শ্রীযুত কাটজুর দিল্লী আগমনে উল্লসিত হইলেন। ধর্ম জানেন, আজ বাঙালীর বেদনা বুঝিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারে কোনো 'মুরুব্বি' নাই। বঙ্গদেশাগত বাঙালী প্রয়োজনবশতঃ দিল্লীতে আগমন করিলে এক্ষণে অন্তত শ্রীযুত কাটজুর দ্বারস্থ হইতে পারিবে; দিল্লীবাসী বাঙালীও মনে মনে সে আশা পোষণ করে।

শ্রীযুত কাটজু নিশ্চয়ই তাহাদিগকে হতাশ করিবেন না।

* * *

সাংস্কৃতিক যোগসূত্র দৃঢ়তর এবং নবীন যোগসূত্র স্থাপনা করিবার জন্য কতিপয় চৈনিক বিদগ্ধ পুরুষরমণী মহানগরীতে পদার্পণ করিয়াছেন। ইঁহাদের শুভাগমনে সর্বসম্প্রদায়ের লোককে এক হইয়া ইঁহাদিগকে স্বাগত অভিবাদন জানাইতে দেখিলাম। কংগ্রেস সরকার যদিও প্রধান অতিথিসেবক, তবু দেখিতেছি কম্যুনিস্ট ভ্রাতাদের আনন্দোল্লাস কিছুমাত্র কম নহে এবং অন্যান্য শ্রেণীও বিস্মৃতির ভয়ে যত্র-তত্র ঘনঘন পদচারণা করিতেছেন।

চৈনিকমণ্ডলী উদয়াস্ত যেসব অভিনন্দন সভায় উপস্থিত হইতেছেন তাহার নির্ঘণ্ট দিতে গেলেই এ পত্রের অধিকাংশ ব্যয় হইয়া যাইবে। এই রবিবারেই দেখিতেছি তিনটি পর্বে এই অভাজনকেই উপস্থিত থাকিতে হইবে। অভিজাত প্রতিষ্ঠান "অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস্ এণ্ড ক্রাফটস্ সোসাইটি", ব্রাত্য "শিল্পীচক্র" ঐ দিন উহাদিগকে সম্মান দেখাইবেন ও সন্ধ্যায় চৈনিক রাজদূত বিদেশাগত বিদগ্ধ মণ্ডলী এবং দিল্লী নাগরিকদিগকে পানাহারে তৃপ্ত করিবেন। চৈনিকদের

অতিথিবাৎসল্য তাঁহাদিগকে কতদূর মুক্ত হস্ত করিতে পারে তাহার ভূরি ভূরি অভিজ্ঞতা আমার আছে—এই পর্বেও তাহার ব্যত্যয় হইবে না। তাহার বর্ণনা একদিন সুযোগ সুবিধা মত নিবেদন করিব।

বিদগ্ধমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করিবার সময় নানা মহাজন নানা জ্ঞানগর্ভ বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন; কিন্তু একটি বিষয়ের উল্লেখ কেহই করেন নাই বলিয়া অতিশয় সভয়ে তাহা নিবেদন করি।

সকলেই জানেন বৌদ্ধ শাস্ত্রের বহু মূল সংস্কৃত এবং পালি গ্রন্থ চিরতরে লোপ পাইয়াছে; কিন্তু এই সব গ্রন্থের চীনা (এবং তিব্বতীয়) অনুবাদ এখনও চীন দেশে পাওয়া যায়। এইসব গ্রন্থ পুনরায় ভারতীয় ভাষাতে (কিংবা ইংরাজিতে) অনুবাদ না করিলে বৌদ্ধধর্মের সর্বাঙ্গসুন্দর স্বরূপ আমাদের সম্মুখে বিকশিত হইবে না এবং এই সুবৃহৎ কর্ম ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানবিশেষের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

এই চৈনিক বিদগ্ধমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যদি ভারত সরকার এই সুবর্ণ সুযোগে একটা সুব্যবস্থা করিয়া লইতেন তবে আমরা উচ্চকণ্ঠে সাধুবাদ জানাইতাম।

যে দুইটি ভারতীয় উপর্যুক্ত বিষয়ে আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, কই, তাঁহাদের কাহাকেও তো এই উপলক্ষ্যে দিল্লীতে দেখিলাম না।

* * *

ইন্দ্রলুপ্তজন বিল্ববৃক্ষতলে একাধিক বার যায় না—ইহা আপ্তবাক্য।

ক্রিকেট খেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। আর যাইব না।

"রে রে পাষণ্ড" শব্দোচ্চারণ করিয়া উভয় পক্ষ যুদ্ধে অবতরণ করিলেন না। মল্লপক্ষদ্বয় একে অন্যকে ভীতনেত্রে পর্যবেক্ষণকরতঃ অতিশয় সন্তর্পণে ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। দর্শকমণ্ডলী ততোধিক সন্তর্পণে করতালিধ্বনি করিলেন। দশ মিনিট যাইতে না যাইতে যখন প্রথম মল্ল গতাসু হইলেন তখন যে হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল সে ধ্বনি "রক্তদুর্গ" মস্তকে থাকুন "দেহলি-তোরণ" পর্যন্ত পৌঁছিল না। ক্রীড়ারম্ভেই অন্যতম মল্লের পরলোকগমন যে কি গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিস্থিতি তাহা কি দর্শকমণ্ডলী সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন না? তবে কি মুহুর্মুহুঃ মল্লপতন না হইলে দর্শকজনমধ্যে আনন্দোল্লাসের সঞ্চার হয় না? বহ্বান্ন ভক্ষণই কি সুরুচির লক্ষণ? ভূমাতে সুখ তাহা জানি, কিন্তু অল্পেই বা কি কম? ঋষিবাক্য আছে, যাহা অল্প তাহাই মিষ্ট।

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী মহানগরী ত্যাগ করার পূর্বে বক্তৃতা-ভাষণে বিপুল শ্লেষ বর্ষণ করিয়া যান। প্রতি আমন্ত্রণে প্রত্যেকটি নিমন্ত্রণে তিনি সাতিশয়

প্রাঞ্জল ভাষায় সর্ববিধ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। তাহারই একটিতে তিনি জনগণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, 'হে দিল্লী যুবক সম্প্রদায়, যখনই দেখি তোমরা মাতা, কন্যা কিম্বা প্রিয়াকে দ্বিচক্রযানের পশ্চাদ্দেশে বসাইয়া তাঁহাদের ভার আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছ তখন আমি উল্লাস বোধ করি।'

মল্লভূমির তোরণপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলাম, অসংখ্য যুবক উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে বহু বালাকে আনয়ন করিলেন।

এই দৃশ্য কলিকাতায় বিরল।

এক ইংরাজই বলিয়াছেন, দ্বাবিংশাধিক লোমাবৃত মূর্খ (টুয়েনটি টু ফ্ল্যানেলড্ ফুলস) একটি চর্মাবৃত গোলক লইয়া জীবনমরণ পণ করিয়াছে দেখিবার জন্য আসে আরও বিংশতি সহস্র মূর্খ! ইহারই নামান্তর ক্রিকেট!

ভদ্রলোক ক্রিকেটের মূল তত্ত্বটাই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। রথদর্শন এস্থলে অবান্তর।

এই যে কপোত-কপোতী তরুণ-তরুণী নানা ভঙ্গী নানা অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে আপন আপন আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, তন্বঙ্গী কোমলাঙ্গীগণ অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অংশ—অধুনা উদরও অঙ্গ-স্বরূপ গণ্য করিতে হইবে—প্রদর্শনকরতঃ বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছেন, উচ্চ হাস্যে প্রতিবেশীর দৃষ্টি আকর্ষণকরতঃ তাহাদের চিত্তে ঔৎসুক্য লহরীর সঞ্চার করিতেছেন, তদ্বিনিময়ে তরুণগণ ক্রিকেট শাস্ত্রে তাঁহাদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন যেন এক স্বয়ম্বরসভায় আপন গুণস্বরূপ সালঙ্কার বর্ণনা করিতেছেন, ইহাই তো মুখ্য, ইহাই তো তত্ত্ব, এষাস্য পরমাগতি।

১০

ইউফ্রেতিস তাইগ্রীসের পারে আসিরিয় বাবিলনীয় সভ্যতা বেরোল, নীল নদের পারে মিশরীয়, পীতনদের পারে চৈনিক। গঙ্গাপারের আর্যসভ্যতা এদের চেয়ে কয়েক হাজার বছরের ছোট। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বহুকাল ধরে মনে মনে আশা পোষণ করেছিলেন যে গঙ্গা কিম্বা সিন্ধুর পারে হয়ত বা একদিন কোনো এক প্রাক্-আর্য এবং আসিরিয় বাবিলনীয় মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক ঐ জাতীয় প্রাচীন সভ্যতা বেরবে।

তাঁদের সে আশা পূর্ণ করলেন স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ব-জগৎ একদিন বিস্ময় মেনে শুনলো সিন্ধু নদের পারে মোন্-জো-দড়ো নামক স্থানে রাখালদাস এক প্রাক্-আর্যসভ্যতা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। এ সভ্যতা সম্বন্ধে এস্থলে সবিস্তর বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। শিক্ষিত ভারতীয় মাত্রই এ

সভ্যতার উৎপত্তি বিকাশ পতন সম্বন্ধে কিছু না কিছু খবর রাখেন।

গোড়ার দিকে পণ্ডিতেরা মনে করেছিলেন এ সভ্যতা কেবলমাত্র সিন্ধু পারে-পারেই বিকশিত হয়েছিল। তাই তাঁরা এর নামকরণ করেছিলেন 'সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা'। কিছু দিন পরে ক্রমে ক্রমে সে ভুল ভাঙল—দেখা গেল, এ সভ্যতা সিন্ধু পেরিয়ে এবং ছাড়িয়ে সুদূর অবধি বিস্তৃত ছিল।

তারই সন্ধানে অরেলস্টাইন ভাওয়ালপুর স্টেট (পাকিস্তান) ও তারই সীমান্তে বিকানীর রাজ্যে ১৯৪১ সনে খোঁড়াখুঁড়ি করেন। তার প্রতিবেদন অরেলস্টাইন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকরূপে বর্ণনা করেছেন—তার কিছুটা প্রকাশিত হয়েছে, কিছুটা পরে প্রকাশিত হবে।

নানা কথার ভিতর অরেলস্টাইন একথাও বলেন যে, ভাওয়ালপুর স্টেটের ফোর্ট আব্বাসের পূর্ব দিকে আর কোন জায়গায় মোন-জো-দড়ো সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়নি। অরেলস্টাইন এ মন্তব্যটি করেন ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে। আজকের ভাষায় বলা হবে, পাকিস্তানেই মোন-জো-দড়োর শেষ নিদর্শন পাওয়া যায়—পূর্বদিকে অর্থাৎ ভারতে পাওয়া যায় না।

কেন্দ্রীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের সহ অধ্যক্ষ শ্রীযুত অমলানন্দ ঘোষ এ বছরে শীতকালটা বিকানির স্টেটে খোঁড়াখুঁড়ি করে ফিরে এসেছেন।

তাঁর প্রধান কর্মস্থল ছিল সরস্বতী নদীর মধ্যভূমি—মনু এ ভূমিকে পুণ্য-ভূমি ব্রহ্মাবর্ত নামে উল্লেখ করেছেন। দৃষদ্বতীর উত্তরে এবং সরস্বতীর দক্ষিণে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র—মহাভারতকার বলেছেন, কুরুক্ষেত্রে বাস স্বর্গলোকে বাস করার ন্যায়।

শ্রীযুত অমলানন্দ ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় তাঁর অনুসন্ধানকর্ম সমাধান করেছেন তার সবিস্তর বর্ণনা খবরের কাগজের মারফতে পেশ করা কঠিন—এখন অসুবিধা এই যে তার জন্য ম্যাপের প্রয়োজন; মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে তিনি সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী দুই নদীর পারে পারে অনুসন্ধান করতে করতে তাদের সঙ্গমভূমি এবং তারও পশ্চিমে অনূপগড় পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। অনূপগড় থেকে প্রায় ছ'মাইল দূরে ভাওয়ালপুর রাজ্যের সীমানা। শ্রীযুত ঘোষ ভাওয়ালপুর যাননি। ভাওয়ালপুর যাওয়ার উপায় নেই,—সে জায়গা পাকিস্তানে সবাই জানে।

অরেলস্টাইনের মত গুণী বলে গেলেন এ তল্লাটে কিছু পাবে না—এমন কি শ্রীযুত ঘোষ যেসব জায়গা খুঁড়েছেন তারও দু'একটা স্টাইন খুঁড়ে নাকচ করে দিয়ে গিয়েছিলেন—আর তখন যদি ঘোষ সেখানে গিয়ে দুম করে হারাপ্পা মোন-জো-

দড়োর খোঁজ পান তখন ব্যাপারটা কি রকম হয় বলুন তো ?

এই বেলা পাঠককে একটু সাবধান করে দি।

যাঁরা মোন-জো-দড়ো সভ্যতা খুঁটিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরা জিজ্ঞেস করবেন, তবে কি ঘোষ মোন-জো-দড়ো সভ্যতার নরনারীর জাত-গোত্র ঠিক করে ফেলেছেন—তারা আর্য না দ্রবিড় না অন্য কোনো জাত—, তবে কি ঘোষ হারাপ্পা-লিপির পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন, তবে কি তিনি সপ্রমাণ করতে পেরেছেন যে, আর্য এবং হারাপ্পা সভ্যতাতে সঙ্ঘর্ষ বেধেছিল, তবে কি তিনি বলতে পারেন হারাপ্পা সভ্যতা হঠাৎ কর্পূরের মত উবে গেল কি প্রকারে ?

ঘোষ এসব প্রশ্নের একটারও উত্তর দেননি। তবুও আমি ঘোষের প্রত্নতাত্ত্বিকতায় এত উল্লাস বোধ করছি কেন ?

প্রথমতঃ, দৃঢ়নিশ্চয় সপ্রমাণ হয়ে গেল যে, মোন-জো-দড়ো হারাপ্পা সভ্যতা শুধু সিন্ধু দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পূর্ব দিকে উজিয়ে উজিয়ে বিকানির পেরিয়ে পূর্ব পাঞ্জাব অবধি এসে ঠেকেছিল অর্থাৎ আগে যে বলা হয়েছিল মোন-জো-দড়ো হারাপ্পা সভ্যতা গুটি কয়েক জায়গাতে (শহরে) সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। সপ্রমাণ হল বেলুচিস্তান থেকে পূর্ব পাঞ্জাব এই সাতশো মাইল এক বিরাট সভ্যতার লীলাভূমি ছিল এবং এই বিস্তৃতি সে যুগের পৃথিবীর যে কোনো সভ্যতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, এ সভ্যতা লোপ পাওয়ার পর এক দ্বিতীয় সভ্যতার সন্ধান ঘোষ পেয়েছেন। তার বৈশিষ্ট্য যে সে হারাপ্পার রঙ ও নক্সার হাঁড়ি কলসী বানায়নি—তার রঙ গ্রে (মেটে) এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এ সভ্যতা হারাপ্পার পরের সভ্যতা। এই মেটে সভ্যতার (গ্রে ওয়েসার) নরনারী কারা সে সম্বন্ধেও এখনো কিছু বলা যায় না, তাদের যুগনির্ণয়ও সুকঠিন, তবু মোটামুটি আন্দাজে বলা যেতে পারে যে, এদের সভ্যতার কেন্দ্রক্ষণ খৃঃ পূঃ ৬০০। তাহলে নীচের দিকে হয়ত মৌর্যদের সঙ্গে এদের পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু উপরের দিকে হারাপ্পার সঙ্গে এর সংযোগ হয়নি। কারণ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, হারাপ্পা সভ্যতা যেসব আবাসভূমি পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল (কিম্বা নৈসর্গিক কোনো কারণে নির্মূল হয়ে গিয়েছিল) সেগুলোতে এরা আপন বাসভূমি নির্মাণ করেনি। (মুসলমানরা রায় পিথৌরা, অর্থাৎ পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে তাঁরই রাজধানীতে আসন গেড়েছিল ; সাতশো বছর পরে আজও রায় পিথৌরার দুর্গের দেয়াল কুতুবমিনারের চতুর্দিকে দেখতে পাওয়া যায়।) তাই যাই হোক না কেন, এদেরই খেই ধরে ভবিষ্যতে মেলা আবিষ্কার হতে পারে সে বিষয়ে আমার মনে

কোনো সন্দেহ নেই।

তৃতীয়তঃ, যে আরেক সভ্যতার সন্ধান ঘোষ পেয়েছেন তার নাম দিয়েছেন, 'রঙ্গমহল' সভ্যতা, কারণ বিকানিরের আধুনিক রঙ্গমহল অঞ্চলে এ সভ্যতার বিস্তর উদাহরণ তিনি পেয়েছেন। 'রঙ্গমহল' মুসলমানী যুগের শব্দ—অর্থাৎ এ সভ্যতার অন্ততঃ হাজার বছর পরেকার, কিন্তু রঙ্গমহল জায়গাটি বিকানিরে সুপরিচিত বলে এ নামকরণ করা হয়েছে।

এ সভ্যতা মেটে সভ্যতার পরবর্তী এবং নিঃসন্দেহ কুশান যুগ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, —এমন কি গুপ্ত যুগ পর্যন্ত, কারণ গুপ্ত যুগের গান্ধার শিল্পের নিদর্শনও এতে রয়েছে।

এ তিন সভ্যতার নির্মাতা কারা, ঠিক ঠিক কোন্ যুগে এরা ভারতবর্ষে বসবাস করেছিল, একে অন্যের সঙ্গে এদের দ্বন্দ্ব হয়েছিল কিনা, এসব তত্ত্ব এবং তথ্য জোর গলায় আজ বলা অসম্ভব।

শ্রীঅমলানন্দ ঘোষ বিকানিরে যে অদ্ভুত অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসন্ধান করেছেন তাতে মেলা প্রশ্ন মাথা তুলেছে।

যেসব প্রশ্নের তিনি উত্তর দিয়েছেন সেগুলো পূর্বেই নিবেদন করেছি, কিন্তু নূতন প্রশ্ন উত্থাপন করাও প্রত্নতাত্ত্বিকের কর্ম। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, সুযোগ এবং সুবিধা পেলে—ঘোষ এখনো যুবক—তিনি অনেক কাজ করে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হবেন।

গত বৃহস্পতিবার আমাদের এক ঘরোয়া বৈঠকে ঘোষ আমাদের এ বাবদে বক্তৃতা দিয়ে তালিম দেন। সব জিনিস ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি বলে হয়ত ঘোষের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। ঘোষ সহৃদয় লোক, এ লেখা যদি তাঁর হাতে পৌঁছয় তিনি মাপ করে দেবেন এ আশা মনে পোষণ করি। আমার উদ্দেশ্য, গুণীরা যেন এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়ে শ্রীমান ঘোষকে উৎসাহিত করেন।

১১

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে মিস মেয়ো কিম্বা বেভারলি নিকলস্ যে উদ্দেশ্য আর যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এদেশে এসেছিলেন শ্রীমতী রজোভেণ্ট আদপেই সে রূপ নিয়ে আসেননি। ভারতবর্ষের ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্য নিয়ে তিনি যেমন কড়া কড়া কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেন না ঠিক তেমনি তিনি অকারণে অসময়ে আমাদের পিঠ চাপড়ে আমরা যে বড্ড সুবোধ ছেলে সে কথাও স্মরণ

করিয়ে দিতে চান না।

তাঁর দৃষ্টি আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে। আজকের দিনে আমেরিকারই অঢেল রেস্ত আছে; ভারতের উন্নতির জন্য এদেশীয় বহুলোক খাটবার জন্যও তৈরী আছেন। এ দুয়ে মিলে যে অনেক সৎকর্ম সমাধান হতে পারে সে বিষয়ে কারো মনে কোনো দ্বিধা নেই। শ্রীমতী রজোভেল্ট ঠিক এই জিনিসটিই মনে রেখে এ দেশে বহু পর্যবেক্ষণ করেছেন ও দিল্লীর তাবৎ সভা এবং পার্টিতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন—অতিশয় সহিষ্ণুতার সঙ্গে সর্ব প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিয়েছেন।

এদেশের অনেকেরই মনে ভয়,—শুধু কম্যুনিস্ট না, অন্য পাঁচজনেরও—আমরা যদি একবার মার্কিন টোপ গিলি তাহলে আর মার্কিন রাজনৈতিক বঁড়শি থেকে কস্মিনকালেও ছাড়া পাব না। এর উত্তরে প্রথম বক্তব্য ইংরিজি প্রবাদ, 'নো রিস্ক্, নো গেন' সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। দেশী প্রবাদের ভাষায় বলি, সাপ মারতে গেলে লাঠি ভাঙবেই ভাঙবে একথা হলফ করে বলা যায় না; মাঝে মাঝে নাও ভাঙতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ আমার বিশ্বাস পৃথিবীর বুদ্ধিমান জাত এখন আর ডাণ্ডা বুলিয়ে অন্য দেশের উপর রাজত্ব করতে চায় না। এখন সে চায় অর্থ নৈতিক রাজত্ব—অর্থাৎ পৃথিবীর আর পাঁচটা জাতের কাছে নিজের সুবিধেয় মাল বেচতে। তবে যদি বলেন, আমেরিকার কাছ থেকে রেস্ত নিলে আমরা তাদের অর্থ নৈতিক আওতায় এসে যাব তাহলে নিবেদন, রুশ ভিন্ন পৃথিবীতে আজ কোন্ জাত মার্কিনী আওতার বাইরে? এই যে মহামান্য ইংরেজ মহাপ্রভুরা দুনিয়ার সর্বত্র দাবড়ে বেড়ান তেনাদের অবস্থাটা কি? আজ যদি তাঁরা মার্কিনের সঙ্গে বড্ড বেশী তেড়িমেড়ি করেন তবে কাল কাক-কোকিল ডাকবার আগেই মাংসটা আণ্ডাটার দাম চড় চড় করে আসমানে চড়ে মগ ডালটার উপর বসে ঠ্যাং দুলাবে। বাজার করতে গিয়ে তার চরণের ধুলোটি স্পর্শ করা যাবে না।

তবে হাঁ, আলবৎ, স্বেচ্ছায় আমরা এ রকম অবস্থা বরণ করে নেব কেন?

আমার অন্ধ বিশ্বাস ভারত বিরাট দেশ তাই সে কারো ধামাধরা না হয়েও বেঁচে থাকতে পারবে। তার পূর্বে অবশ্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কৃষির সুব্যবস্থা করা। তার জন্যে প্রয়োজন জলের বাঁধ, বিজলীর আলো। আরো দরকার কৃষির জন্য উন্নত কলকব্জা, সার। এসবের জন্য উপস্থিত রেস্তর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, একবার তার কৃষি আপন পায়ে দাঁড়াতে পারলে তখন

আর কোনো ভাবনা থাকবে না।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, রায় পিথৌরা অতিশয় অমায়িক লোক। তিনি কারো কাছে অঋণী হয়ে মরতে চান না, তাই যদি এসব বাবদে রুশরা সাহায্য করতে চান, তবে তিনি তাদেরও সাহায্য নিয়ে রুশ জাতটাকে কৃতার্থম্মন্য করতে প্রস্তুত আছেন।

রুশের আওতায় পড়ে যাব? তার ভয় আরও কম। পূর্বে বলেছি, 'বুদ্ধিমান' জাত অন্য দেশের উপর রাজত্ব করতে চায় না। তাই ইন্দোচীনে ফ্রান্সের কাণ্ডকারখানা দেখে কি বলব ভেবে পাইনে।

গোড়ায় আমেরিকা ইন্দোচীনের ঝামেলায় নামতে চায়নি। ওদিকে ফ্রান্সের গাঁটে এত কড়ি নেই যে, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে একখানা আস্ত লড়াই চালাবার মত বিলাস উপভোগ করতে পারে। তাই ফরাসিসরা মেলা কায়দা-কেতা করে, মেলা নল চালিয়ে মার্কিনকে নামালে তার দ'য়ে।

ওদিকে মার্কিন নামা সত্ত্বেও রাধা-নাচের ন' মন তেল জ্বালাতে গিয়ে ফ্রান্সের আপন দেশে লাল বাতি জ্বলে আর কি। ফ্রান্সে এখন বহু বিচক্ষণ লোক দ'টা থেকে কোনো গতিকে বেরতে পারলে বাঁচেন কিন্তু হায় ইতোমধ্যে মার্কিন চটে গিয়ে বলছে, 'ইয়ার্কি পেয়েছ? আমাকে নামিয়ে দিয়ে এখন কেটে পড়তে চাও? সেটি হচ্ছে না—যে জল ঘোলা করেছ সেটা তোমাকেও খেতে হবে।' মার্কিনী ভাষায়, 'ইন ইয়োর ওন জুস'—আপন রসে সিদ্ধ হও।

ফ্রান্সের লোক বেহুলার ভাসান শোনে নি—তাহলে ইন্দোচীনের ঘাটের দিকে যেতো না—

'ও ঘাটে যেয়ো না বেউলো
বেউলো আমার মা
চাঁদের ব্যাটা দুশমন নখা
দেখলে ছাড়বে না।'

* * *

শ্রীযুত সুবিমল দত্ত ভারতের রাজদূত হয়ে জার্মানি যাচ্ছেন। উপস্থিত জার্মানির রাজধানী 'বন' শহরে—তাই বলে কেউ যেন না ভাবেন দত্ত মহাশয় বনবাসে চললেন।

বন জার্মানির সেরা সুন্দর শহর। সামনে রাইন নদী, পিছনে 'ভিনাস' পাহাড়, রাইনের ওপারে 'সীবেন গেবির্গে' বা 'সপ্ত পর্বত। চতুর্দিকে বাগান, চতুর্দিকে সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ি—শহরের ভিতরেও বিস্তর কাঁচা সবুজ পার্ক।

আর লোকগুলো ভারি চমৎকার। বন শহরটা জার্মানের সীমান্তে, বেলজিয়ামের গা ঘেঁষে। ফ্রান্সের সঙ্গেও তার বিস্তর দহরম মহরম। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর বিদেশী ছাত্র পড়াশোনা করে, ততোধিক টুরিস্ট বনে প্রতিবছর বেড়াতে আসে তাই বন-বাসিন্দা চিরকালই একটুখানি আন্তর্জাতিক বিশ্বনাগরিক প্রকৃতির—খাঁটি প্রাশানদের মত কুনো আর দাম্ভিক নয়।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ইংরেজের তাড়া খেয়ে খেয়ে বহু ভারতীয় শেষ আশ্রয় নিত জার্মানিতে। জার্মানরা কোনো কালেই ভারতীয়দের আশ্রয় দিতে কার্পণ্য করেনি। তাই যখন যুদ্ধের পর অনেক জাত কে কত ক্ষতিপূরণ পাবে তার আলোচনা করছিল তখন ভারতীয় সরকার স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন যে, জার্মানদের উপর আমাদের কোনো দাবী-দাওয়া নেই। যে সব ভারতীয়দের জার্মানির সঙ্গে কোনো প্রকারের যোগাযোগ ছিল তাঁরাই এ সংবাদ শুনে উল্লাস বোধ করেছিলেন।

যৌবনে বন শহরে রায় পিথোরা জার্মান সতীর্থদের সঙ্গে বসে স্বাধীন ভারতের সুখস্বপ্ন দেখতেন। সে সব সতীর্থেরা সংস্কৃত ও ভারতীয় ঐতিহ্যের আলোচনা করতেন বলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা হারালো কি করে। এবং তাই বোধ হয় তাঁরা জোর গলায় বার বার বলতেন, ভারতবর্ষ খুব শীঘ্রই পুনরায় তার স্বাধীনতা ফিরে পাবে। কিম্বা হয়ত আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বলতেন, কে জানে?

স্বাধীনতা লাভের পরই আমি এঁদের কাছ থেকে বহু আনন্দ অভিনন্দন পাই। একজন লিখলেন, 'তুমি তোমার ব্রিটিশ পাসপোর্ট দেখাতে সব সময়ই লজ্জা অনুভব করতে। এইবার ভারতীয় পাসপোর্ট বুকে ঝুলিয়ে সোজা জার্মানি চলে এস।'

ভারতের স্বাধীনতা লাভে এঁরা কতখানি উল্লাস বোধ করেছেন সে কথা আমি জানি, কিন্তু প্রকাশ করার মত ভাষার দখল আমার নেই।

দত্ত মহাশয়কে জার্মানরা সাদরে গ্রহণ করে নেবে সে-কথা আমি নিশ্চয় জানি, তার প্রধান কারণ দত্ত মহাশয় অতিশয় অনাড়ম্বর লোক। জার্মানির প্রতি তাঁর প্রীতি আছে—কিছুদিন পূর্বে ডাঃ শাখট যখন ভারতে আগমন করেন তখন উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছিল।

যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাঁরা বলতে পারবেন জার্মানির সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগসূত্রের ফলে আমাদের কি কি লাভ হবে। আমি বলতে চাই, তার চেয়েও আমাদের বেশী লাভ হবে যদি আমাদের মধ্যে বৈদগ্ধ্যগত আদান প্রদান

নিবিড়তর হয়। জার্মানিতে সর্বপ্রথম সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হয় বন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখনও সে চর্চা জোর এগিয়ে চলছে। বনের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র উত্তমরূপে স্থাপিত হলে এদেশে সংস্কৃত-চর্চা অনেকখানি উৎসাহ পাবে।

রাজদূতের মেলা কর্ম, অনেক ঝামেলা। কিন্তু দত্ত উচ্চশিক্ষিত লোক; তিনি কৃষ্টিগত যোগসূত্র স্থাপনে উৎসাহিত হবেন এ বিশ্বাস আমার আছে।

রুশদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি আছে।

একদা মিশনারীরা এদেশে অকাতরে বিনামূল্যে লক্ষ লক্ষ বাইবেল বিতরণ করেছিলেন। ফ্রী বলে সেগুলো লোকে পড়ত না। তখন মিশনারীরা বাইবেল বিতরণ একদম বন্ধ করে দিলেন। ফলে আজ যদি আপনি বাইবেল পড়তে চান, তবে গাঁট থেকে অন্ততঃ টাকা দশেক না খসালে একখানা ভালো বাইবেল পাবেন না। কাজেই অবস্থা পূর্ববৎ—বাইবেল এখনো কেউ পড়ে না।

রাশানরা দিল্লীর বাজারে ছেড়েছে এন্তার মার্কস, লেনিন, স্টালিন, লের্মেণ্টফ চেখফ, কিন্তু একদম ফ্রী নয়, আবার ন্যায্য মূল্য থেকে অনেক সস্তা। দেড় টাকায় লের্মেণ্টফ পেয়ে যাচ্ছেন—ভালো কাগজ উত্তম ছাপা। আপনাকে ঠেকায় কে? এবং যেহেতু কাঁচা পয়সা ফেলে তেল কিনেছেন তখন সে তেল আজ না হোক কাল মাখবেনই।

এ সব বইয়ের চাপে পড়ে মার্কিন মুল্লুকের সস্তা কেতাব ছাড়া ইংরিজি আর কোনো কেতাব আমার বাড়ির সামনের স্টলে পাওয়া যাচ্ছে না। স্টলওলা বললে, রাশায় ছাপা ইংরিজি বই বিক্রী করলে কমিশনও নাকি বেশী পাওয়া যায়।

আমার শুধু দুঃখ রাশানরা যত না মার্কস-এঙ্গেলস্ লেনিন-স্টালিন ছাড়ছে তার শতাংশের এক অংশও টলস্টয়, পুসকিন, দস্তায়ফ্স্কি, তুর্গেনিয়েফ দিচ্ছে না।

১২

ভূতনাথ এবং তস্য বন্ধু মদনগোপাল কি করিয়া যে গঞ্জিকাসক্ত হইল তাহার সঠিক সন্ধান মেলে না। পরোপকারার্থে তাহারা প্রায়ই নিমতলা, কেওড়াতলা গমনাগমন করে; হয়ত বা সেই উপলক্ষ্যে বন্ধুদ্বয় এই ধূম্রাত্মক রসে বিমজ্জিত হইয়াছিল।

গুরুজনরা এই সংবাদ শুনিয়া বিচলিত হইলেন। তাঁহারা ভূতনাথ ও মদনগোপালকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'ভদ্রসন্তানের একি আচরণ! আমরা বড়ই মর্মাহত হইয়াছি।'

ভূতনাথ মদনগোপাল অতিশয় নম্র স্বভাব ধারণ করে ; নতমস্তকে গুরুজনদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

কোনো প্রকারের আপত্তি অনুযোগ কিম্বা উচ্চবাচ্য করিল না বলিয়া গুরুজন-দের হৃদয় ঈষৎ দ্রবীভূত হইল। একজন বলিলেন, 'পালা-পার্বণে, অবরে-সবরে না হয় কিঞ্চিৎ সন্মার্গভ্রষ্ট হইলে ; কিন্তু নিত্য নিত্য—' এই মাত্র বলিয়া সহৃদয় গুরুজন তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

ভূতনাথ এবং মদনগোপাল ঐ পন্থাই অবলম্বন করিবে মৌনভাবে এই রকম একটা প্রতিশ্রুতি দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

গৃহের দেহলি প্রান্তে গোধূলি লগ্নে ভূতনাথ এবং মদনগোপাল নির্জীবের মত পড়িয়া আছে। গঞ্জিকালগ্ন গতপ্রায়—ধূম্ররস না পাইয়া উভয়ই অতিশয় বিরস বদন। কিন্তু উপায়ান্তরই বা কী ? গুরুজনকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে, পালাপার্বণ ব্যতীত গঞ্জিকারসে নিমজ্জিত হইবে না।

হঠাৎ রোদনধ্বনি শোনা গেল। মদনগোপাল তৎক্ষণাৎ সংবাদ নিতে প্রস্থান করিল। মুহূর্তেক মধ্যেই দ্রুতগতিতে প্রত্যাগমন করিয়া চিৎকার করিল, 'ওরে ভূতো, ঝপ্ করিয়া একটা চিলিম সাজো। চুনীর মাতা গত হইয়াছেন।'

ভগবান দয়াময়। পালা-পার্বণের সন্ধানে থাকিলে চুনীর মাতার মৃত্যুও পালারূপেই গণ্য করা যাইতে পারে।

রায় পিথৌরা ভূতনাথ গোত্রীয়।

হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান আমার সম্মুখে স্ব স্ব পালাপার্বণে আনন্দে নিমজ্জিত হইবেন এবং আমি "দাঁড়ায়ে বাহিরে দ্বারে মোরা নরনারী"র একজন হইয়া সেই রসস্রোতে নিমজ্জিত হইতে পারিব না, এই কুব্যবস্থার কল্পনামাত্র করিতেই অমি শিহরিয়া উঠি। তাহা হইলে আমি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অধিবাসী হইলাম কোন্ দুঃস্বপ্নে ? অস্মদ্দেশীয় মহাপুরুষগণ হিন্দুর মন্দিরদ্বার উন্মোচন করেন, ঈদোৎসবে মুসলমান সখাগণ দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েন, এই তাবৎ অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ সম্মুখে বিদ্যমান থাকিতে আমিই বা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের পালাপার্বণে নিজেকে কূপমণ্ডুকের ন্যায় সীমাবদ্ধ করিব !'

বড়দিন আসিল কিন্তু হায় কোথায় সেই ইংরেজ সম্প্রদায় যাঁহাদের প্রসাদাৎ গুরুভোজন এবং গুরুতর পানের সুব্যবস্থা হইত। খৃষ্ট জন্মদিনের পূর্ব সন্ধ্যায় দেহলি প্রান্তে তাই অতিশয় বিরস বদনে মনে মনে ইংরেজকে অভিসম্পাত দিতে-ছিলাম, "স্বরাজ প্রদান করিলে তো করিলে (সে তো অস্থিমজ্জায় বারম্বার অনুভব

করিতেছি) কিন্তু এই দেশ ত্যাগ না করিলে কি তোমাদের বাইবেল অশুদ্ধ হইয়া যাইত? অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টদিগকে খৃষ্টধর্মে বাপ্তিস্ম করিবার সর্ববাসনা কি তোমাদিগের চিরতরে লোপ পাইয়াছে।"

দেহলি প্রান্তে বিশ্বেশ্বর বলুন, কাবা বলুন, এখানকার চক্রবর্তী কনট (পাঞ্জাবী উচ্চারণ 'ক্লাট সার্কল') সার্কল। সুসজ্জিত বিপণিমণ্ডলী চক্রাকারে এক সুরম্য উদ্যানকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং অপূর্বদর্শন কামিনীগণ সুরম্য বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া এই আপন-চক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছেন। কোনো ললনা পাদুকা ক্রয় করিতে উপবেশন করিয়াছেন—রাতুল নখাগ্র ('চরণ' বর্বর-যুগে প্রচলিত ছিল) সম্প্রসারিত করিয়া মধুর কণ্ঠে কাম্য পাদুকার নখ-শির বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখের পাদুকা-স্তূপ হিমাচলকে অনায়াসে লজ্জা দিতে পারে, সেই গগনচুম্বী স্তূপের পশ্চাতে আপণ-স্বামী কিম্বা আপন স্বামী কাহাকেও আর দেখা যাইতেছে না। আহা কি মধুর দৃশ্য!

কোনো নাগরী কঞ্চুলিকার জন্য গলবস্ত্র হইয়াছেন—অর্থাৎ ময়ূরকণ্ঠী চীনাংশুক খণ্ড অমলধবল গলে জড়িত করিয়া পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন বর্ণসামঞ্জস্য শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত হইতেছে কি না। সখিগণ নানা প্রকারের সদুপদেশ দিতেছেন, পরমগুরু পতিদেব বস্ত্রমূল্য শ্রবণকরতঃ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, ক্ষীণ-কণ্ঠে প্রতিবাদকল্পে ওষ্ঠাধর উন্মোচন করিবার পূর্বেই নাগরীর নাসিকা স্ফীত হইতে লাগিল।

রায় পিথৌরা দ্রুতগতিতে বিপণি ত্যাগ করিলেন।

হায় খৃষ্ট জন্মোৎসব! বিপণি-আপণ প্রদর্শন করিয়াই আমার উৎসব সমাধান হইবে?

অকস্মাৎ স্কন্ধোপরি চপেটাঘাত। দেখি, পার্সী মিত্র, রুস্তম ভাই মিহুচিহর নাদির শাহ। "তুমি মোহময়ী (বোম্বাই) ত্যাগ করিয়া দেহলি প্রান্তে কেন?"

"কর্মোপলক্ষে।"

"উত্তম উত্তম।"

"খৃষ্ট জন্মোৎসব পালন করিতেছ না?"

দীর্ঘঃনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "খৃষ্টান বন্ধু কেহই নাই।"

নাদির শাহ স্কন্ধোপরি পুনরায় চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "এইমাত্র অনটন, তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ যে আমার পিতামহ জরথুস্ত্র ধর্ম ত্যাগকরতঃ খৃষ্টের স্মরণ লইয়াছিলেন। আইস বৎস, এই নির্বান্ধব পুরীতে কোনো ভোজন এবং পান-

শালাকে আমাদিগের পৃষ্ঠপোষকতা দান করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থম্মন্য করি।"

নাদির শাহ অতিশয় গুণী ব্যক্তি। ভোজনগৃহে প্রবেশকরতঃ সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিল, "শিশির ঋতুতে ব্র্যাণ্ডীই প্রশস্ত। তৎপর অন্য বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।"

আমি বলিলাম, "আমার দুর্বলতা আহারাদির প্রতি।"

নাদির শাহ বলিল, "ভ্রাতঃ, আমার মাতামহী বিশুদ্ধ ইরানবাসিনী, বাল্যকাল হইতে আমি ইরানী খাদ্য ভূরি ভূরি আহার করিয়াছি। প্রথম যৌবন দিল্লীতে কর্তন করি—মোগলাই খাদ্য আমার অপরিচিত নহে। গৃহিণী ফরাসিনী; অতএব ভ্রাতঃ, বিবেচনা করো এই সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা কিছু বেশী।"

প্রথম আসিল ফরাসিস পদ্ধতিতে অরদ্যভ্র্ (hors-d'oeuvre)। নানা অংশে বিভক্ত যে বিরাট থুঞ্চা আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাতে অন্ততঃ দশাধিক রকমের খাদ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জর্মন (ফ্রাঙ্কফুর্টার) সসিজ, ভর্জিত এবং অভর্জিত বেকন এবং হ্যাম, জলপাই তৈলসিক্ত টোস্টাসীন রৌপ্যবর্ণের সার্দিন মৎস্য, অতিশয় নমনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমলেট খণ্ড, সিরকা-নিমজ্জিত পলাণ্ডু-ত্রপুষী-কোষাম্র (প্যাজ-কাঁকুড়-জলপাই), রুশদেশ হইতে সদ্যাগত 'কাভিয়ার' বা মৎস্য-ডিম্বের স্যাণ্ডউইচ, সেই রুশ পদ্ধতিতে মাইয়নেজ মধ্যে সুপক্ব কুক্কুট-ডিম্ব। অন্য খাদ্যবস্তুগুলির গোত্রবর্ণ অনুমান করিতে পারিলাম না।

নাদির শাহ বলিল, "ক্ষুধাকে তীক্ষ্ণতর করিবার উপাদান। স্পর্শ করিবে মাত্র —অনাহারের জন্য ব্যাপকতর ব্যবস্থা।"

ধন্য নাদির শাহ।

বলিল, "সুপ খাইলে অনর্থক উদর পূর্ণ হইয়া যায়। অতএব সুপ সর্বথা বর্জনীয়। ডাচেস অব উইনজার নিমন্ত্রণে কদাচ সুপ পরিবেশন করেন না। অতএব এক্ষণে আসিবে তন্দুর-মৎস্য।"

আমি বললাম, "তন্দুর-মুর্গী খাইয়াছি কিন্তু তন্দুর-মৎস্য?"

অর্থাৎ তন্দুরে প্রস্তুত মৎস্য—ওভেন-বেকড্ ফিশ।

সে মৎস্য দেখিয়া মনে হইল অপক্ব বস্তু। যেন মৃত মৎস্য খাইতে দিয়াছে। অথচ স্পর্শ করিবামাত্রই তিনি নমনীয় কমনীয় খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইলেন। তন্দুরের উষ্ণতা চতুর্দিক হইতে সমভাবে মৎস্যের সংলগ্ন হইয়াছে বলিয়া তিনি অপূর্ব রসনাভিরাম রসবস্তু হইতে সক্ষম হইয়াছেন।

নাদির শাহ আদেশ দিল, "ইহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভিয়েনীজ ক্রোয়াসাঁ ভক্ষণ করো।"

তুর্করা যখন ভিয়েনার নগরদ্বারে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয় তখন সেই ঘটনার স্মরণার্থে ভিয়েনা-বাসীরা অর্ধচন্দ্রের (ক্রোয়াসঁ-ক্রিসেণ্ট) আকারে এক কোমল অথচ মর্মরিত রুটি নির্মাণ করে। অতিশয় উপাদেয় লঘু খাদ্য।

অতঃপর তন্দুরী মুর্গী এবং আফগানী নান-রুটি। তাহার বর্ণনা আমার সুরসিক পাঠকদিগকে পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি।

নাদির শাহ একার্ধাধিক নিষিদ্ধ পক্ষী ভক্ষণকরতঃ বলিল, "এইবারে সত্য আহার আরম্ভ হউক।" ওয়েটারকে বলিল, "মটর-কোপ্তা-বিরয়ানী, আলু-মটরশুঁটি মুর্গী কারি, কিঞ্চিৎ কোপ্তা নরগিস্ (কলিকাতার ডেভিল) এবং অত্যল্প শূল্যপক্ক মিশরী কাবাব (কলিকাতার শিক কাবাব)। আর দেখো, মুর্গী-কারিতে যদি যথেষ্ট ঝোল না থাকে তবে এক পাত্র রৌগন-জুশ এবং কিঞ্চিৎ ক্রীম-লেটিস্ সালাড্। উপস্থিত (এবং এই শব্দটি নাদির যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করিল) ইহাই যথেষ্ট।"

আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলিতে পারো, মূর্খেরা সালাড্ কেন জলপাই (অলিভ) তৈল দিয়া প্রস্তুত করে ? সেই তৈলে না আছে গন্ধ না আছে কোনো প্রকারের তীব্রতা। সালাডের পক্ষে বঙ্গদেশে প্রচলিত সরিষার তৈলই প্রশস্ততম। তুমি এক কাজ করো। কিঞ্চিৎ মাস্টার্ড জলে তরল করতঃ সালাডের সঙ্গে সংমিশ্রণ করিয়া দাও।"

ধন্য ধন্য নাদির শাহ ; তুমি বঙ্গভূমিতে পদার্পণ না করিয়াও কি প্রকারে অবগত হইলে আমরা স্ফীততণ্ডুল সরিষার তৈল সহযোগে ভক্ষণ করি।

আহারে ক্ষান্ত দিয়া নাদির বলিল, "ইহারা ঘৃতসিক্ত উত্তম পরোটা নির্মাণ করিতে জানে না। নতুবা পোলাও-কারির অন্তরালে মধ্যে মধ্যে সেই বস্তুর চর্বণ রসনাকে বহ্বান্ন ভক্ষণে উৎসাহিত করে।"

অতঃপর নাদির শাহ বলিল, "মিষ্টান্ন সম্বন্ধে অহেতুক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়ো না। আমি তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছি।"

রসগোল্লা লেডিকিনি এবং সন্দেশ !!

নাদির বলিল, "শুনিয়াছি, কলিকাতার তুলনায় নিকৃষ্ট। তুমি অপরাধ নিয়ো না।"

ধন্য নাদির। নাদির ভারত জয় করিয়াছিল ; তুমি খাদ্যব্রহ্মাণ্ড জয় করিয়াছ।

আশা করি, এই খাদ্যনির্ঘণ্ট দেহলি প্রান্তাগত বঙ্গবাসী স্মরণ রাখিবেন। আমাকেও।

ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু বহু পুস্তক এদেশে লোপ পেয়েছে, কিন্তু অনুবাদ তিব্বত, চীন, মধ্য এশিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং পূর্ব তুর্কিস্থানের নানা ভাষাতে এখনো পাওয়া যায়। শুধু বৌদ্ধ মঠেই যে এদের সন্ধান মেলে তা নয়, মধ্য এশিয়ার বালির নীচ থেকেও এসব অনুবাদের বই এখন বেরচ্ছে।

ভারতবর্ষীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ এবং তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নির্মাণের জন্য এসব অনুবাদ গ্রন্থ অবর্জনীয়। কিন্তু প্রশ্ন এই বিরাট কর্মভার গ্রহণ করতে যাবে কে ?

কিছুকাল পূর্বে নাগপুরে শ্রীযুক্ত রঘুবীর ভারতীয় সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক পরিষদ ('ইণ্টারন্যাশনাল একাডেমি অব্ ইণ্ডিয়ান কালচার') প্রতিষ্ঠা করেন। এ-পরিষদের কাজ যাতে করে দেশ-বিদেশের গুণী-জ্ঞানীদের সাহায্যে ভালো করে গড়ে ওঠে, তার জন্য পরিষদ জাপান, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, সিংহল, ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, ইতালি, জর্মনি, ইংলেণ্ড, হল্যাণ্ড এবং যুক্তরাজ্যের পণ্ডিতদের সহায়তা চেয়ে আহ্বান জানান এবং ইতিমধ্যেই সহৃদয় উত্তর পেয়েছেন।

দিল্লীতে এসে শ্রীযুক্ত রঘুবীর বললেন, পশ্চিম জর্মনির মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত নোবেল মহাযান বৌদ্ধধর্মের 'সুবর্ণ প্রভাসসূত্র' পুস্তকখানা সর্বপ্রথম প্রকাশ করবেন। পরিষদ ক্রমশঃ কি কি পুস্তক বের করবেন তার একটি খসড়াও অধ্যাপক নোবেল তৈরী করেছেন।

এ অতি উত্তম প্রস্তাব কোনো সন্দেহ নেই। ভারতের বৈদগ্ধ্যগত ইতিহাসের প্রতি যাঁরই কণামাত্র মমতা আছে, তিনিই এ কর্মে সহায়তা করবেন এ বিশ্বাস আমাদের মনে আছে। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, একমাত্র ভারতীয় পণ্ডিতেরাই যদি একাজে সহায়তা করেন, তা হলেই অল্পদিনের ভিতর বিস্তর উন্নতি দেখানো সম্ভবপর হবে।

এ কাজের জন্য টাকা কোথা থেকে আসবে সে প্রশ্ন অবান্তর।

এ কাজ যখন সম্পূর্ণ করতেই হবে, তখন টাকাও যোগাড় করতেই হবে।

কিন্তু প্রধান প্রশ্ন এসব বই পড়বে কে ?

সংস্কৃত ভাষার (পালি ও প্রাকৃতের কথা থাক) চর্চা বাঙ্গলা দেশে এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেকথা যাঁরা 'আনন্দবাজারে' 'চিঠিপত্রে জনমত' পড়ে থাকেন তাঁরাই জানেন। কেউ কেউ ইস্কুল-কলেজে সংস্কৃত চর্চার জন্য যে 'ব্যবস্থা'

করতে চান, সেটা বাচ্চাকে ক্রমে ক্রমে মায়ের দুধ ছাড়ানোর মতনই। অন্তেরা বাচ্চাটাকে বাকি জীবন আধমরার মত করে রাখতে চান। যাঁরা ভাল করে সংস্কৃত পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে চান, তাঁরা যেন কষ্কে পাচ্ছেন না বলে মনে হচ্ছে। বাঙ্গলার বাইরেও অবস্থা প্রায় একই। টোল-পাঠশালা বাঁচিয়ে রাখবার জন্য পণ্ডিতদের দুমুঠো অন্ন দেবার প্রস্তাব কেউ করেছেন বলে জানিনে।

শেষটায় কি হবে বলা শক্ত তবে আশা করি, পাঠক আমার উপর চটে যাবেন না, যদি নিবেদন করি যে, এ দেশে সংস্কৃতচর্চা ব্যাপকভাবে হওয়ার আশা দুরাশা। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ, যেখানে ক্লাসিক্‌স্ পড়ানোর জন্য গণ্ডা গণ্ডা জলপানি রয়েছে, সেখানেই যখন বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতির মোহে পড়ে ছাত্রেরা ক্লাসিক্‌স্ বর্জন করেছে, তখন এ গরীব দেশ সংস্কৃতের জন্য কাকে কি প্রলোভন দেখাতে পারে?

অথচ স্বরাজ পাওয়ার পরও ভারতীয় তরুণ যদি আপন সংস্কৃতি চর্চা না করে, তবে সে এদেশে গড়ে তুলবে কি বস্তু? জলের বাঁধ, বিজলীর প্রসার, কারখানার ছয়লাপ করে করেই তো একটা জাত বেঁচে থাকতে পারে না। আত্মার ক্ষুধাও তো রয়েছে,—আজ না হয় পেটের ক্ষুধায় সেটাকে অস্বীকার কিম্বা অবহেলা করে যাচ্ছি।

অতএব আমি মনে করি, ভারতীয় সংস্কৃতি সহজবোধ্য করে তুলতে হবে।

অর্থাৎ তিব্বতী চীনা থেকে যে সব বই অনুবাদ করা হবে, সেগুলো যেন হিন্দী, বাঙ্গলা ইত্যাদি ভাষাতে সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করার ব্যবস্থা করা হয়। ইংরিজিতে অনুবাদ না করলেও ক্ষতি নেই—আজকের দিনের ছেলে-ছোকরারা যখন দাশগুপ্তের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস ইংরিজিতে পড়ে না, কিম্বা পড়তে পারে না, তখন আর চীনা বইয়ের ইংরিজি অনুবাদ করে কি লাভ?

আমার মত পাঁচজন বুড়ো মাথা চাপড়ে হয়ত জিজ্ঞেস করবেন, 'আমাদের এ অবস্থা হল কেন? সংস্কৃত কি তবে এদেশ থেকে লোপ পেয়ে যাবে?' উত্তরে বলি, কালধর্ম।

১৪

এই খোলা মাঠের 'সিনেমা' বানাতে আমাদের এতদিন লাগল কেন? ইয়োরোপে ঠাণ্ডা, কুয়াশা, গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা হতে হতে দশটা বেজে যায়—তাও ভালো করে অন্ধকার হয় না। সেখানে আকাশের তলায় সিনেমা বানানোর কথাই ওঠে না। আবার কাইরো শহরে বছরে আড়াই ইঞ্চি বৃষ্টি হয় কি না হয়, কুয়াশা সেখানে অজানা, আবহাওয়া না-গরম-না-ঠাণ্ডা, সেখানে তাই খোলা

সিনেমার খোলতাই। দিল্লী এ দুটোর মধ্যিখানে, বরঞ্চ বলব কাইরোর গা ঘেঁষে, তবু খোলা সিনেমা খোলা হল মাত্র গত সপ্তাহে।

ব্যবস্থা কিন্তু উত্তমই হয়েছে। যে জায়গাটি বেছে নেওয়া হয়েছে, সেটিও পুরানা দিল্লী আর নয়াদিল্লীর মাঝখানে—ফিরোজ শাহ কোটলার পিঠে পিঠ লাগিয়ে। সিনেমার পর্দাখানা বানানো হয়েছে মামুলী পর্দার ডবল সাইজে—বেশ শক্ত করে বাঁধা হয়েছে, যাতে করে হাওয়ায় না দোলে, তবে চতুর্দিকে কালো বর্ডার লাগানো হয়নি বলে চোখ অস্বস্তি অস্বস্তি বোধ করে।

বিরাট ব্যবস্থা, তাই টিকিটের জন্য মারামারি কাটাকাটি করতে হয় না। ভিতরে গিয়ে যে কোনো এক কোণে আপন আসন বেছে নিয়ে দিব্য বায়স্কোপ দেখা যায়, কেউ এসে ধাক্কা লাগায় না, মশাই আমার সীটে বসেছেন যে মাইরি, সিগারেটের ধুঁয়োর উৎপাত নেই, মোলায়েম ঠাণ্ডায় অনায়াসে দু'দণ্ড ঘুমিয়ে নেওয়া যায়।

এখনো অবশ্য তাবৎ ব্যবস্থা কাইরোর মত সর্বাঙ্গসুন্দর হয়নি। সেখানে ভালো টিকিট কাটলে একখানি ছোট টেবিল পাওয়া যায়, পছন্দমত কটলিস-সসেজ, কবাব-কোপ্তা খেয়ে খেয়ে ইয়ার-বক্সীদের সঙ্গে গুষ্টিসুখ অনুভব করতে করতে বায়স্কোপ দেখা যায়।

হবে, হবে, সেও হবে।

এক নরওয়েবাসী তার বন্ধুকে বললে, 'এই গরমিকালে আফ্রিকায় বেড়াতে যাচ্ছি।'

বন্ধু তাজ্জব মেনে বলেন, 'গরমিকালটাই বাছলে! সেখানে যে ও সময়ে 'শেড-টেম্পারেচার' ১১২ ডিগ্রী।'

প্রথম বন্ধু ভুরু কুঁচকে বললে, 'তা আমাকে ছায়ায় বসতে বাধ্য করবে কে?'

'ওপন্ এ্যার সিনেমা'তেও তাই। টিকিটের দাম যখন কুল্লে এক টাকা, তখন ছবি ভালো'না লাগলে সেখানে আপনাকে বসতে বাধ্য করবে কে?'

বিশ্বাস করবেন না এই ক'দিনে ন'খানা ছবি দেখেছি। বাঙলায় যাকে বলেন গোগ্রাসে গোস্ত গিলেছি। এখনো ঢেকুর উঠছে।

দু'একখানার পরিচয় ইতিমধ্যেই 'আনন্দবাজার' এবং 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে' নিবেদন করেছি। যেগুলো দেখেছি তার মধ্যে 'মিরাক্‌ল্ ইন্ মিলান' সব চেয়ে উত্তম, আর যেসব ছবি দেখার সুযোগ হয়নি, তার মধ্যে গুণীদের মতে, 'বাই-সাইক্‌ল্ থিফ' 'ইউকিওয়ারিস্‌মু' নাকি একেবারে রঙের টেক্কা।

*　　　　　*　　　　　*

মিশরী ছবি ছিল 'ইব্‌ন্ উন্-নীল' (অর্থাৎ নীলনদসন্তান)। এ ছবি দেখে সত্যি মনে হয়, একদম ভারতীয় ছবি, শুধু 'তারকারা' কুর্তা-পাজামা, ধুতি-পাঞ্জাবি না পরে আলখাল্লা আর জাব্বাজোব্বা পরেছে। নায়িকা ভিরমি গিয়েছেন, তাঁর মাথা রেল লাইনের উপরে পড়ে আছে, দূর থেকে পাঞ্জাব মেল (থুড়ি, আলেক-জেণ্ড্রিয়া মেল) গুম গুম করে ছুটে আসছে, নায়ক তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন—এই গেল এই গেল অবস্থায় শেষ মুহূর্তে নায়িকার উদ্ধার।

ফারাক এইটুকু, বাঙলা ছবিতে তখন ডুয়েট গান আরম্ভ হয়ে যায়, 'কেন গো বাঁচালে মোরে—নিঠুর বঁধুয়া', এখানে তা হয়নি। (চীনা ছবি 'হোয়াইট হেয়ার্ড গার্ল' কিন্তু গান বাবদে বাঙলা ছবিকেও ছক্কা-পাঞ্জা-বোম্ দিতে পারে)।

'নীলনদসন্তান' নিরেস ছবি বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। এ ছবি উন্নাসিকের (অর্থাৎ আপনার আমার) জন্য বানানো হয়নি। সদর এবং মহকুমা সহরে এ ছবি বিস্তর কদর পাবে। তাই আমি 'হণ্টরওয়ালী', 'মিস্ ফ্রণ্টিয়ার মেল', 'ডাকু কী দিলরুয়া', 'জাম্বু কা বেটা'র নিন্দেও কস্মিনকালে করিনি।

'বুদ্ধের জীবনী' জাপানী ছবি। অতি নবীন কায়দায় কার্টুন দিয়ে সিলুয়েট্ দিয়ে ছবিখানা তৈরী। তাও আবার স্টিলিসাইজড,—তাই ভারতীয় নারকোল অশথ গাছ ঠিক ওৎরালো কিনা, তাই নিয়ে কোনো শিরঃপীড়া হয় না। সঙ্গীত অত্যুত্তম, সব কিছু নিয়ে ছবিখানা সত্যই উপাদেয়।

*　　　　　*　　　　　*

বুদ্ধের জীবনের সব চেয়ে যে জিনিস চীনা জাপানীদের আকৃষ্ট করে, সে হচ্ছে 'মারের বিভীষিকা এবং প্রলোভন!' চীন দেশের গুহাতে বুদ্ধ-জীবনীর এ অধ্যায়টি বিস্তর রং ফলিয়ে বহু প্রকারে আঁকা হয়েছে। জাপানী 'বুদ্ধের জীবনী' ছবিতেও দর্শক 'মারপর্ব' অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পাবেন।' সেখানে নাচগানও চমৎকার।

আমাদের বিশ্বাস কার্টুনে ছবি বানালে ডিস্‌নিকে নকল না করে উপায় নেই। ফরাসী ছবি 'সাহসী জন' দেখে সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। যেখানেই 'চিত্রকার' নূতন কিছু করতে গিয়েছেন, সেখানেই তিনি মার খেয়েছেন বেধড়ক, আর যেখানে ডিস্‌নিকে নকল করেছেন, সেখানে তিনি পানসে—নকল করলে যা হয়।

'বুদ্ধের জীবনী' ডিস্‌নিকে নকল না করে সার্থক সৃষ্টি।

'মিসেস ডেরি' সম্বন্ধে 'হিন্দুস্থানে' আলোচনা করেছি। ভাষা এবং তার চতুর্দিকে গড়ে ওঠা বৈদগ্ধ্য যে জোর করে কোনো জাতের ঘাড়ে চাপানো যায় না, তার অত্যুত্তম প্রমাণ পাওয়া যায় 'মিস ডেরিতে'। গান, অভিনয়, সব কিছুই এ ছবিতে ভালো হয়েছে।

* * *

আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে 'মিরাকল ইন মিলান'। অলৌকিক ঘটনা নিয়ে যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ এ ছবিতে করা হয়েছে, সেটি ধরা পড়ে শেষমুহূর্তে। এ ছবি দেখলে 'বিরিঞ্চি বাবাদের' প্রতি ভক্তি একটুখানি কমতে পারে।

* * *

জনৈক লেখক এক খ্যাতনামা কাগজে রবীন্দ্রনাথ যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, ঔপন্যাসিক এবং দার্শনিক সে কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। লেখক স্বীকার করেছেন, তিনি বাঙলায় রবীন্দ্রনাথ পড়েননি।

বিভারলি নিকল্‌স্‌ও এই ধরনের বই লিখেছিল। মিস মেয়োর কথা আর বললুম না, কারণ দু-একজনকে বলতে শুনেছি, মেয়োর উদ্দেশ্য হয়ত খারাপ ছিল না কিন্তু রবীন্দ্র-সমালোচকটার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁদের মনে প্রচুর সন্দেহ রয়ে গিয়েছে।

নিক্‌ল্‌সের বই যখন হুশ হুশ করে বিক্রী হচ্ছে তখন খ্যাতনামা প্রকাশক আমাকে বইখানার উত্তর লিখতে অনুরোধ করেন। বেশ দু পয়সা যে পাবো সে লোভটাও দেখালেন।

আমি উত্তরে সবিনয়ে বললুম, 'মনে করুন এক হটেনটট লণ্ডনে তিন মাস থাকার পর যদি সেক্সপীয়র, রাফায়েল, এঞ্জেলো, বেটোফন, পাভলোভাকে কটুকাটব্য করে বই লেখে তবে কি কোনো সুস্থ ইয়োরোপীয় তার উত্তর লিখবে?'

প্রশ্ন হচ্ছে নিকল্‌স্‌ এবং আমাদের রবীন্দ্র-সমালোচক এ ধরনের বই বা প্রবন্ধ লেখে কেন?

এরা চায় পয়সা, কিন্তু জানে ভারতবর্ষ তথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রামাণিক রচনা লেখবার মত মুরদ এদের নেই। ওদের বই কেউ কিনবে না। কিন্তু যদি গালা-গাল দিয়ে লেখে তবে বহু লোক সে সব বইয়ের তীব্র প্রতিবাদ করবে, ফলে হট্ট-গোলের সৃষ্টি হবে এবং সেই ডামাডোলে বিস্তর বই বিক্রী হবে। অশ্লীল বইও এই পদ্ধতিতে বাজারে কাটে।

অতএব আমাদের উচিত কি?

চুপ করে থাকা।

তবে আমি আলোচনাটা উত্থাপন করলুম কেন ? তার কারণ বহু সরল পাঠক এই ছুঁচোমিটা না ধরতে পেরে হট্টগোলের সৃষ্টি করে বই বিক্রীর সহায়তা করেন। আমার বক্তব্য, সবাই যেন এ বাবদে একদম 'নিশ্চুপ' 'ডেড্ সাইলেণ্ট' পন্থা অবলম্বন করেন। আলোচনা উত্থাপিত হলেই নাক সিঁটকে বলবেন, 'মাপ করবেন, স্যার, এ বিষয়ে আমার কণামাত্র উৎসাহ নেই।' বলেই অন্য কথা পাড়বেন। বলবেন, 'দেখো দিকিনি, রায় পিথৌরা কি চমৎকার লেখে' কিম্বা উল্টোটা। যাই করুন না কেন, রায় পিথৌরার তাতে করে দু পয়সা আমদানী বাড়বে না।

* * *

ইংরেজ বড় হুঁশিয়ার জাত। তারা এই পদ্ধতিতে ভালো বইও খুন করতে জানে।

লায়োনেল ফীলডেন নামক এক ব্যক্তি এদেশে কয়েক বৎসর 'অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর' বড় কর্তা ছিলেন। এদেশে ইংরেজের কীর্তিকারখানা দেখে ভদ্রলোক বিলেত গিয়ে সে সম্বন্ধে একখানা চটি বই লেখেন—একদা ডিগবি যে রকম "প্রসপারাস" ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া লিখেছিলেন।

ইংরেজ বইখানা সম্বন্ধে এমনি ঠোঁট সেলাই করলে যে বইখানা অতি অল্প লোকই পড়েছেন।

ঋষিরা তাই বলেছেন, নীরবতা হিরণ্ময়, 'সাইলিন্স্ ইজ গোল্ডেন !'

* *

দিল্লীর উপর দিয়ে বড় গর্দিশ গেল। বিস্তর ফিল্ম দেখানো হল, 'তারকাদের' মিছিল হল, হাইফেৎস্ বেয়ালা বাজালেন, পণ্ডিতজী 'নেশনাল ট্রেজার্স ফাণ্ড' খুললেন, সবচেয়ে বড় পোলো ফাইনাল হল, এলেনর রুজভেল্ট এলেন, তার উপর গোটা তিনেক চিত্র-প্রদর্শনী ! মানুষ ক'দিক সামলায় ? সব সামলাতে গেলে রায় পিথৌরার কুইনটুপ্লেটের প্রয়োজন।

বাসু ঠাকুর যে বাড়ির খুশ-নাম ষোল আনা রাখতে পেরেছেন তা নয়। অবশ্য তিনি অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দুজনার কাছ থেকে যা শিখেছেন তার অনেকখানি কাজে লাগাতে পেরেছেন।

বাসু ঠাকুরের ছবিতে প্রচেষ্টা আছে। ভদ্রলোক অনেক কিছু দেখেছেন এবং ভেবেছেন তার চেয়েও বেশী। তুলির জোর তো আছেই, তার চেয়েও বেশী মূর্তি গড়ার হাত। বাসু ঠাকুরের সৃষ্টি তাই যে শুধু আনন্দ দেয় তা নয়, ছবিগুলোর সামনে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কিছু ভাবা যায়। প্রদর্শনী বহুদিন ধরে

খোলা থাকবে।

* * *

ক্রিকেট ম্যাচে যখন পাশের বে-রসিক নানারকম উদ্ভট প্রশ্ন শুধায় তখন উদ্ভট উত্তরও পায়।

"ওগুলো কি ?"

বিরক্তির সঙ্গে, "উইকেট।"

"ওগুলো দিয়ে কি হয় ?"

ততোধিক বিরক্তির সঙ্গে, "ক্লান্ত হলে খেলোয়াড়দের বসবার জন্য।"

পোলো খেলা দেখতে গিয়ে আমার সেই অবস্থা; 'চক্কর' কি, 'হাফ গোল' কারে কয়, ফাউল কখন হয় আর কখন হয় না, তাই বোঝবার পূর্বে খেলা শেষ হয়ে গেল।

তবু, আহা, দেখবার জিনিস! এক গোল থেকে আরেক গোল অবধি (ফুট-বল তিন সাইজ) ঘোড়াগুলো যা ছুট দেখালে তার জন্যই ও খেলা দেখার প্রয়োজন। রাজা-রাজড়াদের গদি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ-খেলাও ঝিমিয়ে আসছে। মরে গিয়ে ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে এক দফা দেখে নেবেন।

১৫

খৃষ্টের ছ'শ বছর আগে বৈশালীতে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। বলা হয়, বুদ্ধদেব এই বৈশালী রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হন এবং আপন সঙ্ঘ নির্মাণের সময় তার অনেকখানি অনুকরণ করেন। এই বৈশালীতেই মহাবীর জীনের জন্ম।

বৈশালীর স্মরণে এখনো সেখানে প্রতি বৎসর উৎসব হয়। এবারকার উৎসবে শ্রীযুত কানহাইয়ালাল মুন্সী সভাপতিত্ব করেন।

শ্রীযুত মুন্সী বলেন, আমরা যদি ভারতের ভিতর দিয়ে বিশ্ব-ঐক্য এবং বিশ্ব-ঐক্যের ভিতর দিয়ে ভারতকে অখণ্ড রূপে চেনার চৈতন্য না জাগিয়ে তুলতে পারি তবে আমাদের স্বাধীনতা লোপ পাবে, স্বাধীনতা গেলে আমাদের আত্মার মৃত্যু হবে, আত্মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের 'মহতী বিনষ্টি'।

এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কারো মনে কোনো প্রকারের সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন, ভারতীয় কিম্বা বিশ্ব-ঐক্যের সাধনার সঙ্গে প্রাদেশিক বৈদগ্ধ্যের সংঘাত আছে কি নেই ? আমরা যখন বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের চর্চা করি, আমি যখন বৃদ্ধ বয়সে উত্তমরূপে হিন্দী শিখতে এবং লিখতে নারাজ তখন আমাকে বাঙালী কূপমণ্ডুক এবং ভারতীয় ঐক্যের পয়লা নম্বরের দুশমন বলা হবে কি না ?

বাঙলার তরুণ সম্প্রদায় যদি আজ আদাজল খেয়ে (আর অন্য বস্তু আছেই বা কি যে খাবে ?) হিন্দী চর্চায় বসে যায়, বাঙলা বর্জন করে হিন্দীতে উত্তম উত্তম কাব্য, কথাসাহিত্য রচনা করে তামাম ভারতকে ভেল্কিবাজি দেখিয়ে দেয় প্রবীণ হয়েও সুনীতি চট্টো নাকি দেখাতে পেরেছেন—তা হলে আমার কণামাত্র —আপত্তি নেই (যদিও একথা বলবো যে কেউ যদি হিন্দী শিখে কোনো ভালো বই বাঙলায় অনুবাদ করে তবে আমি খুশী হই বেশী) কিন্তু দয়া করে আমার মত প্রবীণদের আর এ গর্দিশে ফেলবেন না।

একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

গৃহিণী শুনে স্তম্ভিত যে বড়বাবুকে মাসের কুড়ি তারিখে হাওলাত দেয় তাঁরই আপিসের এক বেনে কেরানী। বড়বাবুর মাইনে সাতশ', আর কেরানীর ত্রিশ। গৃহিণী চেপে ধরলেন, তাঁকে গিয়ে দেখে আসতে হবে সে কি করে বাড়ি চালায়। কর্তা বহুবার গাঁইগুঁই করে শেষটায় না পেরে গেলেন একদিন সন্ধ্যের পর তারাপদর বাড়িতে।

বাড়ি অন্ধকার। ডাকাডাকিতে আলো জ্বলল। তারাপদ নেবে এল হাতে পিদিম পরনে এই টুকুন্ গামছা। বড়বাবুকে ছেঁড়া চ্যাটাইয়ে বসিয়ে শুধাল, 'কোনো লেখা-পড়ার কর্ম আছে কি ?'

'না। কেন ?'

'তা হলে পিদিমটা নিবিয়ে ফেলতে পারি আর গামছাখানা খুলে রাখতে পারি।'

বড়বাবু যা দেখবার জন্য এসেছিলেন তা দেখা হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। পাড়ার মুখে পৌছতে না পৌছতেই চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'গিন্নি, শিখে এসেছি, শিখে এসেছি কিন্তু আমা দ্বারা হবে না।'

বড়বাবুর মত আমারও জানা হয়ে গিয়েছে, হিন্দী শিখলে আমার বহুৎ ফায়দা হবে, কিন্তু ঐ যে বড়বাবু বললেন, 'আমা দ্বারা হবে না' সেই মোক্ষম কথা!

উর্দুতেও এই মর্মে একটি উত্তম কবিতা আছে। মোমিন নামক কবিকে বলা হয়েছিল, 'আর কেন ? সমস্ত জীবন তো কাটালে পাপ কর্ম করে করে ; এইবার একটু ধর্মে মন দাও!'

মোমিন বললেন,

"উম্র সারী তো কটী ইশ্‌কে বুতাঁ মে
মুমিন !
আখরী ওক্তমে ক্যা খাক্ মুসলমাঁ
হোঙগে ?"

"সমস্ত জীবন তো কাটলো প্রেম-প্রতিমাদের
মহব্বতে, রে মুমিন,
এখন এই আখেরি সময়ে কি ছাই
মুসলমান হব।"

তাই হিন্দী-উর্দু মাথায় থাকুন। যেটুকু টুটফুট শেখা আছে সেই 'করেঙ্গা', 'খায়েঙ্গা', 'হাই', 'হুই' করে জীবনের বাকি কটা দিন 'প্রেমসে' চালিয়ে নেব।

কিন্তু যদি বলি, বাঙলার চর্চা যে আমি আমার কট্টর বাঙালীত্বর জন্য করছি তা নয়—বাঙলার সেবার ভিতর দিয়েই আমি ভারতীয় ঐক্যের সেবা করছি: তাহলে হিন্দীপ্রেমী বাঙালীরা হয়তো আমাকে তাড়া লাগাবেন। তবু সেইটেই হক্ কথা, সেইখানেই খাঁটি জাতীয়তাবাদ।

আমাকে বিশ্বনাগরিক হতে হলে তো আর বিশ্বসংসারের ভাষা শিখতে হয় না, কিম্বা এসপেরাণ্টোও কপচাতে হয় না। আমি মালাবারের ভাষা জানিনে তবু মালাবারের লোককে আমার বড় ভালো লাগে। আমি কিঞ্চিৎ ইংরিজি জানি এবং তার অনুপাতে ইংরেজকে অপছন্দ করি অনেক বেশী।

অতএব ভারতকে ভালবাসা যায় হিন্দী না শিখেও। রোমাঁ রোলাঁ হিন্দী জানতেন না তবু তিনি ভারতবর্ষকে চিনতেন ও ভালবাসতেন অনেক দুবেজী পাঁড়েজীর চেয়ে ঢের ঢের বেশী।

সুইটজারল্যাণ্ডের নিজস্ব 'সুইস' বলে কোনো ভাষা নেই। সুইসরা ফরাসী, জর্মন, ইতালীয় ও রোমানি ভাষায় কথা কয়। এবং শতকরা নব্বুইজন একাধিক ভাষা বলতে পারে না। ফরাসী-সুইটজারল্যাণ্ডে অতি অল্প লোকই জর্মন জানে, ইতালীয়-সুইটজারল্যাণ্ডেও তাই। অথচ এই চার ভাষায় গড়ে ওঠা সুইটজারল্যাণ্ড একতায় জর্মনি ইতালীকে অনায়াসে হার মানাতে পারে।

আরবদেশের ভাষা আরবী, ধর্ম ইসলাম, জাতে তারা সেমিটি। আরব মাত্রেরই এই তিন-তিনটে ঐক্যসূত্র আছে—পৃথিবীতে এরকম উদাহরণ বিরল। তবু দেখুন তারা ক'টা রাষ্ট্রে বিভক্ত—তাদের ভিতর রেষারেষি কি রকম মারাত্মক! সউদী আরব, ইয়েমেন, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডন, মিশর, কুওয়াইত, বাহরেন। আলজিরিয়া, তুনিসিয়া, মরক্কোর কথা আর তুললুম না—সেখানে মুবরক্ত কি যেকদারে আছে জানিনে। তাই যখন করাচী 'বিশ্ব-মুসলিম সঙ্ঘ' গড়ার খেয়ালি-পোলাও খায় তখন হাসি পায়। আরবদের এতগুলো ঐক্যসূত্র থাকতেও তারা সম্মিলিত হতে পারছে না, তার উপর তুর্ক, ইরানী, পাকিস্তানী, জাভার মুসলমানকে ডেকে এনে একতা স্থাপন করা!

আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, যে ভারতীয় বৈদগ্ধ্য ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে তার বুনিয়াদ প্রদেশে প্রদেশে। প্রত্যেক প্রদেশ আপন নিজস্ব ভাষা এবং সাহিত্য, আপন জনপদসুলভ আচার-ব্যবহার চারুশিল্প, আপন প্রদেশপ্রসূত ধর্ম এবং সম্প্রদায় এসব তাবৎ বস্তুর চর্চা করে যে ফললাভ করবে তারই উপর একদিন দাঁড়াবে বিরাট কলেবর, বৈচিত্র্যসুশোভিত, সর্বজনগ্রাহ্য ভারতীয় বৈদগ্ধ্য।

আমার এক কাষ্ঠরসিক বাঙালী বন্ধু এই দেহলি-প্রান্তেই বিনিদ্রযামিনী যাপন করছেন হিন্দী চর্চায়—ইনি সেই ব্যক্তি যিনি কাবলীওয়ালাদের সঙ্গে দোস্তী জমান।

তিনি বিস্তর হিন্দী পড়েছেন। ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করেছেন, হিন্দীর পুল্লিঙ-স্ত্রীলিঙ্ তাঁকে কণামাত্র বেকাবু করতে পারে না, হিন্দীর 'ফাউলার' শ্রীবর্মার "অচ্ছী হিন্দী" তাঁর নখাগ্র-দর্পণে।

তিনি বলেন—আমি বলছিনে, কারণ আমার শাস্ত্রাধিকার নেই—হিন্দী ভাষা বাঙলার তুলনায় এখনও এত কাঁচা এত 'লিকুউয়িড্' যে, এ ভাষাতে যে কোনো উত্তর ভারতীয় অনায়াসে উত্তম হিন্দী লিখতে পারবে। তিনি বিশ্বাস করেন, ভালো বাঙলা লিখতে হলে যে মেহন্নত যে খাটুনির প্রয়োজন তার অর্ধেক পরিশ্রমে অত্যুত্তম হিন্দী লেখা যায়।

তাই তিনি বলেন, বাঙালীর তো সব আছে। এখন তার একমাত্র পন্থা, হিন্দী মার্কেট ক্যাপচার করা—সুহৃদ ব্যবসায়ী তাই হামেশাই কারবারী ইডিয়াম ব্যবহার করেন—অর্থাৎ 'অচ্ছী হিন্দী' শিখে, রবীন্দ্রনাথ শরচ্চন্দ্রের কাছ থেকে নেওয়া শৈলী এবং ভাষা হিন্দীর উপর চালিয়ে দিয়ে হিন্দী সাহিত্যে রাজত্ব করা।

হয়ত হক্ কথাই কয়েছেন কিন্তু আমার মন সাড়া দেয় না।

প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে কেমন যেন একটা উৎকট প্রাদেশিকতা রয়ে গিয়েছে, কেমন যেন একটা 'একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়' গোছ ইম্পিরিয়ালিজম রয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যই বা এমন কোন্ গৌরীশঙ্করের চূড়োয় পৌঁছে গিয়েছে যে তার সেবকদের হিন্দী জয় করবার জন্য ছুটি দিতে পারি?

১৬

এককালে এদেশে বিস্তর ফার্সী চর্চা হত। সরকার, মুন্সী, বখশী, কানুনগো, এসব যাঁদের পদবী তাঁদের বাপ-পিতেমো উমদাসে উমদা ফার্সী শিখে এককালে মোগল রাজত্ব চালিয়েছেন। সরকার তো চীফ সেক্রেটারী, বখশী মানে চীফ পে মাস্টার অর্থাৎ একাউণ্টেণ্ট জেনারেল! বাপস্—এসব আপিসারদের সঙ্গে

দেখা হওয়া মানে তো বাঘের সামনে দাঁড়ানো। কান দিয়ে ধুয়ো বেরতে থাকে। আর ওনরা রেগে গেলে তো হাড্ডি বিলকুল পিলপিলিয়ে যায়।

যাক্ মোদ্দা কথায় ফিরে আসি। এই সব বখশী-মুন্সীরা কিন্তু আজকের দিনের সেক্রেটারী একাউন্টেন্টের মত ছিলেন না—অর্থাৎ ফার্সী সাহিত্যেরও চর্চা করতেন, 'মুশায়েরায়' (কবি-সম্মেলনে) কবিতা পড়তেন, 'বয়ৎবাজী'তে (কবির লড়াই) মাথায় গামছা বেঁধে নেমে যেতেন।

স্বর্গত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এই ঐতিহ্যের ভিতর আপন কবিত্বপ্রতিভার বিকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আসল দরদ ছিল বাঙলা সাহিত্যের প্রতি। তাই তিনি হাফিজ সাদীর উত্তম উত্তম কবিতা অতি সরল বাঙলায় অনুবাদ করেন। এ কবিতাগুলো পড়ে হিন্দুরাই যে শুধু 'গুলিস্তানে'র গুলের খুশবো আর বুলবুলের মিঠি বোলী শুনতে পেতেন তাই নয়, ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকের বাঙালী মুসলমান যখন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের জোর চর্চা আরম্ভ করলেন, তখন তাঁরা কৃষ্ণচন্দ্রের 'সদ্ভাবশতক' অতিশয় ভক্তি ও ভালবাসার সঙ্গে মুখস্থ করলেন। আমার বাল্য বয়সে আমি বৃদ্ধদের (হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীরই) গদগদ হয়ে আবৃত্তি করতে শুনেছি—

নেত্র নাই বাঞ্ছা হেরি বিধুর বদন
কর্ণ নাই চাই শুনি ভ্রমর গুঞ্জন।

এবং সর্বশেষে

প্রেম নাই প্রিয়লাভ আশা করি মনে
হাফেজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে ?

কিন্তু এসব গাজন আজ কেন ?

গেল সপ্তায় বারোটি ইরানী দিল্লী এসেছিলেন ; তার মধ্যে আটজন ছাত্র, দুজন শিক্ষক। এঁরা এসেছেন পশুচিকিৎসার শিক্ষাদান এবং গবেষণা দেখতে। এঁদের ভেতর দেড়জন জানেন ইংরিজী আর একজন ফরাসী।

কাজেই ফরেন-আপিসের দাওয়াতে গিয়ে দেখি ছেলেরা নিজেদের ভিতর গুজুর গুজুর করছে। কী আর করি—আমার মুরুব্বী ফার্সীর বাঘা মৌলবী স্বর্গত জয়রাম মুন্সীর নাম স্মরণ করে চালালুম 'হাস্ত' 'হুস্ত'। ফার্সী ভাষাটা কঠিন নয় আর ইরানীরা ভদ্রতায় লক্ষ্ণৌ কিম্বা চীন দেশীয়কে হার মানাতে পারে। সুতরাং তাঁরা আমার ফার্সী শুনে মার তো লাগালেনই না বরঞ্চ উৎসাহের সঙ্গে গাল-গল্প জুড়ে দিলেন।

মুরুব্বী জয়রাম মুন্সী সদ্ভাবশতক পড়ে পড়ে আমাকে তার মূল কি, কোন

কবি সেটি রচনা করেছেন এসব হদীস দিতেন—গুলস্তান বোস্তান তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু হায়, আমাকে 'শেষ-শিক্ষা' দেবার পূর্বেই খুদাতালার আপন গুলস্তানে তাঁর নিমন্ত্রণ এসে গেল, এখানকার পাট তুলে দিয়ে সেখানে গজলকসীদা গাইবার জন্য।

আমি সে রাত্তের খানাতে কৃষ্ণচন্দ্রের বাঙলা অনুবাদের টুটিফুটি ফার্সী অনুবাদ করতে লাগলুম, আর ছেলেরা টক্ টক্ করে তার মূল ফার্সী বলে যেতে লাগল। আমার ভারী আনন্দ হল যে, পশুচিকিৎসা যাদের পেশা তারা যে এতখানি সাহিত্যচর্চাও করে!

আর তারা খুশী যে, ভারতের শেষ প্রান্ত বাঙলা দেশের লোক তার আপন ভাষায় হাফীজ সাদী গেয়েছে দেখে।

* * *

বাঙালীদের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।

সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিনে যে বাড়িতে বাস করতেন সে বাড়িটির প্রতি বাঙালী মাত্রের কিঞ্চিৎ দরদ থাকা দরকার। অনেক ভারতীয়েরও আছে, একথা আমি নিশ্চয় জানি। বিশেষতঃ ৪৬-৪৭ সনে দাক্ষিণাত্যে তাঁর যে কি প্রতিপত্তি ছিল তাও আমি দেখেছি।

কেন্দ্রীয় সরকার কি এ বাড়িটি কিনে নিতে পারেন না? বার্লিনে আমাদের যে রাজদূতাবাস বসবে তাঁরা ভাড়াটে বাড়িতে থাকবেন এবং সস্তায় থাকতে হলে আখেরে ভারতীয় সরকারকে বার্লিনে বাড়ি কিনতে হবে। কাজেই এই বাড়িটি কিনলে ভারতীয় সরকার কিছু অপকর্ম করবেন না।

আর যদি ভারতীয় সরকার এ বাড়িটি কিনতে রাজী না হন, তবে বাঙালী কি এ বাড়িটি কিনতে পারে না? তুমি আমি গরীব সে আমি জানি, কিন্তু সবাই মিলে যদি একটা চেষ্টা দেওয়া যায়, তবে কি কর্মটা একেবারেই অসম্ভব?

এ নিয়ে একটা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত।

আমরা বাড়িটি সম্বন্ধে অন্য সব খবরের তত্ত্বতাবাস করছি। ইতোমধ্যে কিন্তু আন্দোলনটা আরম্ভ করে দেওয়া উচিত।

* * *

শ্রীমতী রজোভেল্ট আমেরিকা ফিরে গিয়ে বলেছেন, ভারতীয়রা আধ্যাত্মিক এবং তারা সেই আধ্যাত্মিকতা পেয়েছে তাদের ধর্ম থেকে।

এ তো বাঙলা কথা। আধ্যাত্মিকতা আসে তো ধর্ম থেকেই—এতে আর নূতন কি বলা হল?

উঁহু। ইংরিজীতে কথাটা অন্যরকম শোনায়। শ্রীমতী বলেছেন, ভারতীয়রা

স্পিরিচুয়াল এবং তাদের স্পিরিচুয়ালিটি এসেছে তাদের রিলিজিয়ান থেকে।

অর্থাৎ স্পিরিচুয়ালিটি এবং রিলিজিয়ান সচরাচর এক জিনিস নহে। ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় বহু লোক স্পিরিট (আত্মার) সাধনা করে, কিন্তু অনেকে রিলিজিয়ান জানে না।

তাই সপ্রমাণ হল রিলিজিয়ান এবং ধর্ম এক জিনিস নহে। এবং সেই কারণেই 'হিন্দু ধর্ম' বলে কোনো জিনিস থাকতে পারে না। ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি তার অর্থ সনাতন ধর্ম। এ ধর্মের আগে 'হিন্দু' শব্দ লাগানো যায় না। ঠিক যে রকম 'হিন্দু ভগবান' 'মুসলমান ভগবান' কিম্বা 'খৃষ্টান ভগবান' হতে পারেন না ঠিক তেমনি 'হিন্দু ধর্ম' আমার কানে অদ্ভুত শোনায়।

শুধু হিন্দুরাই নয়, বৌদ্ধরাও যখন ত্রিশরণ মন্ত্রে 'ধর্মাং শরণং গচ্ছামি' বলেন তখন তো 'ধর্মের' পূর্বে বৌদ্ধ শব্দ লাগান না। কুরাণে ধর্ম শব্দের জন্য পাই 'দীন' কিম্বা 'দীনুল্লা' অর্থাৎ যে 'দীন আল্লার দিকে নিয়ে যায়'। অন্য শব্দ 'ইসলাম'। 'ইসলাম' শব্দের ধাতু, 'ভগবানের ইচ্ছার সম্মুখে নিজেকে আত্মসমর্পণ করা।'

তাই ধর্ম শব্দের আগে 'হিন্দু' কিম্বা 'মুসলমান' শব্দের প্রয়োগ আমি বুঝে উঠতে পারিনে। ধর্ম সর্বমানবের জন্য,—তার আবার হিন্দু-মুসলমান কী ?

গত বৎসর এই সময়ে রমণ মহর্ষি দেহত্যাগ করেন। 'ইসলাম' শব্দের স্মরণে মহর্ষির কথা মনে পড়ল।

দাক্ষিণাত্যের তিরু-আন্নামলাই গ্রামে রমণাশ্রমে কয়েক মাস থাকার সৌভাগ্য আমার জীবনে একবার হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ সচরাচর কাউকে দর্শন দিতেন না আর রমণ মহর্ষিকে উদয়াস্ত একই ঘরে পাওয়া যেত। নানা লোক নানা প্রশ্ন করত, মহর্ষি উত্তর দিতেন। অবশ্য রেসে কোন্ ঘোড়া জিতবে জিজ্ঞেস করলে চুপ করে থাকতেন, এমন কি ভগবান কেন সংসারটা তৈরী করলেন, তার উত্তরও দিতেন না। বড্ড বেশী খোঁচাখুঁচি করলে বলতেন, 'তোমার তা জেনে কি দরকার।'

একদিন আরেকটুখানি বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। বললেন, 'তুমি যে প্রশ্নটা করলে সেটার উত্তর আমি যদি দি, তবে সে উত্তর তুমি বুঝবে কি দিয়ে ? অবশ্য তোমার মন দিয়ে। এখন তবে প্রশ্ন, তুমি তোমার মনটাকে বুঝতে পেরেছ কি ? যে ফিতেটা দিয়ে তুমি জমি মাপতে যাচ্ছো তারই যদি দৈর্ঘ্য না জানো, তবে মেপে লাভটা কি ? তাই সক্কলের পয়লা মনটাকে চিনতে হয়।'

একদিন দেখি জনাচারেক বয়স্ক তামিল মুসলমান মহর্ষিকে প্রণাম করে সামনের মেঝেতে বসল। দেখে মনে হল চাষাভূষা শ্রেণীর কিম্বা কোচম্যান হ্যাণ্ডি-ম্যানও হতে পারে।

অনেকক্ষণ মহর্ষির দিকে তাকিয়ে থেকে শেষটায় একজন অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে তামিল ভাষায় বলল, 'আমরা আপনাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বিরক্ত করতে চাইনে বলে বাড়ি থেকেই সবাই মিলে একটিমাত্র প্রশ্ন ঠিক করে নিয়ে এসেছি। আপনি যদি উত্তর নাও দেন, তাতেও আমাদের আক্ষেপ নেই, কারণ আপনার দর্শন আমরা পেয়েছি সেই যথেষ্ট।'

শিশুর মত মহর্ষি সরল হাসি হাসলেন। বললেন, 'বলো।'

প্রবীণটি বললে, 'মানুষের জীবনে সবচেয়ে কাম্য ধন কি?'

তৎক্ষণাৎ মহর্ষি উত্তর দিলেন, 'ইসলাম।'

চারজনই অনেকক্ষণ ধরে মহর্ষির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রণাম করে সন্তুষ্ট চিত্তে বেরিয়ে গেল।

আমি জানি, মহর্ষি কোন্ অর্থে ইসলাম বলেছিলেন। এ চারজন বাড়ি ঘরে গিয়ে নিশ্চয়ই 'ইসলাম' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করবে এবং আল্লার কৃপা থাকলে সত্য ধর্মে পৌঁছবে।

১৭

ভারতীয় পার্লামেন্টের বাঙালী সদস্যগণকে নয়াদিল্লীর কালীবাড়ি গত শুক্রবার সন্ধ্যায় এক বিশেষ সভায় আমন্ত্রণ করে অভিনন্দিত করেন। উল্লেখ প্রয়োজন নিমন্ত্রিত বাঙালীগণ সকলেই বঙ্গবাসী নন, এঁদের কেউ কেউ বাঙলাদেশের বাইরে থেকে নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে আসন পেয়েছেন। তা ছাড়া বাঙলা ভাষাভাষী উড়িয়া বিহারী আসামী সভ্যদেরও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং তাঁদের কেউ কেউ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নিমন্ত্রিত সদস্যগণকে মাল্যদানকরতঃ একে একে সভার সঙ্গে পরিচিত করান।

এই উপলক্ষ্যে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা কালীবাড়ির নূতন পুস্তকালয় এবং পঠন-গৃহের দ্বার উন্মোচন করেন।

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ বলেন, বাঙালীর আজ বড় দুর্দিন—বাঙলার সামনে আজ নানা কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এবং সেগুলো সমাধান করতে হলে আমাদের ব্যক্তিগত কিম্বা দলগত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে শুদ্ধমাত্র খাঁটি বাঙালীরূপে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে হবে। এবং এ কর্মে যে শুধু বাঙালীই যোগ দেবেন তাই নয়; বিহার, উত্তর প্রদেশের বাঙালীরাও তাঁদের সহযোগিতা দেবেন।

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ আরো বলেন, ভারতের ইতিহাস এবং ভাগ্য নির্মাণে

বাঙালীর দান নগণ্য নয়; আজ যদি বাঙালী তার দুরূহ সমস্যাগুলোর সমাধান না করতে পারে তবে যে শুধু বাঙালীই লোপ পাবে তা নয়, তাতে করে সমস্ত ভারতবর্ষ দুর্বল হয়ে পড়বে। (বাঙলা শর্টহেণ্ড জানিনে, কাজেই প্রতিবেদনে ক্রটিবিচ্যুতি থাকলে আশা করি বক্তা অপরাধ নেবেন না।)

এ তো অতি খাঁটি কথা—এ কথা অস্বীকার করবে কে?

কিন্তু প্রশ্ন আমাদের সমস্যাগুলো কি, এবং তার সমাধানই বা কি? ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ যদি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতেন তবে আমরা উপকৃত হতুম। তবে হয়ত প্রীতিসম্মেলন দীর্ঘ ভাষণের উপযুক্ত স্থান নয় বলেই তিনি এ নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করেননি। কিন্তু তবু অধমের বক্তব্য, অন্যত্র শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ যে সব ভাষণ দেন সেগুলো তিনি তাঁর দলের মতবাদের দৃষ্টিবিন্দু থেকেই দিয়ে থাকেন। তাঁরই কথামত তিনি যদি খাঁটি বাঙালী হিসেবে নিরপেক্ষ বক্তৃতা দিতেন তবে আমরা অর্থাৎ যারা কোনো দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই—উপকৃত হতুম। শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে দিল্লীবাসী বাঙালীগণকে নিরাশ করবেন না।

রায় পিথৌরার কথায় কেউ বড় একটা কান দেয় না—আর দেবেই বা কেন, সে তো আর কেষ্ট-বিষ্টু কেউ-কেডা নয়—এবং তাই সে বড় খুশী। সব দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে সে তাই তখন পরমানন্দে যাচ্ছেতাই (হায়, যদি ঠিক 'যা ইচ্ছা তাই' ঠিক ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারতুম তবে তো এতদিনে দেশবিদেশে কবি, সাহিত্যিক হিসেবে নাম করে ফেলতে পারতুম—দু'পয়সা ভি আসত) বলে যায় এবং তারই মত আরো কয়েকজন দায়িত্বহীন পাঠক সেগুলো পড়ে বলে, 'ঠিক বলেছ।' এঁদেরই জন্য আমি কলম ধরি; তাই আমার মনে হয়—স্বাধীনতার পর বাঙলার আকার ছোট হয়ে যাওয়াতে আমাদের নূতন নূতন সমস্যার অন্ত নেই।

তাই দেখতে হবে বাঙলার আয়তন কি প্রকারে বাড়ানো যায়।

ভাষার ভিত্তিতে ভারতীয় প্রদেশগুলোকে যদি নূতন করে গড়ে তোলা হয় তবে বাঙলার আয়তন বাড়বে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু তার বিরুদ্ধেও যুক্তি আছে।

বাঙলার বাইরেও বাঙালী সংস্কৃতির স্থান আছে। এ কথা কে না জানে, উড়িষ্যা, আসাম ও পূর্ব বিহারের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই উত্তম বাঙলা জানেন, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সঙ্গে তাঁরা সুপরিচিত, তাঁদের বাড়ির মেয়েরা রবীন্দ্র-সঙ্গীত গান এবং এ সব প্রদেশের অশিক্ষিত জনও বাঙলা ফিল্ম দেখে।

আজ যদি এই সব প্রদেশের বাঙলাভাষী অঞ্চলগুলো বাঙলাকে দিয়ে দেওয়া হয় তবে বহু বাঙলাপ্রেমী বিহারী, আসামী এবং উড়িষ্যাবাসী আমাদের উপর

বিলক্ষণ রেগে যাবেন এবং ক্রমে ক্রমে সেই রাগের বশে বাঙালী সংস্কৃতি বর্জন করতে আরম্ভ করবেন।

এই পরিস্থিতির কথা ভাবলেই আমি বড্ড ভয় এবং ক্লেশ পাই।

কারণ বাঙলাদেশের পরিমাণের চেয়েও আমি বহু বহু গুণে বেশী মূল্য দিই বাঙালী সংস্কৃতির পরিব্যাপ্তিকে। আমার ধ্যানের বাঙলা বাঙলাদেশে সীমাবদ্ধ নয়—পশ্চিমবাঙলার গুটিকয়েক জেলাই তার বিহার-ভূমি নয়—আমার ধ্যানের বাঙলা আসাম, বিহার, উড়িষ্যার সুদূরতম প্রান্ত অবধি—না, কম বলা হল, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, দিল্লী, জয়পুর যেখানেই বাঙলা সংস্কৃতির ছাপ পড়েছে, ছায়া পড়েছে সেখানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙলা। পূর্ব-বাঙলাও তাই এ-ধ্যানের বাঙলার ভিতরে।

টমাস মান্ যখন যুদ্ধের পর বিভক্ত জর্মনির পশ্চিমাঞ্চলে নিমন্ত্রিত হন তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি পূর্বাঞ্চলেও যাবেন কিনা? উত্তরে মান্ বলেছিলেন, যেখানেই জর্মন সংস্কৃতি সম্মান পায় সেখানেই আমার মাতৃভূমি।

এই ধ্যানের বাঙলা যেন বিনষ্ট না হয়।

জমিদারী বাড়ানো ভালো কিন্তু জমিদারী বাড়াতে গিয়ে যদি হাজার হাজার মিত্রকে শত্রু করতে হয়, তাঁদের সঙ্গে যদি আমার আহার-বিহার বন্ধ হয়ে যায়, তাঁরা যদি আমার সভ্যতা সংস্কৃতির চর্চা বর্জন করেন তবে দেখতে হবে, ভাবতে হবে, আমার কর্তব্য কি?

ওদিকে মানভূম, সিংভূমের বাঙালীর প্রতি আমাদের কর্তব্যবোধ ধর্মবোধও আছে। কোনো কোনো অদূরদর্শী বিহারীরা নাকি ঐ সব অঞ্চল থেকে বাঙলা চর্চা তুলে দিতে চান—আমি হলফ করে কিছু বলতে পারব না, কারণ ও সব অঞ্চলে গিয়ে উৎকট সব সমস্যার সম্মুখীন হবার দায় থেকে শ্রীগুরু আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন; তাই যদি হয় তবে সেই বা চোখ, কান বন্ধ করে সয়ে নেব কি প্রকারে?

এই পিন্‌সার মুভমেণ্টের সামনে আমি হিমশিম খেয়ে গিয়েছি।

কিন্তু ঠিক এইখানেই তো পিথৌরাতে শ্যামাপ্রসাদে তফাৎ। এ সমস্যার সমাধান পিথৌরা জানে না, দায়ও তার নয়; শ্যামাপ্রসাদ যদি শ্যামার প্রসাদ পান তবে সমস্যা-সমাধান করতে পারবেন বলে আশা করি। না হলে নেতা হলেন কেন?

তবে শেষ কথা এই; তিনি নিজেই যা বলেছেন সেইটাই সত্যি। এ সমস্যার সমাধান তাঁকে করতে হবে তাঁর পার্টিগত দৃষ্টিবিন্দু বর্জন করে, একদম হানড্রেড এণ্ড

টেন পার্সেণ্ট নির্জলা, নির্ভেজাল খাঁটি বাঙালীরূপে।

এবং শ্যামাপ্রসাদের বাঙালীত্ব সন্দেহ করবে কে? যদি কেউ করে, তবে বিদ্যেসাগর মহাশয়ের ভাষাতে বলি (সাবধান, চ্যালেঞ্জ করবেন না, আমি গেল কয়েক মাস ধরে শুধু বিদ্যাসাগরই পড়েছি), "তার বাপ নির্বংশ হ'ক!"

বাঙালীকে একথা ভুললে চলবে না, সে বাঙালী। সে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খ্রীশ্চান নয়,—সে বাঙালী।

আমার পরম শুভানুধ্যায়ী, বিদ্রোহী বীর, পরলোকগত উপীনদা এ সম্বন্ধে 'নির্বাসিতের আত্মকথা'তে যা লিখেছেন সেটা বাঙালী যেন বার বার পড়ে, উদয়াস্ত সেই মন্ত্র জপ করে।

একবার বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়লেই একথা সবাইকে মেনে নিতে হয়।

বাঙলা-সাহিত্যের আঁতুড়ঘর বৌদ্ধ-মন্দিরে—চর্যাপদ নিয়ে, বেদবেদান্ত নিয়ে নয়। তারপর তার বৈষ্ণব রূপ। আজ বৈষ্ণবধর্ম হিন্দুধর্মের অঙ্গ, কিন্তু যে যুগে সে জন্মগ্রহণ করে সে যুগে সে ব্রাত্য—ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাস ধোপানী রামীকে বলছেন,

তুমি বেদ-বাদিনী হরের রমণী
তুমি হও মাতৃপিতৃ
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারে ভজন
তুমি বেদ মাতা গায়ত্রী।

এ যদি বিদ্রোহ না হয়, এ যদি স্বাধীন চিন্তাপদ্ধতি না হয়, তবে স্বাধীনতা কি? তারপর বাঙলা গদ্যের সূত্রপাত রামমোহনে। তিনিও বিদ্রোহী—প্রচলিত হিন্দু ধর্মের কতই না জঞ্জাল তিনি লৌহ-সম্মার্জনী দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে গেলেন। তারপর বাঙলার শ্রেষ্ঠতম সন্তান বিদ্যাসাগর মহাশয়—তাঁকে বর্ণনা করার ভাষা আমার আয়ত্তের বাইরে—তিনিও 'সনাতন' ধর্মের বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কর্মের বিজয় পতাকা তুলেছেন। তারপর মাইকেল—রাম রাম! তিনি তো কেরেস্তান; কিন্তু শুধাই, আজ এবং সে যুগেও কেউ তাঁকে তাই নিয়ে তাচ্ছিল্য করেছে? ওদিকে পূর্ব-বাঙলায় মুসলমানরা কেচ্ছা-সাহিত্য, মুর্শীদীয়া, জারী, দর্বেশী রচনা আরম্ভ করেছেন—হিন্দু দীনেশচন্দ্র তো সেগুলো অবহেলা করলেন না! আজ মৈমনসিংহী গীত কবিতা বাংলার অলঙ্কার। তারপর বঙ্কিম; তিনি তো বৃন্দাবনের রসরাজকে সর্বজনসমক্ষে খুন করলেন (এবং আশ্চর্য, যে ব্রাহ্মসমাজ বৈষ্ণব ধর্মকে তাচ্ছিল্য করে কদম্ববৃক্ষকে 'অশ্লীল বৃক্ষ' বলেন—আমার

শোনা কথা—সেই সমাজের মহাপুরুষ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই দেখে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'রসরাজ চলে গেলে আমাদের থাকবে কি?')। এবং পশ্চ, পশ্চ, যে বাঙালী বঙ্কিমকে 'ঋষি' উপাধি দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেও রসরাজকে বর্জন করেনি। ঠিক ঐ সময়ে কিনা বলতে পারব না, কাঙাল হরিনাথের (কাঙাল যদি ছেলের মত ছেলে হত তবে তুমি জানতে। কাঙাল জোর করে কোল কেড়ে নিত, তুমি পারতে না মা ছাড়তে) সখা মীর মুশররফ হুসেন 'বিষাদসিন্ধুতে' মুসলমানের কারবালার কাহিনী লিখলেন; এ-বই "হৃদয়তাপের ভাপে-ভরা ফানুস", তত্ত্ব এতে নেই, তবু বাঙালী আজও সে বই কেনে। তারপর রবীন্দ্রনাথ—তিনি কতখানি স্বাধীন চিন্তার প্রতীক ছিলেন সে কথা আপনারা আমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন; তিনি হিন্দু নন, ব্রাহ্ম নন—তিনি বাঙালী। তারপর সুকবি নজরুল ইসলাম। মুসলমান। তাঁর তখল্লুস্ (পেননেম) 'বিদ্রোহী কবি'। একে মুসলমান, তায় বিদ্রোহী। অথচ বাঙালী হিন্দু তাঁকে কী শ্রদ্ধাই না দেখিয়েছে—আজও তাঁর জন্মদিনে তাঁর রোগশয্যার চতুর্দিকে বহু বাঙ্গালী জড়ো হয়। ক্ষীণ আশা নিয়ে যদি তিনি ক্ষণেকের তরে চৈতন্য পেয়ে আরো কিছু দেন ('টুকরো খবর' দ্রষ্টব্য)। সর্বশেষ 'পরশুরাম'। তিনি আমাদের প্রচলিত ধর্ম নিয়ে যে উৎকট মস্করা করেন সে তো অবিশ্বাস্য। অন্য কোনো দেশ হলে বহু পূর্বেই তিনি লিন্‌চ্‌ট্, বার্নট এট দি স্টেক, কাফিররূপে কতলিত হতেন।

বাঙালী বাঙালী। হিন্দুধর্মের প্রতি তার সোহাগ নেই, মুসলমানকে সে অবহেলা করেনি, কেরেস্তানও তার ভাই। এ রকম উদারতা কটা জাত, কটা সাহিত্য দেখিয়েছে?

আমি তো বিশ্বসাহিত্য জানিনে। অগ্রজপ্রতিম সখা শ্রীযুত সুনীতিকুমার জানেন। তিনিই বলুন না? ভুল সপ্রমাণ হলে 'দেহলীপ্রান্ত' থেকে কলকাতা অবধি নাকে খৎ দেব।

অথচ কি আশ্চর্য! হিন্দু ধর্ম বাঁচিয়ে রেখেছে বাঙালীই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এঁরা বাঙালী। আপনারা যদি সাহস দেন, তবে সে প্রলাপও একদিন নিবেদন করব।

উদ্ধৃতিতে ভুল থাকলে অপরাধ নেবেন না। এই পাণ্ডববর্জিত ইন্দ্রপ্রস্থে চণ্ডীদাস পাই কোথায়?

বিদেশ থেকে মহামেহন্নত করে বিরাট বিরাট ছবি এদেশে এনে কেউ যদি প্রদর্শনী খোলে, তবে সে সম্বন্ধে সামান্যতম অপ্রিয় বাক্য বলতেও ভদ্রজনের বাধো বাধো ঠেকে। অথচ মৌনতা দ্বারা সম্মতি অর্থাৎ সন্তুষ্টি প্রকাশ করলে যে-ভদ্রমহোদয়গণ সোভিয়েট চিত্রপ্রদর্শনী খুলেছেন তাঁদের প্রতি অন্যায় করা হয়। আমরা যদি চুপ করে থাকি, তবে তাঁরা ভাববেন এ ছবিগুলো আমাদের পছন্দ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরণের ছবিই পাঠাবেন। আর আমরা যদি বলি, না, আমাদের প্রাণে এ ছবিগুলো কোনো স্পন্দন জাগাতে পারেনি, তবে হয়ত ভবিষ্যতে তাঁরা তাঁদের বিশাল ভাণ্ডার থেকে অন্য ধরনের ছবি পাঠাবেন।

*　　　　*　　　　*

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ছবিগুলো ঘোর বস্তুতান্ত্রিক বা রিয়ালিস্টিক। স্থূলতঃ এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। রুশ বস্তুতান্ত্রিক রাষ্ট্রসঙ্ঘ, তার ছবি যে একদম বস্তুরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে সে-ই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রশ্ন বস্তুতান্ত্রিক ছবি হলেই তাকে কি রঙিন ফোটোগ্রাফী হতে হবে? প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবি তাই; একশ বৎসর আগে, ইম্প্রেশেনিজম আরম্ভ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ ইয়োরোপীয় চিত্রকলার অবনতির যুগে, এ রকম ছবি আঁকা হয়েছিল। ভারতবর্ষে রবি বর্মা এ ধরনের ছবি এঁকেই এদেশে নাম করেছিলেন। এসব ছবিতে মুন্সীয়ানা বিস্তর, খাটুনি এন্তার, কিন্তু এরা ছবির পর্যায়ে ওঠে না।

*　　　　*　　　　*

তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, রুশরা ভালো আঁকবার চেষ্টায় যে কাঠ-খড় পোড়াচ্ছে তার তুলনায় আমাদের অধিকাংশ চিত্রকররা কোনো মেহন্নতই করছেন না। ভালো করে লাইন টানার কিংবা তুলি ধরার পূর্বেই এঁরা সব সেজান গগাঁ মাতিসের অতিশয় দুর্বল অনুকরণ করে 'অরিজিনাল' ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দেন। প্রকৃতি বা জীবজন্তু পর্যবেক্ষণ না করে, আপন হৃদয়ের জারক রসে সেটা না জারিয়ে নিয়ে তাঁরা আকাশকুসুমবৎ কাল্পনিক অদ্ভুত অদ্ভুত জন্তু-জানোয়ার বানাতে আরম্ভ করে দেন। সব ফাঁকি, সব ফক্কিকারি—পিছনে কোনো মেহন্নত নেই, কোনো সাধনা নেই।

রাশাতে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। মেহন্নত এবং উৎপাদনের মাপকাঠি দিয়ে সেখানে অর্থ এবং সম্মানের ওজন করা হয়।

রাশানরা খেটেছে, তাই ভবিষ্যতে এরা ভালো ছবি আঁকতে পারলে বিস্মিত হব না।

সর্বশেষ বক্তব্য, প্রদর্শনীতে উত্তম ছবিও কয়েকখানা আছে—জারের পূর্বেরও পরেরও। তবে সেগুলো খুঁজে বের করতে হয়।

* * *

ইতোমধ্যে দিল্লীতে আর্ট নিয়ে গুটিকয়েক সম্মেলন হয়ে গেল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, আমাদের জীবনের সঙ্গে আর্টের সম্পর্ক ক্রমেই ছিন্ন হয়ে আসছে এবং আমাদের উচিত আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে আর্ট শেখাবার সুব্যবস্থা করা।

* * *

আর্ট শেখানো উচিত—একথা বলতে গিয়ে কিন্তু অনেকেই দুটো জিনিস মিশিয়ে ফেলেন।

দেশসুদ্ধ লোককে ছবি আঁকতে কিংবা গান গাইতে (স্থাপত্য অর্থাৎ বিরাট বিরাট এমারৎ তৈরী করা শেখানোর কথাই ওঠে না) শেখানোর চেষ্টা করা ভুল —কোনো দেশ করেও না। কিন্তু এ-সব কলারস আস্বাদন করার শক্তি ও রুচি জন্মানো প্রত্যেক শিক্ষায়তনেরই কর্তব্য। এবং তার ব্যবস্থা আমাদের ইস্কুল কলেজের কোথাও নেই। আমাদের ইস্কুল কলেজের দেয়ালে অজন্তা, রাজপুত, মুগল কলা, ত্রিমূর্তি, নটরাজ, কনারক, খাজুরাহো, কুৎব্‌, তাজের ফটোগ্রাফ টাঙানো থাকে না; কাজেই সেগুলোতে কি কলারস রয়েছে সে-কথা মাস্টার অধ্যাপক কাউকেই ছাত্রকে বুঝিয়ে বলতে হয় না।

আমাদের তাবৎ ঝোঁক সাহিত্যের দিকে। গদ্য এবং পদ্যে কি রস কোথায় লুকোনো আছে, আমাদের শিক্ষকেরা সেটা পই পই করে বোঝান, শুকনো চসার পর্যন্ত আমাদের বাধ্য হয়ে চিবোতে হয়, এসব বিষয়ে রচনা লিখতে হয় ও সাহিত্যের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করতে হয় (কবিতা কি করে লিখতে হয় তার তালিম অবশ্য দেওয়া হয় না—লাতিন ইস্কুলে যে রকম লাতিন পদ্য এবং টোলে যে রকম সংস্কৃত পদ্য রচনা করতে শেখানো হয়)। বহু বৎসর ধরে এই কর্ম চলে এবং শেষটায় কেউ কেউ সাহিত্যানুরাগী হন। যাঁরা ইস্কুল কলেজে থাকাকালীন, কিংবা ছাড়ার পর, কবিতা লেখেন সেটা প্রধানতঃ তাঁদের নিজের চেষ্টার ফলে—ইস্কুল কলেজের তালিম দেওয়ার ফলে নয়।

কিন্তু প্রশ্ন সাহিত্য ভিন্ন অন্য বস্তুতে শিক্ষা দেবে কে?

* * *

কালই একজন খ্যাতনামা ভারতীয় ঐতিহাসিকের লেখা একখানা ভারতের ইতিহাস পড়ছিলুম। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বে অসাধারণ পণ্ডিত; কাজেই ভারতের প্রতি যুগের এই তিন বস্তু তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করেছেন। কোন ভ্রাম্যমাণের রোজনামচা কতখানি বিশ্বাস করা যায়, কোন্ মুদ্রা থেকে কতখানি ইতিহাস নিংড়ে বের করা যায়, পূর্বাচার্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কে কতখানি বিশ্বাস্য কতখানি অবিশ্বাস্য এসব তত্ত্ব তিনি সূক্ষ্ম চাল্‌নির ভিতর দিয়ে বার বার চালিয়ে নিয়ে খাঁটি মাল পরিবেষণ করেছেন।

কিন্তু প্রতি অধ্যায়ের পর যখন ঐ যুগের শিল্পকলা নিয়ে তিনি আলোচনা আরম্ভ করেন তখন তিনি আর পূর্ববর্ণিত অতি সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে আলোচনা ফাঁদেন না। তখন শুধু 'এ্যাজ্ ফার্গুসন সেজ' কিংবা 'একর্ডিং টু কানিঙহাম' অথবা 'কার স্টিফেন ইজ রাইট হুয়েন হি সেনটেনস্'। তাঁর নিজের কিছু বক্তব্য নেই।

আমি একথা বলব না, আমাদের ঐতিহাসিকের কোনোপ্রকার আপন রসবোধ নেই। সাহিত্যরস তাঁর দিব্য আছে, ভাস কালিদাস সম্বন্ধে তিনি সূক্ষ্ম পদ্ধতিতেই আলোচনা করেছেন; অর্থাৎ তিনি যৌবনে যে শিক্ষা ও রুচির তালিম পেয়েছিলেন তার বিকাশ করে উত্তম ইতিহাস লিখেছেন। কিন্তু চারুশিল্প বাবদে তিনি কখনো কোনো তালিম পাননি বলে ভারত-ইতিহাসের সেই সুবৃহৎ —হয়ত সর্বোত্তম—অধ্যায় তিনি লিখতে পারেননি।

তাই প্রশ্ন, চারুকলার ইতিহাস (হিস্ট্রি) পাব কবে ?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে আর্ট হিস্ট্রি পড়াবার সুব্যবস্থা আছে। প্রতি বৎসর কয়েকটি ছেলেমেয়ে এ বিষয় অধ্যয়ন করে ডিগ্রী নেয়—একটি মিশরি ছেলে সরকারী বৃত্তি পেয়ে এ বিষয় পড়তে কলকাতা এসেছে —এবং খুব সম্ভব পরে বেকার থাকে।

আমার মনে হয় আর্ট হিস্ট্রি ফার্স্ট ইয়ার থেকেই পড়ানো উচিত। লজিক, সংস্কৃতের ন্যায় যে কোনো ছেলে যেন বিষয়টি বেছে নিতে পারে। যারা এতে অনার্স নেবে তারা যেন 'জেনরেল আর্ট হিস্ট্রি'র কোনো বিশেষ অংশ—সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদির যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে গভীরতার চর্চা করে।

এই সব গ্রাজুয়েট পরবর্তীকালে ইস্কুল-শিক্ষকের কর্ম নিলে সেখানে অনায়াসে কলা-চর্চার গোড়াপত্তন করতে পারবেন।

* * *

দিল্লী সম্মেলনে ইস্কুলের ড্রইং মাস্টারদের নিন্দে করা হয়েছে। জানি,

সম্মেলন যা বলেছেন সে সব অতি খাঁটি কথা কিন্তু তবু আমার বেদনা বোধ হল।

ছেলেবেলায় যে দুটি ড্রইং মাস্টার আমাদের ছবি আঁকা শেখাতেন তাঁরা রাফায়েল টিশিয়ান ছিলেন না; এমন কি আজ বুঝতে পারি, তাঁরা উত্তম ছবির আদর্শ বলতে রঙিন ফোটোগ্রাফই বুঝতেন—তখনো অজন্তা মুগল আমাদের ক্ষুদ্র মহকুমা শহরে এসে পৌঁছয়নি।

সেজান চিত্রকর, জোলা সাহিত্যিক। এঁর ছবি ওঁর চিন্তাধারাকে ওঁর চিন্তাধারা এঁর ছবির উপর প্রভাব বিস্তার করে অপূর্ব সৃষ্টির সহায়তা করেছিল।

আমার ড্রইং মাস্টাররা সংস্কৃত এবং ফারসীর শিক্ষকদের মত অবহেলিত, অনাদৃত ছিলেন।

এঁরা যদি কোনো কলা-ঐতিহাসিক শিক্ষকের দিগদর্শন পেতেন, তবে ভ্রান্তপথ বর্জন করে আমাদের ঐতিহ্যগত কলা-সৃষ্টির নির্মাণে নিজেকে অতি সহজে নিয়োজিত করতে পারতেন এবং তাতে করে এঁদেরও জীবন সার্থক হত।

সবাই অবহেলা করে এঁদের বলত 'পটুয়া'—এমন কি সহকর্মিগণও এঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন এমনভাবে যেন এঁরা ব্রাত্য, অপাংক্তেয়—যোগাযোগের ফলে জাতে উঠেছেন। ডাঙ্গায় নগণ্য মাইনে, জলে অবহেলা—শেষটায় একজন ঢাকার থিয়েটারের সীন এঁকে আর সব মাস্টারদের পয়সার দিক দিয়ে কানা করে দিলেন। কিন্তু আমি জানি, তিনি সুখী হননি। আমাকে তিনি স্নেহ করতেন; নিজে সে কথা বলেছেন। আজ বুঝতে পারি, কেন তিনি সুখী হননি।

রঙিন ফোটোগ্রাফি হোক কিম্বা আর যাই হোক, যখন তিনি মাস্টার ছিলেন, তখন তাঁর একটা আদর্শ ছিল, স্টেজের সীন আঁকতে সে আদর্শটি লোপ পেল—পেলেন তিনি টাকা।

* * *

বহু বহু বৎসর পরে আমি বার্লিন শহরে কয়েক মাস বাস করেছিলুম। সেখানে কয়েকজন মেধাবী চিত্রকরের সঙ্গে হৃদ্যতা হয়। এঁদেরই একজন আমার ঘরে এ-বই ও-বই নাড়াচাড়া করছেন। তার ভিতর ছিল 'চয়নিকা'—ঐ একখানা বই আমি সব সময়ই বিদেশে সঙ্গে নিয়ে যেতুম, বিস্তর বই নিয়ে যাবার উপায় নেই বলে।

সে বইয়ের প্রথম সাদা পাতায় আঁকা ছিল আমার ড্রয়িং মাস্টারের আপন তুলিতে আঁকা 'সূর্যোদয়'।

আমার জার্মান আর্টিস্ট বন্ধু হতবুদ্ধি হয়ে সে ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, "হোয়াট এ রটন্ পেন্টিং—বাট্ হোয়াট মাস্টারি অভার টেক্নীক্!"

পূর্ব-পশ্চিমের বহু গুণী-জ্ঞানী দার্শনিক-পণ্ডিতজন দেহলি প্রান্তে সমবেত হইয়া সপ্তাহাধিককাল 'মানবের মূল্য' ও 'শিক্ষা-দর্শন' সম্বন্ধে বহুমুখী আলোচনাকরতঃ স্ব স্ব দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন—কেহ কেহ ভারত ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

চরম সত্য ভঙ্গের প্রাক্কালে সমবেত দার্শনিকমণ্ডলী এক বাক্যে স্বীকার করেন, পূর্ব ও পশ্চিমের চিন্তাধারা এবং জীবনদর্শনে কোনো প্রকারের দ্বন্দ্ব কিম্বা অন্তর্নিহিত পার্থক্য নাই।

তৎসত্ত্বেও আমার মনে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দ্বিধা রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে তত্ত্ব এস্থলে সবিশদ আলোচনা না করিয়া অন্য একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পূর্ব-পশ্চিমের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য আছে সে-কথা স্বীকার করিয়া লইলেও তো কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। আমরা ইউনিটি বা ঐক্যের সন্ধান করিতেছি—সমতা বা ইউনিফর্মিটি আমাদের কাম্য নহে। বঙ্গবাসী পাঞ্জাববাসীর ন্যায় রুটি এবং মাংস না খাইলে কি উভয়ের ঐক্য অসম্ভব? বরঞ্চ বলিব, পাঞ্জাবী এবং বাঙ্গালী উভয়েই আপন আপন বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া আপন মনীষার নব নব বিকাশ নব নব উন্মেষণ করিয়া যদি বৃহত্তর ঐক্যে সম্মিলিত হয়, তবে সেই ঐক্যই হইবে সত্য ঐক্য।

প্রাচ্য প্রতীচ্য সেইরূপ যদি আপন আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া সহযোগিতা করে, তাহাতেই তো বৃহত্তর মঙ্গল; বরঞ্চ বলিব, একে অন্যের অনুকরণ করিয়া ক্ষুদ্র সমতার সন্ধান করিলে উভয়ই আপন আপন ঐতিহ্যভ্রষ্ট হইয়া আড়ষ্ট এবং ক্লীব দর্শনের পীড়াদায়ক পুনরাবৃত্তি করিবে মাত্র।

* * *

জনৈক ফরাসিস্ দার্শনিক বলিলেন, প্রাচী বরঞ্চ প্রতীচী সম্বন্ধে বহু জ্ঞান ধারণ করে, কিন্তু প্রতীচী সেই অনুপাতে প্রাচীর অল্প পরিচয় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে তাহাই মনে হয়। কারণ যে সব ভারতীয় পণ্ডিত এই দার্শনিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই বহু বৎসর ইয়োরোপে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন এবং সেই সূত্রে ঐ মহাদেশ সম্বন্ধে নানাপ্রকারের তত্ত্ব এবং তথ্য সঞ্চয় করিয়া স্বদেশপ্রত্যাগমন করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন, মাক্স ম্যুলার,

য়াকোবি, লেভি, উইণ্টারনিৎস, গেল্ডনার এবং পূর্ববর্তী যুগে যে সব ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ভারতবর্ষে বাস করিয়া বহু সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করিয়া উত্তম উত্তম সংস্করণে প্রকাশ করিলেন; কানিংহাম, ফার্গুসন, স্টিফেন, হেভেল ভারতীয় কলা সম্বন্ধে যে প্রকারের গবেষণা করিলেন, সেই তুলনায় কয়জন প্রাচ্য দেশবাসী গ্রীক কিম্বা লাতিন পুস্তকের চর্চা করিয়া ইয়োরোপীয়দিগকে জ্ঞান দান করিয়াছেন? কয়জন ভারতীয় কিম্বা চৈনিক বিদগ্ধ ব্যক্তি ইয়োরোপীয় কলার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রামাণিক এবং সর্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন? ব্যোটলিঙ্ক-রোট্ যে বিরাট সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সেই জাতীয় গ্রীক অভিধান যখন ভারতে রচিত হইবে তখন বুঝিব আমরা সত্যই প্রাতীচ্য বৈদগ্ধ্যের কিঞ্চিৎ সন্ধান পাইয়াছি।

*　　　*　　　*

এই হেমন্ত শিশিরে দেহলি-প্রান্তে যে সব কলা প্রদর্শনী দেখিলাম, তাহার মধ্যে দুইজন চিত্রকরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: শ্রীযুত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত অবনী সেন।

শ্রীযুত অবনী সেন গত সপ্তাহে তাঁহার বিগত কয়েক বৎসরের চিত্রকলা দেহলি-প্রান্তে উপস্থিত করিয়াছেন এবং সেইগুলি দেখিয়া বহু গুণী মুগ্ধ হইয়াছেন।

অবনী সেন সরল এবং অনাড়ম্বর চিত্রকার। তিনি জীবজন্তু, প্রকৃতি, পুরুষ নারী দেখিয়াছেন অতিশয় সযত্নে এবং সেইগুলির প্রকাশ দিয়াছেন নিজস্ব সরল পদ্ধতিতে। শুদ্ধমাত্র মনোরঞ্জন করিবার জন্য কিম্বা 'আর্টিস্টিক' হইবার জন্য তাঁহার চিত্রে কোনো প্রকারের ছলনা নাই। দিল্লী নগরীতে এ বড় বিস্ময়কর বস্তু। সামান্য দুই তিনটি প্রদর্শনী ব্যত্যয়রূপে বিচারাধীন না করিলে অধিকাংশ স্থলেই দেখিয়াছি কেহ করিতেছেন মাতিসের নকল, কেহবা সেজানের, কেহবা ভানগগের। তবুও ঈষৎ সান্ত্বনা পাইতাম যদি ইঁহারা সত্যই পূর্বোল্লিখিত কৃতী পুরুষগণের অনুকরণ করিতেন। আমার মনে হয় ইঁহারা তাঁহাদিগের সত্য বৈশিষ্ট্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই, ইঁহারা অনুকরণ করিয়াছেন এই সব গুণীদের অবান্তর অংশগুলিকে। শুনিয়াছি শিলার নাকি ডেস্কে গলিত আপেল না রাখিলে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। দিল্লীতে প্রদর্শিত অধিকাংশ চিত্রকারের চিত্রে গলিত আপেলের দুর্গন্ধ পাইয়া সন্দেহ হইল ইঁহারা শিলারের অনুকরণ করিয়াছেন,—শিলারের প্রতিভার সন্ধান ইঁহারা পান নাই, কিম্বা বলিব, অশ্বত্থামার ন্যায় পিষ্টতণ্ডুল দর্শনে উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিয়াছেন।

সাহিত্যে এই কর্ম অহরহ হইতেছে—তাহার সন্ধান সকলেই রাখেন, কিন্তু চিত্রে এই দুষ্কর্ম মর্মান্তিকরূপে শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে।

তাই নিবেদন করিতেছিলাম, অবনী সেন কোনো গলিত আপেলের সন্ধানে কালক্ষয় করেন নাই। বিচিত্র পৃথিবীকে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, সেই দর্শন তাঁহার হৃদয়ে যে অনুভূতি যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, তিনি তাহারই প্রকাশ দিয়াছেন কোনো প্রকারের ছলনা না করিয়া।

এই প্রশস্তিই যথেষ্ট।

* * *

কলিকাতা মহানগরী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বৈদেশিকদের যে সব প্রতিমূর্তি আমাদিগের নগরে নগরে বিরাজ করিতেছে ইহাদিগকে লইয়া আমাদের কর্তব্য কি? এই প্রশ্ন দিল্লীতেও উপস্থিত হইয়াছে।

কেহ বলিতেছেন, এইগুলিকে কোন যাদুঘরে রাখিয়া দেওয়াই প্রশস্ততম পন্থা।

কেহ বলিতেছেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণের মূল্যবান তথ্য আহরণের সূত্র বিনষ্ট করা হইবে।

কেহ বলিতেছেন, এইগুলি স্থানান্তর করিতে যথেষ্ট অর্থব্যয় হইবে এবং যে বিরাট ভাণ্ডার ইহাদিগের জন্য নির্মাণ করিতে হইবে তাহার জন্য অর্থব্যয় এক গৌরী সেনেই সম্ভবে।

কেহ বলিতেছেন, এইগুলিকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দাও। ইঁহারা ইংলণ্ডের 'কৃতী' সন্তান; স্ব স্ব নগরে ইঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় এবং প্রাতর্দর্শনীয় হইয়া বিরাজ করুন।

এক ইন্দোনেশিয়ান বান্ধব আমাকে একাধিকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "আপনারা বৈদেশিকদের এই প্রতিমূর্তিগুলি সহ্য করিতেছেন কেন?"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "আপনারা ওলন্দাজ প্রতিমূর্তিগুলির কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?"

মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "দণ্ডাধিককাল মধ্যেই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছি।"

* * *

স্বীকার করি বৈদেশিকের প্রতি কিম্বা তাহাদের প্রতিমূর্তির প্রতি আমার এইরূপ জাতক্রোধ সহজে উপজাত হয় না। ভিনাস কিম্বা মজেসের প্রতিমূর্তি দেখিয়া আমি আনন্দ পাই, কোনো প্রকারের ক্রোধ চিত্তকোণ স্পর্শ করে না।

কিন্তু এই প্রতিমূর্তিগুলি যে অত্যন্ত কুৎসিত। যত দিন পর্যন্ত এই প্রতি-মূর্তিগুলি নগরে নগরে বিরাজমান থাকিবে ততদিন আমাদের ভবিষ্যৎ ভাস্করদের সুরুচি নির্মাণের পক্ষে ইহারা নিদারুণ অন্তরায়—"ফিল্মী গানা" যেরূপ ইয়োরোপীয়

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গ্রহণের পক্ষে অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যেরূপ ভারতীয় স্থপতির রুচি-বিকার ঘটাইতেছে। কিন্তু হায়, ফিল্মী গানা বন্ধ করিবার উপায় নাই, মেমোরিয়াল ধূলিসাৎ করিই বা কি প্রকারে।

ঐতিহাসিকেরা যে এই প্রতিমূর্তিগুলি হইতে বহুতর গবেষণার উপাদান পাইবেন সে কথা স্বীকার করি না, কিন্তু এ তথ্য অনস্বীকার্য যে, ইহাদের জন্য ভাণ্ডার নির্মাণ করা অর্থের অতিশয় অন্যায় অপব্যয়।

* * *

ইঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন কিনা সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য, ইংলণ্ড মাতা ইঁহাদিগকে আপন বক্ষে স্থান দিবেন কি?

কারণ একদা একখানা বিরাট ইংলণ্ডীয় কামান—সেই কামান এই দেশে নাকি বহু শৌর্যবীর্য দেখাইয়াছিল—কোনো এক ইংরেজ মহাপ্রভুর উৎসাহে স্বনগরে প্রেরিত হয় এবং নগরের মধ্যবর্তী উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরবাসিগণ সেই বিকটদর্শন কামান দেখিয়া তদ্দণ্ডেই সেই চক্ষুশূলকে অপসারণ করিবার জন্য তারস্বরে চিৎকার করে। বহু প্রকারে তাহাদিগকে বলা হইল, এই ভুবনবিখ্যাত কামান ভারতের অমুক দুর্গের প্রাচীর ভগ্ন করিতে সহায় হইয়াছে, অমুক নগরে শত শত ইংরেজের প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে; এই কামানের জন্মস্থল এই নগর, অতএব এই নগর ইহাকে সম্মান না করিলে ইহার উপযুক্ত সম্মান করিবে কে?

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। নাগরিকগণ দুর্যোধনের ন্যায় সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি দানে অনিচ্ছুক এবং কতিপয় পাষণ্ড বলিল, এই কামানের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং এই কামান কোথায় কোন্ অপকর্ম করিয়াছে তাহার লুপ্ত ইতিহাস জানিবার জন্য তাহারা কিছুমাত্র ব্যগ্র নহে।

অতএব আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি এই প্রতিমূর্তিগুলিকে ইংলণ্ডকে সহৃদয়তার সঙ্গে দান করি তবে তাহারা সেগুলি স্বব্যয়ে লইয়া তো যাইবেই না, পরন্তু করুণকণ্ঠে বারম্বার নিবেদন করিবে, 'আপনারা না মহাত্মাজীর শিষ্য; আমাদিগের গত অপরাধের জন্য কি এই প্রকারের নৃশংস প্রতিহিংসা লইতে হয়?'

অতএব সেই শর্করায়ও মৃত্তিকা।

২০

যাঁরা ভালো করে পৃথিবীর ইতিহাস পড়েছেন তাঁরা খাঁটি খবর দিতে পারবেন, আমি সামান্য যেটুকু পড়েছি, তার থেকে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে মহাত্মাজীর মত

মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় জন্মাননি।

বুদ্ধদেবকে কোনো ব্যাপক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়নি, খৃষ্টের সামনে যে রাজনৈতিক সমস্যা এসে পড়েছিল (ইহুদীদের পরাধীনতা) তিনি তার সম্পূর্ণ সমাধান করেননি ; শ্রীকৃষ্ণ এবং মুহম্মদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করার আদেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই চার মহাপুরুষকেই কোটি কোটি লোক শত শত বৎসর ধরে স্বীকার করে নিয়ে জীবনযাত্রার পথ খুঁজে পেয়েছে কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস মহাত্মাজী যে বুদ্ধ এবং খৃষ্টের অহিংস পন্থা নিয়ে যে রাজনৈতিক সফলতা লাভ করেছিলেন এ জিনিস পৃথিবীতে পূর্বে কখনো হয়নি। প্রেম দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে হিংসার উপর জয়ী হওয়া যায় এ-কথা পৃথিবী বহু পূর্বেই মেনে নিয়েছিল কিন্তু অস্ত্রধারণ না করে রাজনীতির ক্ষেত্রেও যে জয়ী হওয়া যায় সেই অবিশ্বাস্য সত্য প্রমাণ করে গিয়েছেন মহাত্মাজী। আমার ভয় হয়, একদিন হয়ত পৃথিবী বিশ্বাস করতেই রাজী হবে না যে মহাত্মাজীর প্রেম ইংরেজের বর্বর সৈন্যবলকে পরাজয় করতে সক্ষম হয়েছিল। অবিশ্বাসী মানুষ আজ স্বীকার করে না যীশু মৃতকে প্রাণ দিয়েছিলেন ; পাঁচশ বছর পরের অবিশ্বাসী দুটোকেই হয়ত এক পর্যায়ে ফেলবে।

* * *

পাঠক হয়ত জিজ্ঞেস করবেন, মহাত্মাজী রাজনৈতিক ছিলেন ; তিনি কোনো নবীন ধর্ম প্রচার করে যাননি। তবে কেন তাঁকে ধর্মগুরুদের সঙ্গে তুলনা করি।

নবীন ধর্ম কেন সৃষ্টি হয় তার সব কটা কারণ বের করা শক্ত কিন্তু একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি। কি বুদ্ধ কি খৃষ্ট সকলকেই তাঁদের আপন আপন যুগের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধান করে নিতে হয়েছিল। এ বিষয়ে পিথৌরার চর্চা বড়ই অগভীর—সে কথা পাঠককে আবার জানিয়ে রাখছি।

বুদ্ধদেবের সময় উত্তর ভারতবর্ষের বনবাদাড় প্রায় সাফ হয়ে গিয়েছে এবং ফলে আশ্রমবাসীগণ নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিলেন। সঙ্ঘ নির্মাণ করে তাঁদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা বুদ্ধদেবকে করে দিতে হয়েছিল। 'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, তোমা সবাকার ঘরে ঘরে'—অর্থাৎ যৌথ পদ্ধতিতে বিরাট প্রতিষ্ঠান (সংঘ) নির্মাণ ভারতে এই প্রথম। দ্বিতীয়তঃ তখন প্রদেশে প্রদেশে এত মারামারি হানাহানি যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো করে প্রসার পাচ্ছিল না। শ্রমণগণ এসব উপেক্ষা করে শান্তির বাণী নিয়ে সর্বত্র গমনাগমন করার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক অন্তরায় দূর হয়। তাই শ্রেষ্ঠীরা সব সময়ই সংঘের সাহায্যের জন্য অকাতরে অর্থ দিয়েছেন।

খৃষ্ট ইহুদীদের স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। তবে তাঁর পন্থা ছিল ইহুদীদের নৈতিকবলে এতখানি বলীয়ান করে দেওয়া, যাতে করে পরাধীনতার নাগপাশ নিজের থেকে ছিন্ন হয়ে যায়—অরবিন্দ ঘোষও পণ্ডিচেরীতে এই মার্গেরই অনুসন্ধান করেছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু কুরুপাণ্ডবের যোগসূত্র স্থাপনা করার জন্য কূটনৈতিক দূত তাই নন, শেষ পর্যন্ত তিনি পাণ্ডববাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদও গ্রহণ করেছিলেন।

মুহম্মদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আরবের যুযুধান, ছিন্নবিচ্ছিন্ন বেদুইন উপজাতি-গুলোকে এক করে শক্তিশালী জাতি গঠন করা।

মহাত্মাজীকে সবাই রাজনৈতিক হিসেবে মেনে নিয়েছেন কিন্তু পৃথিবীর মহা-পুরুষদের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁকে ধর্মগুরু বলে স্বীকার করে নিলেই ঠিক হবে।

*　　　*　　　*

প্রশ্ন উঠতে পারে তাই যদি হয়, তবে মহাত্মাজী কোনো নবীন ধর্ম প্রবর্তন করে গেলেন না কেন?

সে তো খৃষ্টও করে যাননি। খৃষ্ট তিরোধানের বহু বৎসর পর পর্যন্তও তাঁর অনুচরগণ বুঝতে পারেননি যে তাঁরা এক নবীন ধর্মের প্রদীপ হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। রামমোহন, নানকও দেখা দিয়েছিলেন ধর্মসংস্কারক রূপে,—তাঁরা বীজ রোপণ করে গিয়েছিলেন,—শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হল নবীন ধর্ম পরবর্তী যুগে।

মহাত্মাজীর নবীন—অথচ সনাতন—ধর্ম প্রবর্তিত হতে সময় লাগবে।

সেই 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি!'

*　　　*　　　*

গল্প শুনেছি এক গুরু যখন বুঝতে পারলেন তাঁর এক নূতন শিষ্য একদম গবেট তখন তাকে উপদেশ দিলেন বিদ্যাচর্চা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করতে। শিষ্য প্রণাম করে বিদায় নিল।

বহু বৎসর পরে গুরু যাচ্ছিলেন ভিন গাঁর ভিতর দিয়ে। একটি আধাচেনা লোক এসে নিজের পরিচয় দিয়ে গুরুকে আপন বাড়িতে নিয়ে গেল। সেই গবেট শিষ্য। গুরু তার যত্ন পরিচর্যায় খুশী হয়ে শুধালেন, "তা বাবাজী আজকাল কি করো?"

শিষ্য সবিনয় বলল, 'টোল খুলেছি।'

গুরুর মস্তকে এটম বোমাঘাত! খানিকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে শুধালেন, 'তা কি পড়াও?'

শিষ্য বলল, 'আজ্ঞে সব কিছুই, তবে ব্যাকরণটা পড়াইনে।'

গুরু আরো আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সে কি কথা? আমার যতদূর মনে পড়ছে তুমি তো ব্যাকরণটাই একটুখানি বুঝতে।'

শিষ্য বললে, 'আজ্ঞে, তাই ওটা পড়াতে একটুখানি বাধো বাধো ঠেকে।'

*　　　*　　　*

রায় পিথৌরা যে সর্ববাবদে এই শিষ্যটির মত সে কথা আর লুকিয়ে রেখে লাভ কি? এই দেখুন না, দিনের পর দিন সে সম্ভব অসম্ভব কত বিষয়ে কত 'তত্ত্ব কথাই' না বেহায়া বেশরমের মত লিখে যাচ্ছে। কারণ? কারণ আর কি? সর্ববিষয়ে যার চৌকশ অজ্ঞতা তার আর ভাবনা কি?

কিন্তু প্রশ্ন গবেট শিষ্য কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ জানত বলে ঐ বিষয়ে পড়াতে তার বাধো বাধো ঠেকত। পিথৌরার কি সে রকম কোনো কিছু আছে?

সেই তো বেদনা, সুশীল পাঠক, সেই তো ব্যথা।

মা সরস্বতী সম্বন্ধে কোনো কিছু লিখতে বড় বাধো বাধো ঠেকে। চতুর্দিকে গণ্ডা গণ্ডা সরস্বতী পূজো হয়ে গেল। আমি গা-ঢাকা দিয়ে, কিম্বা পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি।

আর কোনো দেবতার সেবা করার মত সুবুদ্ধি আমার হয়নি—প্রথম জীবনে মা সরস্বতীই আমার স্কন্ধে ভর করেছিলেন আর আমি হতভাগা তাঁর সেবাটা কায়মনোবাক্যে করিনি বলে আজ আমার সব কিছু ভণ্ডুল বরবাদ হয়ে গিয়েছে। এখন মা সরস্বতীর দিকে মুখ তুলে তাকাতেও ভয় করে। হায়, দেবীর দয়া পিথৌরার প্রতি হয়েছিল, কিন্তু মূর্খ তাঁকে অবহেলা করে আজ এই নিদারুণ অবস্থায় পড়েছে।

*　　　*　　　*

হায়, আমি যদি আজ আমার এক বন্ধুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে পারতুম,

"নিতান্ত বালক যবে পুরাণের দেব-সভাস্থলে
চুপে চুপে দেখিয়াছি ইন্দ্র যম বরুণের গলে
মন্দারের মালা আর হস্তে নানা রতন সম্পদ—
বৈভব সৌন্দর্য কত। অপরূপ নর্ম লঘুপদ
উর্বশীর সম্মোহনী ইন্দ্রজাল নৃত্যচ্ছন্দময়
শুনেছি সুরের কণ্ঠে হর্ষধ্বনি আর জয় জয়।
লক্ষ্মীর বৈভব হেরি নিষ্কম্প তরুণ আঁখি মম,
মহেন্দ্র-অঞ্চলার পশ্চাতে ফিরিছে ছায়াসম।

হে পিথৌরা, আজি আমি লজ্জা নাহি মানি,
মুগ্ধ মোরে করেছিল সর্বাধিক শ্বেত বীণাপাণি।
কি মন্ত্রে সে ভানুমতী বালকের চিত্তাসনখানি
জয় করে নিয়েছিল; মর্ম তার আজও নাহি জানি।

* * *

ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশের প্রধান দার্শনিক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর কত যে এবং কী অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তার সন্ধান বাঙলা দেশ আজ আর রাখে না। অথচ সমসাময়িক যুগে বাঙলার জ্ঞান দর্শন-শাস্ত্র চর্চার উপর তিনি যে গভীর প্রভাব রেখে গিয়েছেন তা সে সময়ের যে কোনো লেখকের রচনা থেকে বোঝা যায়।

সেই দার্শনিককে একব্যক্তি বলেন, 'আপনার মত পাণ্ডিত্য বাঙলাদেশের কারো নেই—একমাত্র আপনিই বাঙলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দে কবিতা লিখতে সক্ষম।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ আপন পাণ্ডিত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে একখানি চতুষ্পদী মন্দাক্রান্তায় লেখেন।

ইচ্ছা সম্যক জগ দরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিকলি মন উড়ু উড়ু
এ কি দৈবের শাস্তি
টঙ্কা দেবী করে যদি কৃপা
না রহে কোনো জ্বালা
বিদ্যাবুদ্ধি কিছু না কিছু না
শুধু ভস্মে ঘি ঢালা।

দ্বিজেন্দ্রনাথেরই যখন এই অবস্থা তখন আর আমাদের ভাবনা কি?

জয় মা বীণাপাণি!

২১

স্বরাজ পাওয়ার পর একটা পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সেটা কেউই লক্ষ্য করছেন না কারণ জিনিসটা চট করে চোখে পড়ে না।

স্বরাজ লাভের পূর্বে খুব কম বিদেশী ছেলেই ভারতে পড়াশোনা করতে আসত। পাঠক হয়ত আশ্চর্য হয়ে বলবেন, 'সেই তো স্বাভাবিক; আমাদের যে শিক্ষা-ব্যবস্থা তার থেকে তো সুস্থ মানুষ দূরে থাকতেই চাইবে। এদেশে আবার পড়াশোনা

করতে আসবে কে? টাকা থাকলে আমরাই আমাদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে পড়াশোনা করতে পাঠাই।'

কথাটা খুব ঠিক। বাঘা বাঘা যে সব ন্যাশনালিস্টরা 'ভারতীয় ঐতিহ্য' 'ভারতীয় কৃষ্টি'র জিগির গেয়ে সভাস্থল গরম করে তোলেন তাঁরা পর্যন্ত ছেলেমেয়েকে বিদেশী ঐতিহ্যের ইস্কুল-কলেজে পড়াবার জন্য তাদের অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ পাঠান।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিদেশী ছেলেরা ভারতে পড়তে আসে। তার প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং পদ্ধতি যতই খারাপ হোক না কেন আমাদেরই মত কু-ব্যবস্থা মেলা প্রাচ্য দেশে এখনো মজুদ এবং আমাদের চেয়েও অধম ব্যবস্থা কোনো কোনো দেশে আছে।

* * *

মিশরের শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় এদেশেরই মত। তাই মিশরের লোক যদি এদেশে কালেভদ্রে আসে, তবে খুব বেশী আশ্চর্য হওয়ার কথা নয়। অবশ্যই মিশরীয়রা এদেশে আরবী পড়তে আসবে না—আমরা যে রকম সংস্কৃত পড়ার জন্য মক্কা কিম্বা মদিনায় যাইনে। তাই যে মিশরী ছেলেটি এসেছে সে শিখতে চায় মোগল-চিত্রকলার ইতিহাস।

উপযুক্ত গুরুর হাতে পড়েছে; কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলুম, ইতোমধ্যেই বেশ খানিকটা উন্নতি করতে পেরেছে।

* * *

আমার বিশ্বাস আমাদের চেয়েও অনুন্নত কিম্বা আমাদের মত দুর্ভাগা দেশের ছেলেরা প্রধানতঃ আসবে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি ইত্যাদি শিখতে—কিছুদিন পূর্বে শুনতে পাই, ইরান থেকে নাকি কিছু ছেলে আসবে কৃষি-বিদ্যা শিখতে। এবং তারপর আসবে আমাদের চারুকলার নিদর্শন দেখতে এবং তার ইতিহাস শিখতে। সাহিত্য বা দর্শন শিখতে যে বেশী ছেলে আসবে না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ কারণ সংস্কৃত শেখার ব্যবস্থা ভারতের বাইরে প্রাচ্য দেশে নেই বললেও চলে, তাই তারা সে বাবদে প্রাথমিক উৎসাহ পাবে না এবং দর্শনের চর্চা আজ পৃথিবীর সর্বত্রই কমে আসছে।

কিন্তু চারুকলা সম্বন্ধে সকলেরই কৌতূহল ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে কাইরো আনকারায় যে ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনী খোলা হয় সেগুলোতে বিস্তর লোক এসেছিল এবং প্রেস সেগুলোর প্রচুর সুখ্যাতি করেছে। (কাইরোতে গত বৎসর ভারতীয় নর্তক-নর্তকীরা রাজার মত সম্মান এবং রাজ-সম্মানও পেয়েছিলেন)।

শুধু তাই নয়, ওরাও আমাদের দেখাতে চায়। কিছুদিন পূর্বে ইন্দোনেশী চারুকলা প্রদর্শনী দিল্লীতে হয়ে গেল সে কথা সকলেই জানেন। আর রুশকে যদি আধা-প্রাচ্য জাত বলা হয়, তবে রুশ কলা-প্রদর্শনীর কথাও স্মরণ করতে হয়।

*　　　*　　　*

এই যে মিশরি ছেলেটি এসেছে মোগল চিত্রকলার ক্রমবিকাশের ইতিহাস শিখতে, এরপর আসবে আরো ছাত্র আমাদের প্রাচীনতর চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য শিখতে।

কিন্তু এ সব পড়াবার ব্যবস্থা আমাদের ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে? এই যে সব ছেলেরা আসছে এবং আসবে তারা যখন দেখবে আমাদের সাধারণ শিক্ষিত লোক আমাদের চারুকলার কোনো মর্মই বোঝে না, কোনো তত্ত্ব রাখে না তখন তারা ভাববেই বা কি?

এদিকে নিমন্ত্রিতেরা এসে পড়েছেন ওদিকে রান্নার কোনো প্রকার আয়োজন নেই। 'আরেক ছিলিম তামাক ইচ্ছে করুন',—অর্থাৎ টালবাহানা দিয়ে—আর কতক্ষণ এদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

*　　　*　　　*

এই সম্পর্কে পণ্ডিতবর আবু রয়হান মুহম্মদ বিন্ আহম্মদ অল বীরূনীর নাম মনে পড়ল।

কয়েকদিন পূর্বে কলকাতায় তাঁর সহস্রতম জন্মোৎসব হয়ে গেল। ইরান আফগানিস্থান আরো নানাদেশে এ উৎসব সমাধা হচ্ছে।

অল বীরূনী ছিলেন ফিরদৌসির মত গজনীর মাহমুদের সভাপণ্ডিত। ফিরদৌসির নাম অনেক বাঙালী শুনেছেন—যখন বাঙলা দেশে ফার্সী চর্চা ছিল তখন এক বাঙালী কবি ফিরদৌসি মাহমুদকে গালাগাল দিয়ে যে কবিতা লিখেছিলেন তার অনুবাদ পর্যন্ত করেন:—

রাজা যদি হইতেন রাণীর কুমার
মণিময় তাজ শিরে দিতেন আমার।

অল বীরূনী সম্বন্ধে এক বাঙালী লেখক লিখেছেন:—

"মাহমুদের ইতিহাস নূতন করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর সভাপণ্ডিত অল বীরূনীর কথা বাদ দেবার উপায় নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে ছয়জন পণ্ডিতের নাম করলে অল বীরূনীর নাম করতে হয়। সংস্কৃত-আরবী অভিধান ব্যাকরণ সে যুগে ছিল না (এখনো নেই), অল বীরূনী ও ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে

কোনো মাধ্যম ভাষা ছিল না। তৎসত্ত্বেও এই মহাপুরুষ কি করে সংস্কৃত শিখে, হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, কাব্য, অলঙ্কার, পদার্থবিদ্যা রসায়ন সম্বন্ধে 'তহকীক-ই-হিন্দ্' নামক বিরাট গ্রন্থ লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন সে এক অবিশ্বাস্য প্রহেলিকা।

'একাদশ শতাব্দীতে অল-বীরূনী ভারতের সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ লিখেছিলেন—প্রত্যুত্তরে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় আফগানিস্থান (ইরান) সম্বন্ধে পুস্তক লেখেননি। এক দারাশীকুহ ছাড়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ আরবী ও সংস্কৃতে এ রকম অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাতে পারেননি।'

এতে কিছুই বলা হল না।

ভালো করে বলবার জন্য যে জায়গার প্রয়োজন তাও এখানে নেই। তাই শুধু অল-বীরূনী যে সব সংস্কৃত বই পড়ে তাঁর কেতাব লিখেছিলেন তার কয়েকটির নাম দেওয়া হল :—

সাংখ্য, পাতঞ্জল, গীতা, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্য পুরাণ, বায়ু পুরাণ, আদিত্য পুরাণ, পুলিস সিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, খণ্ডখাদ্যক, উত্তর খণ্ডখাদ্যক, বৃহৎ সংহিতা সিদ্ধান্তিকা, বৃহৎ জাতকং, লঘু জাতকং, করণসার, করণতিলক।

অনেকের মনে হতে পারে অল-বীরূনী হয়ত ক্রীশ্চান মিশনারিদের মত হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু ধর্মকে নিন্দা করার জন্য তাঁর বই লিখেছিলেন। তাই তাঁর ভাষাতেই বলি।

'এ বই তর্কাতর্কির বই নয়। হিন্দুদের কাছ থেকে শুধু সে সব সিদ্ধান্তই আমি তুলিনি যেগুলো যুক্তি দিয়ে ভুল প্রমাণ করা যায়। বরঞ্চ বলি, আমার পুস্তকখানিতে শুদ্ধমাত্র তাদের তত্ত্ব ও তথ্যের ঐতিহাসিক বর্ণনা দেওয়া হল। হিন্দুদের বিশ্বাস ও চিন্তার আমি হুবহু বর্ণনা দেব এবং পরে গ্রীকদের বিশ্বাস ও চিন্তার উল্লেখ করে দেখাব এই দুই জাতের মধ্যে মিল রয়েছে।'

আশ্চর্য! ১০৩০ খৃষ্টাব্দে লোকটি গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের মিল দেখতে পেয়েছিলেন!

* * *

রায় পিথৌরা ভয়ঙ্কর বেরসিক লোক আমি ঠিক বুঝে গিয়েছি। 'মিস্ কলকাতা অর্থাৎ শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমানকে রায় পিথৌরা চেনে তার বিয়ের পর থেকেই অথচ তার মনে কখনো সন্দেহ জাগেনি যে এঁর সৌন্দর্য এমনই মারাত্মক রকমের যে ইনি একদিন সুন্দরীদের মধ্যে কুতুব মিনার হয়ে উঠবেন।

তবে হাঁ, ইন্দ্রাণীকে নিয়ে রাস্তায় বেরুলেই লক্ষ্য করতুম পথচারীরা আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। একদিন ইন্দ্রাণীকে বললুম, 'তোমাকে নিয়ে রাস্তায় বেরনো মুশকিল। সবাই কি রকম প্যাট প্যাট করে তাকায়। অস্বস্তি বোধ হয়।'

ইন্দ্রাণী বললে, 'ছোঃ! আমার দিকে তাকাবে কেন? তাকাচ্ছে তোমার দিকে।'

!!! বলে কি! তবে হাঁ, ইন্দ্রাণীর সৌন্দর্যের পরই কলকাতায় সে যুগে দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল রায় পিথৌরার গগনচুম্বী পাতালস্পর্শী টাক।

এর থেকে বোঝা গেল, ইন্দ্রাণীর বুদ্ধি আছে। ক্যাসা কায়দায় আপন বিনয় আর ভদ্রতা দেখিয়ে দিল।

কিন্তু আমার বিশ্বাস ইন্দ্রাণীর রূপের চেয়ে গুণ অনেক বেশী।

ইন্দ্রাণী বহু পরিশ্রম আর অনেক সাধনা করে উত্তম ভরত নাট্য শিখেছে। আসছে বার নাচ দেখালে 'মিস্ কলকাতাকে' মিস করবেন না।

* * *

সেদিন এক অবাঙালী পিথৌরাকে ধাঁতিয়ে গেলেন। পিথৌরা নাকি বড্ড বেশী 'বাঙালী' 'বাঙালী' বলে চ্যাঁচাচ্ছে।

আরে বাপু, রায় পিথৌরা কে এমন কেষ্ট-বিষ্টু যে তার চিৎকারে কারো কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হবে?

একটা গল্প মনে পড়ল।

পূর্ব বাঙলার গয়না নৌকো ঘাটে ভিড়তেই ভাড়াটেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সব জায়গা দখল করে নিল। একটা চাষা ধরনের লোক কিছুতেই ঢুকতে না পেরে ছইয়ের বাইরে সেই হিমে বসে রইল।

জায়গা দখলপর্ব শেষ হতে ভিতরে আলাপচারি আরম্ভ হয়েছে।

'আপনার নাম?'

'আজ্ঞে, তারাপদ হালদার। আপনার?'

'আজ্ঞে কেষ্টবিহারী পাল।'

তৃতীয় ব্যক্তিকে, 'আর আপনার?'

'আজ্ঞে শশধরচন্দ্র গুণ।'

করে করে নৌকোর ভিতরকার সকলের চেনাশোনা শেষ হল। তখন এক মুরুব্বী বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার নামটা তো জানা হল না, বাবাজীবন।'

লোকটি অতিশয় সবিনয় বললে, 'আজ্ঞে, আমার নাম,—আজ্ঞে আমার নাম

পাঁচকড়ি বৈঠা।'

'বৈঠা! এ আবার কি বিদঘুটে পদবী রে বাবা! বাপের জন্মে শুনিনি।'

লোকটি আবার বৈষ্ণবতর বিনয়ে বলল, 'আজ্ঞে, আপনারা,—হালদার, পাল, গুণ সব নৌকোর ভিতরে বসে আছেন। নৌকো চালাবে কে? তাই আমি বৈঠা একা একাই নৌকো চালাচ্ছি।'

বাঙালী কেষ্টবিষ্টুরা নৌকোর ভিতরে বসে আপন ধান্দায় মশগুল। তাই রায় পিথৌরা বৈঠা হরবকৎ চেল্লাচেল্লি করে।

২২

পিথৌরাকে ধমক দেওয়া হয়েছে, তিনি কেন মাঝে মাঝে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় একই মাল পরিবেষণ করেন।

উত্তরে নিবেদন, আগাগোড়া একই বস্তু পিথৌরা দুই কাগজে কখনো লেখেন না। তবে মাঝে মাঝে দু-একটি বিষয় এমনই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় যে, তখন সেগুলো উভয় কাগজে উল্লেখ না করে থাকা যায় না।

এই ধরুন, কাল যদি ওখলায় বেড়াতে গিয়ে দেখি, যমুনার জল উজান বইছেন—পদাবলীতে এরকম অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু স্বচক্ষে কখনো দেখিনি—তাহলে সে ঘটনার বয়ান কি উভয় কাগজেই দেওয়া উচিত নয়? আমার ক'জন পাঠক আর 'আনন্দবাজার' 'হিন্দুস্থান' দুটোই পড়েন যে, এরকম একটা ঘটনা একদলকে বিলকুল জানাবো না?

যাঁরা বাঙলায় রায় পিথৌরা পড়তে পারেন, তাঁরা যে কোন্ দুঃখে ইংরিজিতে পড়েন, তা-ও তো বুঝতে পারিনে। রস আর আড্ডা জমাবার জন্য ইংরিজি কি একটা ভাষা!

* * *

এই ধরুন, গেল সপ্তায় এখানে যা হল সে অভূতপূর্ব।

রাষ্ট্রপতি ভবনে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চারজন একনিষ্ঠ সাধককে স্বহস্তে চারখানা শাল গলায় পরিয়ে দিলেন। দিল্লী শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের ওস্তাদ ইহুদী মেনুহীনও আনন্দের আতিশয্যে ঘন ঘন করতালি দিচ্ছিলেন।

'রাষ্ট্রপতি ভবন' বলাতে ঘটনার পরিবেশ ঠিক ঠিক ওৎরালো না। যদি বলতুম, 'ভাইসরিগেল লজে' কাণ্ডটা ঘটলো তাহলে পাঠক খানিকটা আমেজ করতে পারতেন। কারণ বড়লাট আদরকদর করতেন, তাঁরই জাতভাই সায়েব-

সুবোদের কিংবা রাজা-রাজড়াদের।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর পরনে ছিল কুর্তা আর পাজামা—মাথায়ও কাপড়ের টুপি। এ বেশ পরে 'ভাইস'দের আমলে ওস্তাদজী নিশ্চয়ই সেখানে আমল পেতেন না, সম্মান পাওয়ার কথা দূরে থাক—সে খেয়ালি পোলাও খেতে যাবেন না।

সাদাসিধে কাপড়-জামা-পরা ওস্তাদ আলাউদ্দীন সাহেব যখন শাস্ত মুখচ্ছবি নিয়ে রাষ্ট্রপতির সামনে দাঁড়ালেন, আর তিনি সহাস্যবদনে ওস্তাদের কাঁধে শাল রাখলেন, তখন আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে বলি, 'সাধু, সাধু, সাধু!'

'সাধু, সাধু' বলার রেওয়াজ এখনো এদেশে ফের চালু হয়নি, কিন্তু সে নিয়ে আমার মনে কোনো আক্ষেপ নেই। সভাস্থলে যা করতালি-ধ্বনি উঠলো, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, দেশের লোক ভারী খুশী আমাদের অনাদৃত অবহেলিত গুণীরা যে রাজ-সম্মান পেলেন। রাষ্ট্রপতিকে আমি বহু জায়গায় বহু সার্টিফিকেট-সনদ দিতে দেখেছি, কিন্তু এই চারজন ওস্তাদকে সম্মান দেখাবার সময় তাঁর মুখে যে আনন্দ ফুটে উঠেছিল, তার থেকে বোঝা গেল, তিনিও ওস্তাদদের সম্মান দেখাতে পেরে খুশী হয়েছেন। এবং সত্যই তো, শুধু যে ওস্তাদরা সম্মানিত হলেন তাই নয়, এঁদের সম্মান দেখিয়ে রাষ্ট্রও তো সম্মানিত হল।

* * *

আলাউদ্দীন সাহেব অতিশয় নিরভিমান ও ধর্মভীরু লোক। তিনি শান্ত মুখে দাঁড়িয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে কি কোনো তোলপাড় চলছিল না? প্রথম যৌবনে যেদিন তিনি মা সরস্বতীকে বরণ করে নিয়েছিলেন, সেদিন কি তিনি আশা করতে পেরেছিলেন যে, এমন দিনও আসবে, যখন তিনি রাষ্ট্রপতির স্বহস্তে সম্মানিত হবেন? আজীবন তো তিনি দেখলেন উচ্চাঙ্গ সংগীতের লাঞ্ছনা অবমাননা। বরঞ্চ তাঁর বাল্যকালে সে সঙ্গীতের অনেকখানি কদর ছিল, তারপর ষাট-সত্তর বৎসর ধরে তিনি তাঁর চোখের সামনে দেখলেন, কত ওস্তাদ না খেয়ে মারা গেলেন, কত মেধাবী তরুণ উৎসাহের অভাবে আপন প্রতিভার বিকাশ করতে পারল না। ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে সর্বস্বান্ত হওয়ার নিদারুণ বেদনা অনেক সাংসারিক লোকই জানেন, কিন্তু এখানে তাঁর চোখের সামনে যা গেল, সে তো তাঁর আপন বিত্ত নয়—যুগ-যুগ সঞ্চিত তাবৎ দেশের সঞ্চিত সঙ্গীত-সম্পদ যে তাঁর চোখের সামনে ভেসে গেল।

না, তা তো নয়। আলাউদ্দীন সাহেবের আজ বড় আনন্দ, ভারতীয় সঙ্গীত

আর লোপ পাবে না। রাষ্ট্রের, দেশের, দশের সকলেরই সস্নেহ দৃষ্টি পড়েছে ওস্তাদের উপর, অর্থাৎ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উপর।

*　　*　　*

ওস্তাদ মুশ্‌তাক হুসেন খানও অতিশয় বিনয়ী লোক কিন্তু তিনি অত্যন্ত প্রাণবন্তও বটেন। রাজ-সম্মান পেয়ে তাঁর মুখে দন্ত ফুটে ওঠেনি, তিনি হলেন উল্লসিত এবং অভিভূত।

তাই তিনি যখন গান গাইতে আরম্ভ করলেন, তখন তাঁর গলা দিয়ে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আর সে কী গলা—ওঠানো-নামানোর কায়দা! উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, আকাশ-পাতাল সব দিক থেকে তিনি যেন টেনে এনে নয়া নয়া ধ্বনি নয়া নয়া সুর আপন গলার ভিতর দিয়ে বের করতে লাগলেন। কখনো গম্ভীর উচ্চকণ্ঠে—সে কণ্ঠ নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মত যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেলুম—আর কখনো যেন নির্ঝরিণীর গতিবেগের মত, কখনো আবার তাঁর গলা থেকে মারবেলের গুলীর মত গোল গোল তানের সারি পিল পিল করে বেরুতে লাগল।

আর কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা! ঘন ঘন শাকরেদদের দিকে তাকান, ভাবখানা এই, 'পছন্দ হচ্ছে তো'? সমের সময় তবলচির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসির ইশারা মারেন, আদর দেখিয়ে তাম্বুরাওলার কাঁধে কাঁধ রেখে স্বর যাচাই করে নেন, আর মাঝে মাঝে দু' হাত দিয়ে কানের ডগা ছুঁয়ে আপন অশরীরী ওস্তাদের সামনে যেন নিজের অপূর্ণতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছেন।

বহু বাঘা ওস্তাদের মজলিসে শাকরেদদের বিবর্ণমুখে বসে থাকতে দেখেছি। মেহেরবান মুশ্‌তাকের সামনে তারা আনন্দে ফেটে পড়ার উপক্রম। গুরুর দিকে তারা তাকাচ্ছিল যেন শ্রীরাধা গোপীজনবল্লভের দিকে তাকাচ্ছেন।

ওস্তাদ মুশ্‌তাকের চেয়েও ভালো ওস্তাদের গান আমি শুনেছি, কিন্তু ওরকম প্রাণবন্ত, সচল রঙ্গে রঙ্গে রঙ্গিমা সঙ্গীত আমি পূর্বে কখনও শুনিনি।

*　　*　　*

দাক্ষিণাত্যের আইয়ার ওআয়াঙ্গারকে দেখেই মনে হল, এঁরা দুজনই অতিশয় ধর্মভীরু সজ্জন। দক্ষিণের ব্রাহ্মণবাড়ীতে থাকার সুযোগ আমার জীবনে বহুবার হয়েছে। সঙ্গীতের প্রতি তাঁদের অনুরাগ গৃহদেবতার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

বিশ্বাস করবেন না, দক্ষিণের এক আইয়ার ব্রাহ্মণের বাড়িতে সঙ্গীতোৎসবের শেষে পাঁচটি (একটি নয়, দুটি নয়, পাঁচটি) তামিল কন্যাকে আগাগোড়া 'জনগণমন অধিনায়ক' গাইতে শুনলুম। হাতে তাদের গানের বই ছিল না; তবু 'রাত্রি

প্রভাতিল' শেষ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত তারা একবার মাত্র না থেমে গড়গড় করে গেয়ে গেল—অবশ্য দক্ষিণী কায়দায়।

শুধাই, এই বাঙলা দেশেই ক'টি ছেলেমেয়ে তাবৎ 'জনগণমন অধিনায়ক' কণ্ঠস্থ বলতে পারে ?

আসল কথায় ফিরে যাই।

দক্ষিণী গুরুরা দুই সম্মান পেলেন। রাজ-সম্মান এবং উত্তর ভারতের সম্মান। উত্তর ভারত দক্ষিণী গানের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, সেকথা আপনি আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু গুরুদের পয়লা সা আর পয়লা পিড়িঙের সঙ্গে সঙ্গেই সভাস্থ তামাম উত্তর ভারত বে-এক্তেয়ার। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি সঙ্গীত-রসজ্ঞাকে আমি এখানে চিনি। দেখি, তাঁরা চোখ বন্ধ করে চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দিয়েছেন। একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

কণ্ঠে এবং যন্ত্রে যে এত গোপনবাণী লুকানো আছে, কে জানত ? রায় পিথৌরা মূর্খ এবং অরসিক—সঙ্গীতের সে কিছুই বোঝে না, তাই সব জিনিসই তার ভালো লাগে। তাই যদি নিবেদন করি, দক্ষিণী সঙ্গীতের তত্ত্ব না বুঝেও যদি তার মর্মে সাড়া জেগে উঠে, তবে কি স্বীকার করবেন না গুরুদের সঙ্গীত পশুর প্রাণেও মানবতা জাগাতে পারে। কিন্তু রায় পিথৌরা চুলোয় যাক ; দেখি, উত্তর ভারতীয় উন্নাসিকেরাও মুগ্ধ হয়ে দক্ষিণ ভারতের কৃতিত্বকে যেন উদ্বাহু হয়ে অভ্যর্থনা করছেন।

উত্তর-দক্ষিণের এরকম মিলন আমি এর আগে কখনো দেখিনি।

* * *

আলাউদ্দীন সাহেব আমার দ্যাশের লোক। ভেবেছিলুম তাঁকে কত কথা বলব। গলা ভেঙে গেল, কিছুই বলতে পারলুম না। রবীন্দ্রনাথের নাতনী নন্দিতাও সঙ্গে ছিল। ওস্তাদকে সেলাম করল। ওস্তাদ বললেন, 'মা, কত দিন পরে দেখা!'

ওস্তাদ মুশ্‌তাক হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে বেরুচ্ছিলেন তাঁর বন্ধু কাশ্মীরী পণ্ডিত হাকসার। আমি লখনওয়ী কায়দায় ঝুঁকে ঝুঁকে তাঁকে তিনবার কুর্নিশ করলুম। ওস্তাদ সদয় হাসি হেসে (এবং সবিনয়ে) আমার কুর্নিশ নিলেন দেখে আমার আর সেদিন মাটিতে পা পড়েনি।

* * *

ততক্ষণে দক্ষিণী গুরুরা চলে গিয়েছেন।

তাঁদের প্রণাম করতে পারলুম না বলে মনে আক্ষেপ নেই। ভক্তি থাকলে

অদৃশ্যে প্রণামও যথাস্থানে পৌঁছয়।

* * *

নিরপেক্ষ পাঠক, এইবার বলো তো 'হিন্দুস্থানে' এ-বয়ানে ইংরিজিতে লিখেছি বলে বাঙলায় যদি আনন্দবাজারে না লিখতুম তাহলে তোমার প্রতি অবিচার করা হত না?

২৩

খবর এসেছে নাগপুরে জাপানী ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। অতি উত্তম প্রস্তাব।

ভারতবর্ষ আজব দেশ। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের মত বড় বড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জাপানী ভাষা পড়াবার ব্যবস্থা নেই—ওদিকে এদের তুলনায় ক্ষুদ্র নাগপুরে জাপানী পড়াবার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ঠিক তেমনি আজ যদি আপনি উত্তম চীনা ভাষা শিখতে চান তবে আপনাকে যেতে হবে হয় শান্তিনিকেতন নয় পুণায়। অন্য জায়গায় বিশেষ কোনো বন্দোবস্ত নেই।

(এই দিল্লী শহরে বহুভাষা শেখাবার কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার নেই।)

নাগপুরে পুণায় জাপানী চীনা শেখাবার বন্দোবস্ত, অথচ বড় বড় শহরে নেই। এ যেন সেই মাকড় সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের ধাঁধা, কোথায় জাল আর কাথায় জেলে—?

আট পা আঠারো হাটু,
জাল ফালাইতা গেল ঘাটু।
শুকনায় ফালাইয়া জাল
মাছে উঠি দিলা ফাল!

—কোথায় ভাষা শেখার ব্যবস্থা, আর কোথায় ভাষা-শিখনেওলা!

* * *

ওদিকে আজ্জম পাশা বলছেন ভারত এবং আরব মুল্লুক এক হয়ে প্রাচ্যের প্রধান শক্তি তৈরী হবে, এদিকে আমরা ভারতবর্ষে বলছি, আলবৎ, আমরা জগৎকে জীবননীতির তৃতীয় পন্থা বাৎলাবো ইত্যাদি কতই না বাক্যাড়ম্বর।

যেসব ঐক্যের স্বপ্ন আমরা দেখছি সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভাষা না শিখে কি করে বাস্তবে পরিণত হবে কেউ আমায় বুঝিয়ে বলতে পারেন?

লণ্ডনে প্রাচ্য এবং আফ্রিকার নানা ভাষা শেখার জন্য বিরাট প্রতিষ্ঠান রয়েছে—প্যারিসেও তাই। জর্মনির ছোট ছোট বিশ্ববিদ্যালয়েও বহুতর ভাষা শেখা যায় (এক সংস্কৃতের জন্যই জর্মনির এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচজন সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন—সংস্কৃত শিখত মাত্র একটি ছেলে ও তাও এডিশনাল হিসেবে), ইটালিতে প্রাচ্য ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা বহু দিনের অথচ এই বিরাট ভূমি ভারতে যেটুকু ব্যবস্থা আর সেকথা নিজেদের ভিতর তুলতেও লজ্জা বোধ করে।

শুনেছি, আমাদের ফরেন আপিসের একদা তিন চার শ লোকের প্রয়োজন হয়েছিল এবং ভাষা জাননেওলা উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া গিয়েছিল মাত্র আট না দশজন!

তবুও ভাষা শেখাবার কোনো ব্যাপক ব্যবস্থা কোথাও হচ্ছে না।

মাদ্রাসাগুলো মরে যাচ্ছে—আরবী-ফার্সির চর্চা কমে আসছে।

আর সংস্কৃত তো "ডেড ল্যানগুইজ"। তাই টোলগুলো মরুক—আপত্তি নেই!!

কী দেশ!

* * *

দিল্লীর বিখ্যাত সাধু নিজামউদ্দীন আওলিয়ার প্রখ্যাত সখা এবং শিষ্য কবি আমির খুসরৌর জন্মোৎসব কয়েক দিন হল আরম্ভ হয়েছে। আমির খুসরৌর কবর নিজামউদ্দীনের দরগার ভিতরেই—এবং সে দরগা হুমায়ুনের কবরের ঠিক সামনেই। (এ দর্গায় আরো বহু বিখ্যাত ব্যক্তির কবর আছে।)

খুসরৌর পিতা ইরাণের বল্‌খ্ (সংস্কৃত বল্‌হীকম—ভারতীয় কোনো কোনো নৃপতি বল্‌খ পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন বলে কিম্বদন্তী আছে) থেকে ভারতবর্ষে আসেন। পুত্র খুসরৌ কবিরূপে দিল্লীর বাদশাহদের কাছে প্রচুর সম্মান পান।

ফারসী তখন বহু দেশের রাষ্ট্রভাষা। উত্তর ভারতবর্ষ (ফার্সী এদেশের ভাষা নয়) আফগানিস্থান (সে দেশেরও দেশজ ভাষা পুশতু) তুর্কীস্থান (তারও ভাষা চুগতাই) এবং খাস ইরাণে তখন ফার্সীর জয়-জয়কার। এমন কি বাঙলা দেশের এক স্বাধীন নৃপতি কবি হাফিজকে বাঙলা দেশে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

খুসরৌ ফার্সীতে অত্যুত্তম কাব্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। ভারতের বাইরে বিশেষ করে কাবুল-কান্দাহার এবং সমরকন্দ-বোখারা খুসরৌকে এখনও মাথার মণি করে রেখেছে।

আলাউদ্দীন খিলজী, তাঁর ছেলে খিজর খান, বাদশা গিয়াসউদ্দিন তুগলুক,

তাঁর ছেলে বাদশা মুহম্মদ তুগলুক (ইংরেজ ঐতিহাসিকদের 'পাগলা রাজা') এঁরা সবাই খুসরৌকে খিলাত-ইনাম দিয়ে বিস্তর সম্মান দেখিয়েছেন।

গুজরাতের রাজা কর্ণের মেয়ে যখন দিল্লী এলেন তখন তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রাজকুমার খিজর খান তাঁকে বিয়ে করেন। ইংরেজের মুখে শুনেছি, বিয়ে নাকি প্রেমের গোরস্তান, অর্থাৎ বিয়ে হওয়ার পরই নাকি সর্বপ্রকারের রোমানস্ হাওয়া হয়ে যায়। এখানে হল ঠিক তার উল্টো। এঁদের ভিতর যে প্রেম হল সে প্রেম পাঠান-মোগল হারেমের গতানুগতিক বস্তু নয়—তাই অনুপ্রাণিত হয়ে খুসরৌ তাঁদের প্রেমকাহিনী কাব্যে অজর অমর করে দিলেন। সেই কাব্যের নাম 'ইশকিয়া'—বাঙলা ভ্রমণের সময় সম্রাট আকবর সেই কাব্য শুনে বারম্বার প্রশংসা করেছিলেন। কর্ণের মেয়ের নাম দেবলা দেবী। শুনেছি, বাঙলায় নাকি 'দেবলা দেবী' নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে।

গিয়াসউদ্দীন তুগলুক নিজামউদ্দীনকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না। সে কাহিনী 'দৃষ্টিপাতে' সালঙ্কার বর্ণিত হয়েছে—'দিল্লী দূর অস্ত!' কিন্তু গিয়াস নিজামের মিত্র খুসরৌকে রাজসম্মান দিয়েছিলেন। খুসরৌ বড় বিপদে পড়েছিলেন,—একদিকে সখার উপর বাদশাহী জুলুম, অন্যদিকে তিনি পাচ্ছেন রাজসম্মান।

মুহম্মদ তুগলুক রাজা হওয়ার পর তাবৎ মুশকিল আসান হয়ে গেল। ঠিক মনে নেই (পোড়ার শহর দিল্লী—একখানা বই পাইনে যে অর্ধবিস্মৃত সামান্য জ্ঞানটুকু ঝালিয়ে নেব), বোধ হয় খুসরৌ বাদশা মুহম্মদের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন।

সে এক অপূর্ব যুগ গেছে। সাধক নিজামউদ্দীন, সুপণ্ডিত বাদশা মুহম্মদ তুগলুক, ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী এবং সভাকবি আমির খুসরৌ।

প্রথম দেহত্যাগ করলেন শেখ-উল-মশাইখ নিজামউদ্দীন আওলিয়া, তারপর তাঁর প্রিয়সখা আমির খুসরৌ, তারপর বাদশা মুহম্মদ শাহ তুগলুক এবং সর্বশেষ জিয়া বরণী'।

ইংরেজ আমাদের কত ভুল শিখিয়েছে। তার-ই একটা—এসব গুণীরা ফার্সীতে লিখতেন বলে এঁরা এ-দেশকে ভালোবাসতেন না। বটে? সরোজিনী নাইডু ইংরিজিতে লিখতেন, তাই তিনি ভারতবর্ষকে ভালোবাসতেন না!

খুসরৌ মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসতেন এবং সে ভূমির অশেষ গুণকীর্তন করে গিয়েছেন।

এবং দূরদৃষ্টি ছিল বলে তিনি যেটুকু দেশজ হিন্দী জানতেন (হিন্দীরও তখন শৈশবাবস্থা) তাই দিয়ে হিন্দীতে কবিতা লিখে গিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, ফার্সী এবং হিন্দী মিলিয়ে তিনি উর্দুর গোড়াপত্তন করে গিয়েছেন—জানতেন একদিন সে ভাষা রূপ নেবেই নেবে।

আবার বিপদে পড়লুম; হাতের কাছে বই নেই তাই চেক-আপ করতে পারছিনে—পণ্ডিত পাঠক অপরাধ নেবেন না—যেটুকু মনে আছে নিবেদন করছি—

'হিন্দু বাচ্চেরা ব নিগর্ আজব হুসন্ ধরত হৈ
দর্ ওক্তে সুখ্‌ন্ জদন মুহ ফুল ঝরত হৈ
গুফ্‌তম "কে বি আ আজ লবেৎ বোসে বিগরীম—"
গুফ্‌ৎ "আরে রাম! ধরম নষ্ট করত হৈ" !'

*

হিন্দু বাচ্চা কী অপূর্ব সৌন্দর্যই না ধারণ করে,
কথা বলার সময় মুখ থেকে যেন ফুল ঝরে।
বললুম, 'আয়, তোর ঠোঁটে চুমো খাব—'
বললে, 'আরে রাম! ধর্ম নষ্ট্ করত হৈ!'

অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[সৈয়দ মুজতবা আলীর এই পত্রগুলি রাজশেখর বসুর দৌহিত্রী-পুত্র শ্রীদীপংকর বসুকে লিখিত। শ্রীদীপংকর বসুর সৌজন্যে পত্রগুলি প্রকাশিত হল। এ ছাড়াও অনেক মূল্যবান আলোচনাপূর্ণ পত্র সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে স্থান পাচ্ছে। রাজশেখরবাবুকে সৈয়দ মুজতবা আলী কি পরিমাণ শ্রদ্ধা করতেন, তা প্রতিটি পত্রেই উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট। প্রায় সম পরিমাণ স্নেহ শ্রীদীপংকর বসুর প্রতি প্রকাশ পেয়েছে। এই চিঠিগুলিতে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছাড়াও সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে লেখক গভীর ভাবে আলোচনা করেছেন। লেখকের ব্যক্তিমানস বোঝার পক্ষে এবং তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে এই পত্রগুলি পাঠক-গবেষকের অবশ্যই প্রয়োজনে লাগবে তাতে সন্দেহ নেই।

—সম্পাদক]

স্নেহের দীপংকর,

আমার আশ্চর্য বোধ হয়, রাজশেখরবাবু যে বাড়িতে আছেন, একদিন যে বাড়ির গদিতে তুমি বসবে, অর্থাৎ তিনি যে বেঞ্চিটায় বসেন সেটাতে বসে তুমি তাঁরই মত অতিথি অভ্যাগতকে আপ্যায়িত করবে—তখন অন্য লোকের অটোগ্রাফ সঞ্চয় করার তোমার কি প্রয়োজন ? ফার্সীতে বলে 'এক বাচ্চা-ই-বাবুর বস্ অস্ত্' (এর সবকটা শব্দই তোমার জানা থাকার কথা : বাবুর — সিংহ ; বস্ — ব্যস — যথেষ্ট ; অস্ত্ — সংস্কৃত অস্তি) 'সিংহের একটি বাচ্চাই যথেষ্ট', কুক্কুরীর মত সে লিটার প্রসব করে না। আমাদের গুরুদেবও মধুরতর করে বলেছেন, 'The rose which is single need not envy the thorns which are many!' (কবি হাইনে আরেক কদম এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, 'এবং সিংহশিশু যখন কুকুরের চেয়েও ছোট থাকে তখনো তার ক্ষুদ্র আঁচড় থেকে বোঝা যায়, ওটা সিংহের আঁচড়!' এক বুড়ো রাবিশ কবি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'গ্যোটের ছেলেবেলার কবিতা থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় এটা সিংহ-শিশুর আঁচড়, অমুকের বৃদ্ধ বয়সের কবিতা থেকেও বোঝা যায় ওটা ইঁদুরের আঁচড়।)

তাই রাজশেখরবাবুকে একখানা ডাইরি দিয়ে বলো, তাঁর মনে যখন যা কিছু আসে সেইটে যেন তোমার জন্য লিখে রাখেন। তুমি বড় হয়ে প্রতিদিন তারই মাত্র একটি করে পড়বে, এবং তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করবে।

আর শশিশেখরবাবুর* লেখা পড়ে আমার নিজের লেখার প্রতি ঘৃণা ধরে। এ লোকটা অত দেরিতে কলম না ধরে যদি যৌবনে আরম্ভ করতেন তবে আর সবাইকে কানা করে দিতেন। শুনেছি ওঁর পিতাও নাকি একটি খাণ্ডার ছিলেন। আমি যেদিন প্রথম রাজশেখরবাবুর নাম শুনি তখনই সন্দেহ করেছিলুম যে নামদাতা পণ্ডিত এবং রসিক লোক। তবু ভাবলুম, এটা হয়তো accident. তার

* শশিশেখর : শশিশেখর বসু। রাজশেখর বসুর অগ্রজ। ইনি পরিণত বয়সে ইংরাজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই সরস ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। তাঁর সব রকম লেখা অত্যন্ত উপভোগ্য ও পাঠকসমাজে আদৃত হয়। তাঁর 'যা দেখেছি যা শুনেছি' গ্রন্থখানি বিপুল সমাদর লাভ করে।

—সম্পাদক

পর যখন অন্যান্য ভাইদের নাম শুনলুম তখন আর মনে কোনো দ্বিধা রইল না।

আজ এখানেই শেষ করি। তুমি যখন বেআইনি ভাবে রাখশেখরবাবুকে লেখা আমার চিঠি পড়েছ, তখন, সাধু সাবধান, খেয়াল রেখো, তিনি যেন বেআইনি ভাবে তোমাকে লেখা আমার চিঠি না পড়েন।

শিগগিরই কলকাতাতে টেস্ট্ আরম্ভ হবে। তার প্রস্তুতির জন্য তোমাকে একটি কবিতা (বেতারের ভাষায় 'স্বরচিত কবিতা') পাঠালুম। গত মার্চ মাসে ঢাকায় দেখি আমার এক ভগ্নী (এম. এ. পড়ে বাঙলায়, তবে 'রাতারাতির' চিংড়ির মত চটপটে নয়, লেখক মনোজবাবুর সঙ্গে তার দোস্তী) ঘড়ি ঘড়ি রেডিয়ো খুলে West Indies vs Pakistan খেলার স্কোর শুনছে। অথচ ক্রিকেটের ক অক্ষর তার কাছে গোমাংস কিম্বা শূয়রের। তাকে এই কবিতাটি দিয়েছিলুম। ঢাকাতে লেখা বলে আরবী ফার্সী শব্দের প্যাজ-ফোড়নটা কিঞ্চিৎ ঝাঁঝালো!

আশীর্বাদক

সৈয়দ মু. আলী

২

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার তাবৎ লিখনই পেয়েছি। উত্তর কেন দিতে পারিনি সেটা বলতে গেলে আসল মহাভারত না হোক রাজশেখরীয় মহাভারত নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে যাবে। উর্দুতে বলে,

'মুসীবৎ কা অহওয়াল্ হর এক্ এক্ সে কহ্‌না—
মুসীবৎ সে হৈ য়হ্ মুসীবৎ জ্যাদহ্!'

'বিপদের কাহিনী প্রত্যেককে বয়ান করে বলার হ্যাপা আসল বিপদের চেয়েও বড় বিপদ।'

তোমার দাদুকে একটু বাজিয়ে নিয়ো তো, আমি তাঁকে একখানা বই উৎসর্গ করতে চাই। তাঁর অনুমতি আছে কি না? টাপে-টোপে ঠারে-ঠোরে শুধিয়ো। বেশ খুশী মনে যখন থাকেন। তোমাকে বলছি, বইখানা আমার সমজদার বন্ধুদের প্রশংসা পেয়েছে বলেই এ প্রগল্‌ভতা করছি।

রবীন্দ্রকাব্যের নূতন নূতন অর্থ শুধু নয়, এমন সব কঠিন প্যাসেজও আমি মোলায়েম করতে পারি যা অন্যে পারে না। আমি একটা দিগ্‌গজ নই—পারি

অন্য কারণে। সেটা দেখা হলে বাৎলে দেব।

ইতিমধ্যে এটার মানে কি বলো তো!

ওরে, এতক্ষণে বুঝি / তারা-ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথে পথ খুঁজি খুঁজি/গেছে সাত ভাই চম্পা। যাত্রা, "পূরবী", রচনাবলী ১৪ খণ্ড, পৃ-১৯। এখানে সবাই কাৎ।

পূর্বেই বলেছি, আমি মেলা 'মুসিবতে' আছি। আশীর্বাদ জেনো—

সৈয়দ মু. আলী

৩

স্নেহাস্পদেষু,

আমি যখন লণ্ডনে ছিলুম তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথও সেখানে ছিলেন। আমাকে শুধিয়েও ছিলেন, আমার কোন-কিছু করে দেবেন কি না। বললেই তিনি খুশী হয়ে বার্ট্রাণ্ড রাসল্ বার্ণার্ড শ'র নামে আমাকে চিঠি দিতেন। আমি চাইনি।

হিটলার শক্তিতে আসার পূর্বে তার দলের দু'একজন আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিল। হিটলার যখন খ্যাতি-প্রতিপত্তির মগডালে তখন তারা চেপে ধরেছিল আমাকে হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে। বলেছিল, 'ফ্যুরারের মেলা গুণ আছে কিন্তু ভাষা বাবতে তুই জর্মন ভাষাতে যা জমাবি' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যাইনি। আমি কোনো কালেই হিটলার-ভক্ত ছিলুম না।

তোমার দাদুকে কিন্তু দেখবার বাসনা আমার ছিল কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি বলে বাসনাটা ধামা চাপা দিয়ে তার উপর শিল-চাপা দিয়েছিলুম। ইতিমধ্যে আমার এক বন্ধু বললেন, 'ওহে, রাজশেখরবাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

আমার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি তাঁকে ফোন করে শুধালুম, কখন এলে দর্শন পাব।

আমার বিশ্বাস তোমার দাদু পূর্বোক্ত কোনো ইচ্ছাই প্রকাশ করেননি। আমার বন্ধু আমার মনের গতি জানতে পেরে ধাপ্পা মেরে আমার রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছিল।

সেদিন যতীনবাবুও তাঁর ঝোলা নিয়ে বসেছিলেন। আমি দুজনারই ন্যাটাই ভক্ত অর্থাৎ এঁদের কোনো দোষ-ত্রুটি আমার চোখে পড়ে না।

আমি এমনই nervous হয়ে গিয়েছিলুম যে সেটা ঢাকবার জন্য আপন

অজ্ঞানাতে জাত-ইডিয়েটের মত বক্‌বক্‌ করতে আরম্ভ করেছিলুম এবং আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বেশ বুঝতে পারছিলুম, ভারী অন্যায় হচ্ছে, বড্ড বাচালতা হচ্ছে, বেহদ্দ পাগলামী হচ্ছে,—অথচ কিছুতেই থামতে পারছিলুম না।

হয় তোমার দাদু পয়লা নম্বরের অভিনেতা, নয় তিনি অতিশয় সহৃদয়, সহিষ্ণু শ্রীকণ্ঠবাবু। বেশ হাসিমুখে আমার বকবক শুনেছিলেন, এমন কি বললে বিশ্বাস করবে না, ভাই, আমার মনে হচ্ছিল আমার বকবকানিটা তাঁর অপছন্দ হচ্ছে না। যতীনবাবুকে আমি অতটা ডরাইনি। সেটা অবশ্য তাঁরই প্রশ্ন শুধোবার সহৃদয়তা থেকে।

তার মানে তোমার দাদু একটা কিছু কট্টর হাম-বড়া লোক? আদপেই না। কিন্তু আমার এটা অহেতুক ভয়। তাঁর কাছে তো আমি কিছুই গোপন রাখতে পারবো না। তিনি ধরে ফেলবেন আমার দম্ভ, আমার আত্মস্তুতি প্রচেষ্টা, আরো সাতান্ন রকমের মানসিক এবং চরিত্রগত দুর্বলতা এবং ব্যাধি আমার যা আছে। আমি জানি তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল—একমাত্র ভণ্ডামি জিনিসটা তিনি আদপেই বরদাস্ত করতে পারেন না। শুধু ধর্মরত ভণ্ড বিরিঞ্চি বাবা নয়, মোলায়েমীর ভণ্ড পেলব রায় দোদুল দে গয়রহ বিস্তরে বিস্তর—এমন কি গণ্ডেরীর খোলাখুলি জোচ্চুরি তিনি প্রশংসার চোখেই দেখছেন, হয়তো ভাবছেন বুদ্দু বাঙালী ব্যবসায়ী এর কিছুটা পেলে বর্তে যেত।

আমি ভণ্ড নই। বড়ফাট্টাই করার লোভ একেবারে কখনো হয় না, সে-কথা বলব না। কিন্তু সেটা রসিয়ে বলতে পারি বলে কেউ বড় গায়ে মাখে না। পাছে অপরিচিত লোক misunderstand করে তাই আমি কারো সঙ্গে দেখা করিনে, পারতপক্ষে কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দি না, মিটিঙে পার্টি-পরবে যাই না অতিশয় নিতান্ত unavoidable না হলে। কাউকে বলো না, বাজারে রটিয়েছি, আমার 'আন্‌জিনা থ্রমবসিস' (দুটো হার্ট ট্রাবলকে মিক্‌স্‌ করে এই ঘ্যাঁটটি তৈরী করেছি), ডাক্তারের সখৎ মানা ভিড়ে মেশা। তৎসত্ত্বেও শুনে আনন্দিত হবে—অন্তত আমি তো বটি—বাজারে আমার ভয়ঙ্কর দুর্নাম, আমি দম্ভী, বদরাগী ইত্যাদি, তাই কারুর সঙ্গে মিশিনে। যখনই খবর পাই, অমুক এসব রটাচ্ছে, অমনি তার কাছে লোক পাঠিয়ে ধন্যবাদ জানাই, সে আমার উপকার করছে বলে (অর্থাৎ এই বদনাম শুনে visitor-রা আমাকে জ্বালাতন করবে না বলে) এবং আমার বইয়ের এক খণ্ড তাকে present করি!

ঠিক তেমনি যারা আপন জন তাদের সঙ্গ পেলে আমার সব দুঃখ উপশম হয়। আমার দাদাদের সঙ্গে আমি দিনের পর দিন পরমানন্দে কাটাতে পারি। আমার

মেজদা অনেকটা তোমার দাদুর মত। আমি বক্‌বক্‌ করলে শুধু যে শোনেন তাই নয়, চোখ দিয়ে উৎসাহও দেন।

যতীনবাবুকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ো।

আমি কলকাতায় আসি অতিশয় কালে-কস্মিনে। আমি জানি, তুমি বিশ্বাস করবে না, আমি সত্যই অত্যন্ত কুনো লোক। যেটুকু ভ্রমণ করেছি সেটা নিতান্ত বিপদে পড়ে, গরজের ঠেলায়। কাবুল গিয়েছিলুম সহজে টাকা রোজগার করে সেই টাকা দিয়ে জর্মনি গিয়ে পড়াশোনা করার জন্য। ঠিক সেই কারণেই মিশর, প্যারিস, লণ্ডন যাই—অর্থাৎ পড়াশোনা research করার জন্য। একবার মাত্র স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করেছি। ইহুদি, খৃষ্ট ও ইসলামের সঙ্গমভূমি প্যালেস্টাইন গিয়েছিলুম অতিশয় স্বেচ্ছায়—মিশরে যখন ছিলুম। আমার ছোট বোনেরা বলে, 'ছোড়দার longest walk হচ্ছে তার deck chair (আমি ডেকচেয়ারে পড়াশুনো করি) থেকে বাথরুম অবধি। ব্যবস্থা থাকলে সেখানেও taxi নিতেন।' কলকাতায় এলে তোমার দাদুকে দেখতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। কিন্তু বিরক্ত করতে বড্ড ভয় পাই। তবে এবারে ঠিক ঠিক আসব। আমি অন্তত ছ'টা কই মাছ খাব। দাদু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। তুমি স্মরণ করিয়ে দিয়ো। ৪৮ ঘণ্টার নোটিশ দেবার কথা। তৎসত্ত্বে যদি বাজারে কই না পাওয়া যায় তবে চিংড়ি, season হলে তোপসে। দেখ দিকিনি, কি রকম expensive taste—বাঙালের ঘোড়া রোগ। আমাদের এখানে এর একটাও পাওয়া যায় না।

তারা ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথ—milky way, আর সাতভাই চম্পা হল কৃত্তিকা নক্ষত্রের খাঁটি বাংলা নাম। ইংরেজীতে (আসলে গ্রীক) Pleiad অর্থাৎ milky way-এর পিছনে পিছনে পথের খোঁজে খোঁজে যেতে যেতে কৃত্তিকাও অস্ত গেছে। শরৎকালের প্রতি রাত্রেই হয়—বেশ কিছুদিন ধরে। আর milky wayকে 'তারা নির্ঝর' বলে রবিবাবু তাঁর physics এবং astronomy জ্ঞান দেখিয়েছেনও বটে। শুনেছি সৃষ্টির আদিতে নাকি বিস্তর তারা ঠিকরে পড়ে 'ছায়াপথ' milky way সৃষ্টি করেছে। আসলে কিন্তু সকলেরই Waterloo ঐ 'সাতভাই চম্পা'। ওটা যে কৃত্তিকা সেটা হরিবাবুর অভিধানে আছে। আমার যে গুরুর কাছে আমি সব চেয়ে বেশী অনুপ্রেরণা পেয়েছি তিনি ছিলেন আইরিশম্যান, নাম (ঈশ্বর) মার্ক কলিন্‌স্‌। বিশ্বাস করবে না, আমি জীবনে কোনোদিন দেখিনি যে, কোনো একটা text-এর সামনে এসে বললেন, 'এ ভাষা আমি জানিনে।' তা সে chinese-ই হোক, আর ওঁরাওঁ-ই হোক। আমাকে ইংরিজি ফরাসী জর্মন পড়াতেন। আর ইংরিজি শব্দতত্ত্ব শেখাবার সময় দুনিয়ার কুল্লে ভাষার সঙ্গে (কারণ 'ইংরিজি'

দুনিয়ার কোন্ ভাষা থেকে শব্দ নেয়নি বলতে পারব না) পরিচয় করিয়ে দিতেন। একদিন রাত্রের অন্ধকারে মাঠে দাঁড়িয়ে কন্‌স্টেলেশন চিনছি এমন সময় তিনি পিছন থেকে আমার পরীক্ষা নিতে নিতে কৃত্তিকার খাঁটি বাঙলা নাম শেখালেন। সে প্রায় ৪০ বছর হল। তখন ওর ফার্সী নাম পরওয়ীজও শিখিয়েছিলেন। Omar Khoyyam-এর যে ইংরিজি অনুবাদ (Fitzgerald) করেছেন তাতে Parwiz শব্দটি আছে। সেটি "The vine has struck a fibre" দিয়ে আরম্ভ। পার্সীদের মধ্যে এ নামে এখনও নামকরণ হয়। এই ৺কলিনসের মত মহাপণ্ডিত পূর্ব পশ্চিম কোথাও আমি পাইনি। অথচ কেউই তাঁকে চেনে না। কারণ যৌবনে লিখেছিলেন ডক্টরেট থিসিস, এবং বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথের চাপে একখানা চটি প্যামফলেট—ব্যস্। এবং দ্বিতীয়খানা পড়ে কেউই বুঝল না, ওটা সাপ না ব্যাঙ। নাম ছিল On the Octoval system of Reckoning In India, প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে প্রাক আর্য দ্রাবিড়রা, আর্যদের মত decimal system অর্থাৎ দশের স্কেলে গণনা করতো না—তাদের scale ছিল আটের। ৮×৮—চৌষট্টিতে তাদের শ'—তাই চৌষট্টি যোগিনী ইত্যাদি (এর বাইপ্রডাক্ট—দুর্গা আর চৌষট্টি যোগিনী অনার্যা—অবশ্য এটা মূল বক্তব্য নয়)। এই গোনার স্কেল যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়, এবং duodecimal-টাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ১২র স্কেল—এটা না জানা থাকলে তোমার দাদুকে জিজ্ঞেস করে নিয়ো। আমি এসব জানি অতি অল্পই। দেখা হলে ৺কলিন্‌সের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ো। তাঁর পাণ্ডিত্য যে কী অতল অগাধ ছিল সেইটে সালঙ্কার শোনাব।

এবারে বলো তো বৎস, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের—'অন্তর মম বিকশিত করো'-তে নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে কোত্থেকে লোপাট 'চুরি' করেছেন ? (উত্তর শেষ পৃষ্ঠায় উল্টো করে লেখা)।

'ধর্মশিক্ষা' এখনো পাইনি। নিশ্চয়ই পড়ব। 'ধার্মিকরা' চটুন, কোনো আপত্তি নেই। আর আমরাও 'মহেশ' বা 'হরিনাথ' নই। আর তোমরা তো কায়স্থ। তোমাদের মহা সুবিধে—কোন 'ধর্মকর্ম' করার আদেশ তোমাদের উপর নেই। কিঞ্চিৎ আতপ চাল আর দুটো কাঁচকলা বামুনকে ডেকে দিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। হিন্দুধর্ম বড় Specialistদের ধর্ম। বামুনরা Specialist —(যে রকম ধরো Cancer-এর স্পেশালিস্ট হয়) সেই Specialists যখন রয়েছে তখন তুমি আমি খামকা অত তকলীফ বরদাস্ত করে আনাড়ির মত এমেচারি করতে যাব কেন ? Specialist মোটর মেরামৎ করে, তবে Specialist-ই স্বর্গে যাবার সিঁড়ি তৈরি করে দেবে না কেন ? ভূশুণ্ডীর মাঠে

খামকা ক্ষীরি বামনীর ভিটেতলা থেকে সোজা যেখানে দেবদূতরা গোলাপী উড়্নি পরে ফটাফট সোডার বোতল খুলছে সেখানে যাবার পথ ওরা যখন জানে তখন ওদের হাতে দু'পয়সা ঠেকিয়ে দিলেই হয়—বাংলা কথা! আমার অবশ্য সমূহ বিপদ। একে তো সব মুসলমানকেই পাঁচ বেকৎ নামাজ করতে হয়, তার উপর আমি আবার সৈয়দ, মুহম্মদের বংশধর (সাবধান! চাট্টিখানি কথা নয়—তোমার দাদু এ বাবদে প্রশ্ন শুধোলে আমি বলেছিলুম, 'ক্যান্ মশায়, আপনারা যদি চন্দ্রবংশ, সূর্যবংশ হতে পারেন—অর্থাৎ চন্দ্র সূর্যের পুত্র হতে পারেন তবে আমার claim তো অনেক modest. আমি একজন মানুষ মাত্র পূর্ব-পুরুষ হিসেবে চাইছি!'), তার উপর আমাদের বংশ গুরুবংশ (যদিও থিয়েটারে আবদালা সাজিনে—খল্বিদং দ্রষ্টব্য ওটা দিলীপ রায়—না? Religiosity-র worst example ঐ লোকটা! বাপ্‌স্!), এবং finally কাইরোর ভুবন-বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝাড়া দেড়টি বছর শুদ্ধমাত্র স্মৃতি (মাকড় মারলে ধোকড় হয়—নবমীতে অলাবু ভক্ষণ, পশ্চিমে যাত্রা নাস্তি) নিয়ে research করেছি।

আমার মত 'জ্ঞানপাপী' এ জগতে দুর্লভ। আমার কি গতি হবে, বলো তো। জাবালি? মহেশ?

আচ্ছা, বলো তো, আমি কেন অত শত ধর্মগ্রন্থ পড়েছি, এবং এখনো পড়ি? আমার ডক্টরেটও History of Religion-এ। জর্মন মাল, বাবা, চালাকি নয়—ছে ছে পয়সা জাপানী মাল নয়। বলতে পারলে বুঝি তোমার পেটে কত এলেম্।

তোমার দাদু রসিক লোক, রসজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁর রসবোধ আছে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু 'রসশিল্পী' বা 'রসসাহিত্যিক' বলার কোনো অর্থ হয় না। শিল্পী রস বানাবে না, তবে কি কচুপোড়া তৈরী করবে! 'রম্যরচনা'-ও ঐ একই দরের কথা। এখানকার গাড়লরাও লেখে 'বিশ্বভারতী University'। 'বিশ্বভারতী' মানেই তো 'University' !!

তদুপরি, নিছক রস সৃষ্টির জন্যই তো রাজশেখর কলম ধরেননি। তিনি কি গোপাল ভাঁড়! তওবা, তওবা !!

আমার বইটার নাম শব্‌নম্। অর্থাৎ 'শিশিরবিন্দু', হিমিকা, গৌরী। উপন্যাস। অতি মোলায়েম। নির্ভয়ে প্রিয়জনের হাতে তুলে দেওয়া যায়।

যতীনবাবু—শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন। রাজশেখর বসুর দীর্ঘকালের বন্ধু ও নিয়মিত সঙ্গী।

আমি অবসর সময়ে আস্তে আস্তে 'পূরবী'র টীকা লিখছি। কবে শেষ হবে আল্লায় মালুম!

আশীর্বাদ জেনো।

শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর থেকে: 'পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্ত, নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।' যার চিত্ত পরব্রহ্মে যুক্ত, তিনি নন্দিত হন, নন্দিত হন, নন্দিত হন।*

৪

স্নেহাস্পদেষু,

কয়েকদিন পূর্বে তোমাকে চার পৃষ্ঠার একখানা চিঠি লিখি; ইতিমধ্যে তোমার দাদুর লেখাটি পাই। তিনি এত বেশী চমৎকার লেখেন, যে, আমরা চমৎকৃত হয়েও চমৎকৃত হইনে। তিনি আমাদের অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছেন।

যা বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমি আর কি বলব?

তবে ঐ যে বলেছেন, কর্ণেজপন সেইটে যে হয়ে উঠে না। Prophetরা সেই কর্ণেজপন নিজেরাই করে যান, Politicianরা তার হদ্দ রাখে না। হিটলার চূড়ান্তে পৌঁচেছিল। *কিন্তু প্লাতো, কিংবা এ যুগের রবীন্দ্রনাথ এঁরা আদর্শ রাষ্ট্র* সম্বন্ধে যা বলেছেন তার কর্ণেজপন তো কেউ করে না। বিশেষ করে প্লাতো।

বিশেষ করে আমরা সব blasé হয়ে গিয়েছি। একটা গল্প শোনো। বর্মার যুদ্ধে একটা লোকের মাথা উড়ে গেল। সে মাটিতে পড়ে গেল। খানিকক্ষণ পর আরেকজন সেপাইয়ের আঙুলের ডগাটি উড়ে যাওয়াতে সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। কাপ্তেন বললে, 'তুই কি কাপুরুষ রে! ঐ লোকটার মাথা উড়ে গেল, আর সে একটি শব্দ না বলে চুপ করে শুয়ে পড়ল। তুই কি না একটা আঙুলের ডগা যেতেই হাউমাউ করে উঠলি!'

ট্রাম ঠিকমত থামায়নি বলে একটা লোক চোট পেল (মনে কর, আমাদের 'চিকিৎসা-সঙ্কটে'র হীরো যে রকম)। আমি তাই নিয়ে মৃদু কোলাহল করতে একটা লোক ভেংচি কেটে বললে, 'ও! মশাই বুঝি মফস্সলের লোক। দেখেন-নি কত লোক না খেয়ে মরে গেল, কত রেফুজী মর মর—আর আপনি চোটপাট লাগিয়েছেন একটা লোকের সামান্য চোট লেগেছে বলে।'

* লেখক এই পত্রের উল্টোদিকে এই অংশ উল্টো করে লেখেন।

ছোট হক, বড় হক, তুমি কিছু একটা আপত্তি করলেই, বড় বড় পাপের ফিরিস্তি শোনানো হবে তোমাকে। অর্থাৎ পাপাচার দেখে দেখে সবাই এমনি রাজে হয়ে গিয়েছে যে কারো কানে আর জল যায় না।

ভেজালের কথাটা অতিশয় খাঁটি। যে যুগে আইন করা হয়েছিল তখন ভেজাল ছিল অতি সামান্যই—ওটা নিয়ে তখনকার চাণক্যরা বিশেষ ভাবিত হননি। তাঁরা তখনকার জমিদারী প্রথার ফল জালের জন্য ফাঁসি, পরে চোদ্দ বছর জেল আইন করেন। এখন জাল খুবই কম, ভেজাল বেড়েছে—আইন সেই মান্ধাতা আমলের।

এখন উচিত খুনের বেলা যে আইন সেইটে চালানো। তিনজন লোক যদি পিস্তল নিয়ে কাউকে খুন করতে গিয়ে, মাত্র একজন গুলি চালায় এবং তার একটা গুলিতেই লোকটা মরে তবে তিনজনেরই ফাঁসী—আদালত শুধোয় না, কার গুলিতে অকু-টা ঘটল। ভেজালের বেলাও তাই হওয়া উচিত। অর্থাৎ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের আদ্যন্তমধ্য—Managing Director থেকে চাপরাসী পর্যন্ত—সকলেরই তখন জেল-জরিমানা হওয়া উচিত।

এবং জানো, এখনও আইন—ভেজালের যে জিনিস পুলিস বাজেয়াপ্ত করেছিল সেটা ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী না হলে ফিরৎ দিতে হয়!

আরো কত কী!

ক্ষিতিমোহনবাবুর শেষ রসিকতা। বর্ধমান হাসপাতালে মৃত্যুর দুদিন আগের কথা।

তাঁকে দেখতে এসে এক বন্ধু শুধালে, 'রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর ব্যবস্থা কি হচ্ছে?' তিনি বললেন, 'সিলেট অঞ্চলে 'শ' অক্ষর উচ্চারণে 'হ' হয়। কাউকে 'শতায়ু হও' বলতে গেলে হয়ে যায় 'হতায়ু হওয়া।'

বাকিটা তিনি আর বলেননি। 'হতবার্ষিকীই' হবে বলে মনে হচ্ছে।

গুরুদেব বলে গেছেন তাঁর শতবার্ষিকীতে ২৫৲ টাকা খরচ হবে। শত বার সিকি—।০ × ১০০ = ২৫৲।

তোমার বয়স কত?

কি পড়?

ভাই বোন ক'টি?

তাদের বয়েস কত?

আশীর্বাদ জেনো। সৈ. মু. আ

কাটিঙটা ফেরৎ চাই?

C/o Inspectress of Schools,
P. O. Ghoramara, Rajshahi. E. Bengal.

স্নেহের দীপংকর,

হঠাৎ যেন চোখের সামনে একটা বিরাট সমুদ্র শুকিয়ে গেল।

যবে থেকে এখানে এসে খবর পেয়েছি, আমার নিজের মনই কিছুতেই সান্ত্বনা মানছে না। আমি যেন কিছুই ভেবে উঠতে পারছিনে। এখানে রওয়ানা হওয়ার আগের দিন সন্ধ্যার সময় রাজশেখরবাবুকে সভাতে দেখে কী আনন্দই না হয়েছিল! ইনি তা হলে অনেকটা সুস্থ হয়েছেন—সভাতে যখন আসতে পেরেছেন। এবারে তাহলে রাজশাহী থেকে ফিরে এসে নির্ভয়ে দেখা করতে যেতে পারব। এখানে এসে এই খবর। আমার স্ত্রী কাগজ এনে দিলেন। তিনি শ্রীযুক্তা আশা* পালিতের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছেন।

এত দিন ধরে রোজই ভাবছি, তোমাকে লিখি। কিন্তু কি লিখি? পরমাত্মীয় বাড়ীর মুরুব্বি গত হলে কি হয় সে কি আমি জানিনে? তার উপর তাঁর সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব। বাড়ীখানা যেন ভরে থাকতো। আর আমার চোখের সামনে তিনি অহরহ ছিলেন প্রত্যক্ষমাণ। কত বার ক্ষোভ করে ভেবেছি, যদি ওঁর মত একটা গল্পও লিখতে পারতুম।

বাঙলা দেশের সব লেখক এক জোট হলেও তাঁর মত একটি ছত্রও লিখতে পারবে না। তিনি চলে গেলেন। এখন এই অর্বাচীনদের রাজত্বে বাস করতে হবে।

আজ থাক। আমার সত্যই কোনো কথা বেরচ্ছে না।

কলকাতায় ফিরেই তোমার খবর নেব। তোমাকে আমার প্রাণ খুলে সব বলবো। ইতিমধ্যে তোমাকে একটি কথা বলি। আমি পৃথিবীর কোনো সাহিত্য আমার পড়া থেকে বড় একটা বাদ দিইনি। রাজশেখরবাবু যে কোনো সাহিত্যে পদার্পণ করলে সে সাহিত্য ধন্য হত। একথা বলার অধিকার আমার আছে।

আশীর্বাদ জেনো
সমশোকাতুর
সৈয়দ মুজতবা আলী

এই পত্রটি রাজশেখরবাবুর পরলোক গমনের সংবাদ পেয়ে লেখা।

* রাজশেখর-দৌহিত্রী